ভগিনী নিবেদিতার
জীবনী ও বাণী

ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী

ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য

অ শো ক প্র কা শ ন
এ৬২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা

ভগিনী নিবেদিতা

১

সূচনা

'অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবজননী পরা॥'

অর্থাৎ বিশেষরূপে যা অনুচ্চার্য নির্গুণা বা তুরীয়া তাও আপনি। হে দেবী, আপনি গায়ত্রী মন্ত্ররূপা এবং আপনি পরিণামহীনা শ্রেষ্ঠা শক্তি ও দেবগণের আদি মাতা।

চণ্ডীতে দেবতারা সমবেতভাবে মহাশক্তি আদিমাতার স্তব করেছিলেন প্রবলপরাক্রান্ত মহিষাসুরকে বধ করার জন্যে। আসুরিক শক্তি অর্থে অশুভ শক্তি এবং সুর বা দৈবশক্তি অর্থে শুভ শক্তি। এই দুই শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব আবহমানকাল ধরে লেগে আছে ও থাকবে দেশের বুকে। আদিতে অর্থাৎ প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে তথা বিশ্বে এই দুই শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। এই দুই শক্তিকে সংহত করতে পারে একমাত্র দৈব-শক্তি। মহাশক্তির আবির্ভাব হলে অশুভ শক্তি বিনাশিত হয়। শুভ শক্তি পায় রক্ষা। তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়স্বরূপা মহামায়া। তিনি জগৎসংসার সৃজন করেছেন এবং প্রয়োজন হলে তিনিই ধ্বংস করবেন। তাঁর অঙ্গুলি-হেলনে কি না হয়? দেশ যখন দুর্বৃত্তচক্রের মধ্যে আবর্তিত হয়, তখন সমাজমানস দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে। সমাজের লোকজনও হা-হুতাশ করতে থাকে। তারা রক্ষাকর্তা বা রক্ষাকর্ত্রীর শরণাপন্ন হয়। তখন রক্ষাকর্ত্রী আসেন কোন মহাপুরুষকে কেন্দ্র করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের পুণ্যভূমিতে

নেমে এসেছিল চরম এক সঙ্কটকাল, বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। বিজাতীয় শাসকশ্রেণীদের অনাচার-অত্যাচারে ভারতের জনসমাজ ভেঙ্গে পড়েছিল, লুপ্ত হতে বসেছিল ভারতীয় সনাতন কৃষ্টির সুমহান্ ভাবধারা। এদেশীয় জনসাধারণ আপাতমনোহর বাহ্যিক চাকচিক্যময় বিদেশী সভ্যতার মোহমায়ায় অন্ধ হয়ে ছুটে চলেছিল পরানুকরণের জাদুবিদ্যা ও কৌশল সম্বল করে। কেউ কেউ সেই নকল পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা রপ্ত করে ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার সুমহান্ ঐতিহ্য তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। অনেকের মধ্যে সন্দেহ জেগেছিল ভারতের কৃষ্টির প্রতি—ধর্মের প্রতি। তারা ভারতীয় ধর্মের সুমহান্ আদর্শ ও শিক্ষা ত্যাগ করে গ্রহণ করেছিল খ্রীষ্টান এবং যবনের ধর্ম। ফলে লক্ষ্যহীন পথে ছুটে চললো একটা বিরাট মহান্ ঐতিহ্যসম্পন্ন ভারতীয় জাতি। শ্রেষ্ঠ স্ব-ধর্মচ্যুত ও স্ব-আদর্শভ্রষ্ট শ্রীহীন বিপদাপন্ন মহান্ ভারতীয় জাতিকে তার স্বধর্মে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে অবতীর্ণ হলেন জগদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তিনি মহামায়ার শক্তিকে আরাধনা করে লাভ করলেন এবং জগৎ-কল্যাণের জন্যে সেই শক্তি তিল তিল করে দান করে দিয়েছেন তাঁর প্রিয় সহধর্মিণী সারদামণি, প্রিয় শ্রী-ভক্ত গৌরী-মা এবং প্রিয়শিষ্য নরেন্দ্র আর কালীপ্রসাদকে। পরবর্তী জীবনে তাঁরা ঠাকুরের অসমাপ্ত কর্ম ও স্বপ্ন সফল করেছিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝেছিলেন, সংসারে সমাজে বা দেশের কল্যাণের জন্যে প্রয়োজন নারীশক্তির জাগরণ। তাদের মধ্যে যে কমনীয় কল্যাণী ভাব রয়েছে তাকে বাহ্যিক জগতের কোলে সংসারের নিভৃত কোণে পৌঁছে দিতে পারলে তবেই কল্যাণ। তিনি নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত জগজ্জননীর শক্তিজ্ঞানে অর্চনা করেন এবং জগৎবাসীকে পরীক্ষামূলকভাবে জানালেন যে মহাশক্তি অর্থাৎ নারীজাতির পূজা বা নারীজাতিকে শ্রদ্ধার নজরে না দেখলে সংসার,

সমাজ বা দেশের উন্নতি নেই। সেই সাথে ভারতীয় জাতির সুমহান্ ঐতিহ্যও নষ্ট হবে। সেই কারণে তিনি নিজের স্ত্রীকে মহামায়ার জীবন্ত প্রতিমূর্তি, চিন্ময়ী ভাবের অভিব্যক্তি হিসাবে অর্চনা করে গেলেন যাতে করে জগৎসংসারে নারীশক্তিকে পুরুষজাতি শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে শেখে।

এই শ্রীমা সারদামণি সম্বন্ধে আমেরিকা হতে বিবেকানন্দ শিবানন্দকে চিঠি লিখেছিলেন, 'মা ঠাকরুন যে কি বস্তু, বুঝতে পারি নি। এখনো কেউই পারো না। ক্রমে পারবে। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন? শক্তিহীন কেন? শক্তির সেখানে অবমাননা বলে। মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন। তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জন্মাবে। দেখছো কি ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে। এইজন্যে তাঁর মঠ প্রথমে চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই, মা-ঠাকুরানী গেলে সর্বনাশ। শক্তির কৃপা না হলে ছাই হবে। আমেরিকা ইউরোপে কি দেখছি? শক্তির পূজো, শক্তির পূজো। তবু এরা অজান্তে পূজো করে। কাজের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিক-ভাবে মাতৃভাবে পূজো করবে, তাদের কি কল্যাণ হবে না? আমার চোখ খুলে যাচ্ছে। দিন দিন সব বুঝতে পারছি। তাইতো বলছি, আগে মায়ের জন্যে মঠ চাই।'

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলাসহচর এবং শিষ্য স্বামী অভেদানন্দ হিন্দুনারী প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন,—'সমাজে' নারীজাতির শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা সর্বপ্রথম করতে হবে। নিজ নিজ গৃহই এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র। নারীকে উপযুক্তরূপে শিক্ষাদান না করলে সংসারের কখনো উচ্চাদর্শের অনুপ্রেরণা আসতে পারে না। জননীরা শিক্ষিতা না হলে উপযুক্ত পুত্র-কন্যাদের আশাই বা আমরা কিভাবে করতে পারি?

চণ্ডীতে আছে দেবতাদের স্তব মহামায়া দুর্গাকে লক্ষ্য করে,—
'বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি! ভেদাঃ, স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।' (চণ্ডী)

অর্থাৎ হে দেবি দুর্গে! এ জগতে যত রকম বিদ্যা আছে ও যতরকম স্ত্রীলোক আছে সেই সকলই তোমারই অংশ। হে দেবি, তুমি স্ত্রীলোক, সুতরাং জগতের সমস্ত স্ত্রীলোকই তোমার মত পূজ্যা ও মাননীয়া।

সংসার নারী ও পুরুষের মিলিত শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। নারীশক্তিকে অবহেলা করে কেবল পুরুষশক্তির বলে সংসার চলতে পারে না। এতদিন আমরা নারীশক্তিকে দমিয়ে এসেছি বলে আমাদের সংসারের সুখ, শান্তি ও শ্রী ছিল না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এসে সেই শক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করে গেলেন। তিনিই ভারতীয় নারীশক্তিকে পুনরায় জাগিয়ে তুললেন এবং তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ গুরুর সেই মহান্ ব্রত উদ্‌যাপন করার জন্য বিদেশ হতে বিদেশিনী নিবেদিতাকে ভারতে নিয়ে আসেন। শ্রীমা নিবেদিতাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি হচ্ছো নরেন্দ্রের নৈবেদ্যের ফুল। সত্যিই তাই। নরেন্দ্র ঘুমন্ত ভারতীয় নারীশক্তিকে জাগাবার জন্যে নিবেদিতাকে নিয়ে এলেন বিদেশ হতে। নিবেদিতা যেন ভারতের নারীসমাজের মঙ্গলের জন্যে কর্ম করার অজুহাতে ওদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভারতের প্রয়োজনে তিনি এলেন ভারতের মাটিতে। পরে হয়ে গেলেন খাঁটি ভারতীয় কন্যা। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর মানসকন্যা নিবেদিতাকে উদ্দেশ্য করে একবার বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষ আজও মহীয়সী নারী সৃষ্টি করতে পারে নি। অন্য দেশের কাছ থেকে এ-জিনিস তাকে ধার করে আনতে হবে। তোমার শিক্ষা, আন্তরিকতা, পবিত্রতা, বিপুল মানব-প্রেম, সংকল্পের দৃঢ়তা—সবচেয়ে বড় কথা তোমার কেল্টিক রক্তের তেজ—এইসব আছে বলে এদেশের জন্যে যেমন মেয়ে চাই, তুমি ঠিক তেমনই।'

আবার একদিন স্বামীজী নিবেদিতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'স্বদেশে স্ত্রী-শিক্ষার একটা পরিকল্পনা করছি, মনে হয়, তোমার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাবো। ভারতবর্ষের হাজার হাজার মেয়ে প্রতীক্ষা করে আছে, পশ্চিমের একটি মেয়ে যদি পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জন্যে যোঝে, তাদের পথ দেখিয়ে দেয়, তারা মাথা তুলে সাড়া দেবে। অবরোধে রুদ্ধ হিন্দুমেয়ের অন্তর শিশুরই মত আধ-ফোটা, কিন্তু তার চরিত্রে আছে সরল বিশ্বাস আর অক্ষয় উৎসাহের অনুপম ঐশ্বর্য। ত্যাগ আর সহিষ্ণুতায় তাদের জীবন গড়া, আদর্শ•রক্ষার জন্যে প্রাণপণে যুঝতে তারা জানে। এই সব গুণেই সতীর তেজ আজও তাদের মাঝে অম্লান হয়ে জ্বলছে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির বন্যায় একদিন ওদেশের গ্রামের কুটির কয়েদখানা আর পাহাড়-জঙ্গল হতে জনাকীর্ণ নগর পর্যন্ত সবই ভেসে যাবে, সারা দেশ জেগে উঠবে তাঁর নামে। সেদিন দেশের ডাকে সাড়া দেবার জন্যে বহু কর্মী চাই···নারী-পুরুষ দুই-ই······।'

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সেদিনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়নি। সেদিন তিনি তাঁর মানসভূমিতে যে বৃক্ষের বীজ রোপণ করে যান, তা পরবর্তীকালে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। স্বাধীনোত্তর কাল তো ভারতের পক্ষে শুভ সময়। বিরাট এক নারীজাগরণের বন্যা ভারতের চতুর্দিক হতে এসে জমায়েত হয়েছে। তার সফল পরিণতি ঘটেছে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্ব-লাভে।

২

পূর্বপুরুষের কথা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ। সময়টা হবে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি। এই সময়ে আয়র্ল্যাণ্ডের বুকে নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। রাজনীতি ও ধর্মনীতির ক্ষেত্রে সুরু হয়েছে প্রবল সংগ্রাম। ধর্মনীতির ক্ষেত্রে প্রোটেস্টাণ্টদের সঙ্গে রোমান ক্যাথলিকদের আর রাজনীতির ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের সঙ্গে আয়র্ল্যাণ্ডের সংগ্রাম। দু'পক্ষই থাকতে চেয়েছিল স্বাধীনভাবে। কেউ কারও ওপর হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করতে চায় নি। বিশেষ করে আয়র্ল্যাণ্ডবাসীরা আর ইংলণ্ডের তাঁবেদার হয়ে থাকতে রাজী ছিল না। তারা চেয়েছিল স্বাধীনতা। স্বাধীনতা-সংগ্রামে তারা মরণকে বরণ করে অনলস-ভাবে কাজ করে চলেছিল। গেরিলাবাহিনী গঠন করে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিপ্লব সুরু করে দিয়েছিল। তাই তারা হয়েছিল রাজরোষের সম্মুখীন। সমগ্র আয়র্ল্যাণ্ড জুড়ে তখন ব্রিটিশ শাসক-দের পরোয়ানা জারী করা হলো—যারা রাজদ্রোহিতার অপরাধে লিপ্ত তারা কেউ জমি কিনতে পারবে না, ব্যবসা করতে পারবে না, আদালতে জুরির কাজ করতে পারবে না, হাতিয়ার নিয়ে পথ চলতে পারবে না, ঘোড়ায় চড়াও নিষিদ্ধ। এমন কি কেউ মারা গেলে তাকে কবর দেওয়ার জন্যে গোরস্থানে নিয়ে যেতেও পারবে না তার শবদেহ।

ইংরেজ রাজার এরকমভাবে বেপরোয়া ও জুলুমবাজি নির্দেশের প্রতি রুখে দাঁড়াল সমগ্র আয়র্ল্যাণ্ডবাসী। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন বীর সেনানীর নাম আমরা জানি। তিনি

হচ্ছেন জন নোবল। তিনি সংগ্রামী মন নিয়ে নির্যাতিত এবং সর্বহারা আয়র্ল্যাণ্ডবাসীদের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

জন নোবল ছিলেন আয়র্ল্যাণ্ডের ওয়েসলিয়ান চার্চের ধর্মযাজক। প্রতি তিন বৎসর অন্তর তিনি কর্মস্থান পরিবর্তন করে দেশের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। ফলে তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো লোকচরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করা।

জন নোবলের পূর্বপুরুষেরা রোমান ক্যাথলিকদের ওপর অযথা নির্যাতন করতেন। কিন্তু জনের চরিত্র ছিল বিপরীত ধরনের। তিনি সেই নির্যাতিত ক্যাথলিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চার্চ অফ্ আয়র্ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামলেন। চার্চ অফ্ আয়র্ল্যাণ্ড ছিল ইংলণ্ডের অনুরাগী। যাহোক এভাবে জন নোবল এক ঢিলে দু'পাখী শিকার করে বেড়াতেন। এই প্রসঙ্গে বিপ্লবী ভূপেন দত্ত লিখেছেন, '···নিবেদিতা আলস্টারের স্কচ্ বংশজাত প্রটেস্টাণ্ট-ধর্মীয় বংশের লোক। তাঁহার পিতৃপুরুষ ছিল ইংরেজ ও তাঁহার মাতৃভাষা ছিল ইংরাজী। কাজেই কেল্টিক আইরিশদের ন্যায় পুরাতন ভাষা ও আচারের পুনঃ প্রচলনে তাঁহার কোন উৎসাহ না থাকাই সম্ভব। তারপর তিনি ইংলণ্ডে বর্ধিত হয়েছেন। এইটুকু শুনেছিলুন যে তাঁর পিতা যিনি একজন প্রটেস্টাণ্ট ধর্মযাজক ছিলেন, তিনি আলস্টারের লোক হয়েও জাতীয়তাবাদী ছিলেন। ইহার অর্থ, তিনি রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্টাণ্টদের মধ্যে সমদর্শী ছিলেন, নিবেদিতাও তাই ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে কখনও সাম্প্রদায়িক কথা শুনি নাই।'···

(স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ—হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়—পৃঃ ২৬৯-২৭০—বাংলার বৈপ্লবিক কর্ম-প্রচেষ্টা ও যুগান্তর পত্রিকা—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।)

ধর্মযাজকের বেশে জন গ্রামে গ্রামে যীশুর উপদেশ-নির্দেশ প্রচার করে বেড়াতেন আবার সেই সঙ্গে গ্রামের নির্যাতিত,

শোষিত ও সর্বহারা মানুষদের কানে শোনাতে লাগলেন মুক্তির সোনালী সংগীত। সেই সংগীত শুনে গ্রামের অসহায় জনসাধারণ ক্ষেপে যেতে লাগলো। তারা ঈশ্বরের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানাতে লাগলো ধর্মযাজক জনের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে, হে প্রভু! হে জগৎপিতা ঈশ্বর! আপনি আমাদের মঙ্গল করুন। বিদেশীরা এসে আমাদের দেশের ওপর নানারকম অত্যাচার-উৎপীড়ন করছে। আমরা তাদের হাতে পুতুলমাত্র হয়ে অত্যাচার ভোগ করছি। আপনি দয়া করে আমাদের শক্তি দিন যাতে করে আমরা ওদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারি। ওদেরকে আমাদের দেশ হতে বিতাড়ন করে স্বাধীনতা আনতে পারি।

দয়াময় ঈশ্বর হয়তো সেদিন ধর্মযাজক জনের কথা শুনেছিলেন। তাই তিনি দেশের মাঝে আনলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের রুদ্র মূর্তি যা দেখে সমগ্র আয়র্ল্যাণ্ডবাসী বিস্ময়ে অভিভূত হলো। আনন্দে নেচে উঠলো নৃত্যের ছন্দে এবং সংগীতের সুরের সঙ্গে আবেগ ও উল্লাসের গাঁটছড়া বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়লো স্বদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে। পরবর্তীকালে ভারত ধর্মের নামে সমগ্র জাতিকে দেশের মুক্তি-যুদ্ধে মাতিয়ে তোলার অনুপ্রেরণা লাভ করে এই আয়র্ল্যাণ্ডের মুক্তি-সংগ্রামের ধারাকে লক্ষ্য করে—তার তত্ত্বগত স্বরূপ ধ্যান করে।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময় জন নোবলের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি এসেছে। একদিন জন এলেন তাঁর এক বন্ধুর বাড়ীতে। সেখানে এসে দেখলেন এক সুন্দরী তরুণীকে। তরুণীটির অপূর্ব রূপ দেখে মুগ্ধ হলেন জন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি?

তরুণীটি বললে, আমার নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নীলাস। এবার আপনার নাম জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

জন নোবল বললে, হ্যাঁ—হ্যাঁ নিশ্চয়ই—একশোবার পারেন।

মার্গারেট বললে, তাহলে বলুন আপনার নাম কি ?

জন বললেন, আমার নাম জন নোবল।

এরপর জনের সঙ্গে মার্গারেটের আলাপ-পরিচয় গাঢ় হয়ে উঠলো। ক্রমে জন জানতে পারলেন, মার্গারেটের বয়স আঠারো বছর। সে হচ্ছে জনেরই নিকট-আত্মীয়।

পরে জন মার্গারেটকে বিয়ে করতে ইচ্ছে করলেন। মার্গারেট রাজীও হলেন। কিন্তু বাদ সাধলেন মার্গারেটের নিকটতম আত্মীয়-স্বজন। তাঁরা বললেন, না, এ কখনোই হতে পারে না। জন একজন ধর্মযাজকের কাজ করে। তাছাড়া সে বিপ্লবী। কখন ইংরেজদের কারাগারে বন্দী হয়ে দুঃখের জীবন কাটাবে তার ঠিক নেই। এরকম একজন বরের সঙ্গে জেনেশুনে বিয়ে হলে শেষে অশেষ দুঃখভোগ করতে হবে কনেকে।

সব শুনলেন মার্গারেট। শেষকালে বললেন, 'না, আমি বিয়ে করবো জনকে। যদি বিয়েই করতে হয় তাহলে বিয়ে করবো জনের মত ধর্মযাজক আর বিপ্লবীকে। তা নাহলে আমি জীবনে আর বিয়ে করবো না।'

মার্গারেটের মুখে এমনধারা কথা শুনেও কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না তাঁর আত্মীয়স্বজন। তাঁরা বরং ভয় দেখালেন মার্গারেটকে, 'তুমি যদি এভাবে বিয়ে করো, তাহলে তোমাকে আমরা ঘর থেকে তাড়িয়ে দেবো।'

মার্গারেট ভ্রূক্ষেপ করলেন না এই ধরনের উক্তিতে। মনে মনে নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল অচল রইলেন।

অবশেষে একদিন চার্চে এসে দু'জনে পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। প্রেমের দুনিয়ায় বাধা আনবে কে ?

বিয়ের পর বেশ সুখেই ঘরসংসার করতে লাগলেন জন নোবল। কিন্তু তাঁদের এই দাম্পত্য-জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখ রইলো না। মার্গারেটের বিয়ে হয়েছিল জনের সঙ্গে আঠারো বছর বয়সে।

তারপর তাঁর বয়স যখন হলো পঁয়ত্রিশ, তখন তিনি কয়েকটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বিধবা হলেন। তখন মার্গারেটের বড় ছেলের বয়স মাত্র ষোল বছর। তার নাম জন। তার ঘাড়েই এসে পড়লো সমস্ত সংসারের ভার। বিধবা মা অতিকষ্টে কয়েকটি পুত্রকন্যা নিয়ে সংসার চালাতে লাগলেন। মার্গারেটের চতুর্থ সন্তানের নাম স্যামুয়েল। নিবেদিতা হচ্ছেন এই স্যামুয়েলেরই প্রথমা কন্যা।

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্যামুয়েল বুঝতে পারলে সংসারে অভাবের কথা। মা ও ভাইবোনেদের দুঃখ তার কাছে বড় অসহ্য হয়ে উঠলো! সে চলে এলো রোজগারের আশায় তার কাকার বাড়ীতে। কাকা ছিলেন একজন বড় কাপড়ের ব্যবসায়ী। স্যামুয়েল কাকার কাছে থেকে কাপড়ের কাজ শিখতে লাগলো। সে পরিশ্রমী এবং বুদ্ধিমান। অল্পদিনের মধ্যে সে ব্যবসা শিখে ফেললে। কিন্তু একটি জিনিস তার কাছে বড় মর্মপীড়া দিলে। সে দেখলে, ব্যবসাতে অনেক জালজুয়াচুরির ব্যাপার থাকে। যা লাভ করা উচিত নয় তাই লাভ করছেন কাকা। ন্যায্যপথে পয়সা রোজগার করতে না পারলে আর বিবেক রইলো কোথায়! সুতরাং কাকার ব্যবসায়ে অত্যধিক লাভ লক্ষ্য করে বিবেকের দংশন নিয়ে কাল কাটাতে লাগলো স্যামুয়েল। পরে সে ব্যবসা ত্যাগ করে বাড়ীতে মায়ের কাছে ফিরে এলো। এসে বললে, মা, আমি আর কাকার কাছে যাবো না।

মা বললেন, কেন রে? কি হয়েছে? যাবি না কেন?

স্যামুয়েল বললে, ওতে অনেক মন্দ কাজ আছে। আমার ওসব করতে ভাল লাগে না।

এর পর মার্গারেট পুত্রকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নিলেন সমস্ত ব্যাপারটি। তারপর তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, যাও, তোমার কাকার কাছে। ওখানে গিয়ে ব্যবসা শেখো।

অত ন্যায়-অন্যায়ের বিচার নিয়ে চললে ব্যবসা করা যায় না। আর ব্যবসা না করলে তুমি দাঁড়াবে কিভাবে ?

স্যামুয়েল বললে, অন্য উপায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করবো। তা বলে আমি কাকার কাছে যেতে পারবো না। ও ব্যবসা আমি শিখতে চাই না।

মার্গারেট বললেন, তুমি ওরকমভাবে ঘরে বসে থাকলে আমাদের সংসার যে একেবারে অচল হয়ে উঠবে। যাও বাবা—যাও। যারা নিয়োগকর্তা তাদের ওপর অসন্তুষ্ট হতে নেই।

স্যামুয়েল কিন্তু মায়ের উপদেশ শান্তচিত্তে মেনে নিলে না। পরে অবশ্য মানলে। কাকার কাছে ফিরে এলো। আবার পুরোনো কাজে নতুন উদ্যম নিয়ে কাজ সুরু করলে। কাজ করে যা টাকা পেত তাই এনে মায়ের হাতে দিতো। মা খুশী হতেন।

একদিন স্যামুয়েল বাড়ীতে এসে দেখলে তার মায়ের কাছে একটি মেয়ে বসে কি যেন পাঠ করে শোনাচ্ছে। মেয়েটির নাম মেরী হ্যামিল্‌টন।

মেরী মার্গারেটকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। প্রতিদিন সে আসতো তাঁর কাছে। পড়শীর এক সুন্দরী মেয়ে হ্যামিল্‌টন।

স্যামুয়েল বাড়ীতে এলে হ্যামিল্‌টন চলে আসতো নিজের বাড়ীতে।

এভাবে ক্রমে ক্রমে হ্যামিল্‌টনের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠলো মার্গারেটের। মার্গারেটের কেমন পছন্দ হয়ে গেল মেরীকে। তাই পুত্রের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করলেন মেরীর।

বিয়ের পর দু'জনকে প্রাণভরে আশীর্বাদ জানালেন মার্গারেট। তারপর স্যামুয়েল সস্ত্রীক চলে এলো উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের টাইরন অঞ্চলের অন্তর্গত ডাংগানন শহরে। এখানে এসে নতুনভাবে সংসার পাতলে স্যামুয়েল। এখানে থাকার সময় তার জীবনে কতরকম স্বপ্ন দোলা খেতে লাগলো। পিতার মত তারও জীবনে

এলো উচ্চাশা। সে দেশের ও দশের কাজে নিজেকে নিয়োগ করবে। কিন্তু আপাতত তার এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হতে পারলো না। তখন দেশে স্বাধীনতা-আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এসেছিল। তাছাড়া মেরী তখন গর্ভবতী। আসন্ন সন্তানলাভের আশায় তার মন-প্রাণ দিনরাত আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকতো। নিজের নতুন মাতৃ-জীবন নিয়ে—সন্তানসহ নিজের ভাবী জীবনের সুখ-সম্পদ নিয়ে ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে সে তখন কাল কাটাতে লাগলো। দেশ ও দশের সেবার কথা সাময়িকভাবে ভুলে গেল।

৩

জন্ম ও শৈশবকাল

২৮শে অক্টোবর ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ। এই দিনটি স্যামুয়েল-দম্পতির কাছে সত্যিই এক শুভদিন। কেবল স্যামুয়েল দম্পতির-কাছেই বা কেন, সমগ্র ভারত তথা বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে এক নায়িকার আবির্ভাবের দিন বলেও বিধাতা অলক্ষ্যে থেকে নির্দেশ করে দেন। তখন অতটা কেউ জানতে পারে নি। জেনেছে অনেক পরে। আর তা জানতে দেরীও হয়। ইতিহাসের ঘটনাস্রোত কখন কোথায় যে কাকে টেনে নিয়ে যায়, তা বলার কথা নয়।

সেদিন মেরী অত্যধিক প্রসবযাতনা উপলব্ধি করতে লাগলো। এর আগেও সে বেশ কয়েকদিন ধরে যেন টের পাচ্ছিলো সেই যাতনার সূক্ষ্মতম অনুভূতি। এই দিনে তা প্রবল আকার ধারণ করলো। আর তা করবে নাই বা কেন? ভাবী বীরাঙ্গনা যে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হচ্ছে। তার আগমনের বার্তা জানাতে হবে তো সকলকে।

যন্ত্রণায় প্রায় অচেতন হয়ে পড়লো মেরী। অবশেষে সেই শুভলগ্ন এলো। মেরীর কোল আলো করে ভূমিষ্ঠ হলো একটি সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে। রোগা হলেও দেহের গঠন বেশ সুন্দর—ছিমছাম। কন্যা ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে মেরীর জ্ঞান ফিরে এলো। সে স্নেহভরা আননে তাকিয়ে দেখলে কন্যা-সন্তানটিকে। ইষ্ট-দেবতার কাছে মনে মনে প্রার্থনা জানালে, আমার সন্তানকে সঁপে দিলুম তোমার শ্রীচরণে। তুমি ওর ভার বহন কোরো। ওকে সর্বপ্রকার আপদ-বিপদ হতে রক্ষা কোরো।

এর পর মেরী কোলের কাছে কন্যাটিকে নিয়ে স্নেহের একটি উষ্ণ চুম্বন এঁকে দিলে শিশুর কপালে।

তারপর দিন ক্রমশ ছুটতে লাগলো বল্গাহীন অশ্বের মত। মেরীর কন্যাও বড় হতে লাগলো। পাড়াপড়শীরা এসে কন্যাকে দেখে যেতো, কোলে তুলে নিয়ে আদর করতো। কখনো বা দোলায় শুইয়ে দিয়ে দোল দিতো। তাই দেখে গর্বে বুক ভরে উঠতো মেরীর। সেও সময় সময় কন্যার কপালে চুম্বনরেখা টেনে দিয়ে মৃদু মৃদু দোল দিতো দোলনায়। মায়ের স্নেহ-চুম্বন লাভ করে ফিক্ করে হেসে ফেলতো কন্যাটি। চোখ দুটো বড় বড় করে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন দেখতো অবাক হয়ে। তারপর তার ছোট ছোট হাত-পাগুলো এদিক ওদিক নাড়তো অনির্বচনীয় দিব্য এক আনন্দের স্রোতে ভেসে গিয়ে।

কন্যা বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের মনে চিন্তা এলো ওর নামকরণের। নামকরণ না হলে কি করে চলবে! প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন হয় নামের। তা না হলে মানুষের কাছে পরিচয় দেবে কিভাবে!

নামকরণের জন্যে একটা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। স্যামুয়েল-দম্পতি সেই অনুষ্ঠানের সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থা করলে। বহু আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন। তাঁরা শিশুকন্যাকে আশীর্বাদ

জানালেন। অনেক ভেবেচিন্তে কন্যার নাম রাখা হলো ঠাকুরমার নামের সঙ্গে মিল রেখে মার্গারেট এলিজাবেথ।

যেদিন মেরীর শিশু-কন্যাটির নামকরণ করা হয়, সেদিন ঘটে গেল এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। এক দাসী এসে গোপনে মার্গারেটকে নিয়ে গেল এক ক্যাথলিক চার্চে। সেখানে তাকে 'ব্যাপ্‌টাইজ' করে আনলে।

একথা স্যামুয়েল পরিবারের কেউ জানতে পারে নি প্রথমে। পরে দাসীই সেই রহস্য প্রকাশ করলে জনৈক প্রতিবেশিনীর কাছে। বললে, তোমরা যখন বাড়ীর ভেতরে অনুষ্ঠানের বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত ছিলে সেই সুযোগে আমি মার্গারেটকে কম্বলের মধ্যে ঢেকে নিয়ে চলে গেলুম চার্চে। সেখানে গিয়ে তাকে 'ব্যাপ্‌টাইজ' করে এনেছি।

প্রতিবেশিনী সামান্য হেসে বললে, তুমি তো খুব বাহাদুর মেয়ে! এতো লোকের মধ্যে এমন কাজ কিভাবে হাসিল করলে? তা যাহোক তোমার উচিত ছিল আগে থেকে অনুমতি নেওয়া। দাসী কিছু বললে না। পরে তার ঐ কাজের কথা চারদিকে জানাজানি হয়ে গেল।

দাসীর মুখে এমনধারা আস্পর্ধার কথা শুনে অনেকে বিরক্তি প্রকাশ করলে। অনেকে বা চাপা হাসির মধ্যে নিজের সম্মান গোপন করলে।

দাসীর মনে কিন্তু একটুও ক্রোধের সঞ্চার হলো না। মনিবের লোকজন তার প্রতি ভৎসনার দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে অথচ সে নির্বিকারভাবে শিশুকন্যাটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করে চলেছে।

মার্গারেট বড় হতে লাগলো শশীকলার মত। যখন সে এক বছরের হলো তখন স্যামুয়েল-দম্পতি তাকে পাঠিয়ে দিলে তার ঠাকুরমার কাছে। তারপর তারা নিজেদের বাসা তুলে দিয়ে চলে

এলো ইংল্যাণ্ডে। তারা আরম্ভ করবে নতুন এক জীবন,—যে জীবন তাদের ভাবী আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণ করে তুলবে—দেবতা ও দেশজননীর সেবার কাজে লাগবে। কাছে শিশুকন্যাটি থাকলে কাজে ব্যাঘাত ঘটতে পারে, এইজন্যে তাকে দূরে সরিয়ে দিলে। নিজেরা তৈরী হতে লাগলো দেশের ও দশের সেবার জন্যে। তিন বছর ম্যাঞ্চেস্টারে থাকতে হলো স্যামুয়েল-দম্পতিকে। এখানে থেকে তারা দিনরাত পড়াশুনো আর ধর্মালোচনায় মন-প্রাণ সঁপে দিলে। চার্চের কাজে নিজেদের উৎসর্গ করলে। তার ফাঁকে ফাঁকে পূর্বপরিচিত বিভিন্ন মানুষজনদের নিয়ে সভা বসতো সপ্তাহের একটি দিনের সন্ধ্যায়। সেখানে সবকিছু আলোচনা হতো। বিশেষ করে দেশের কথা নিয়ে। কিভাবে দেশের ভাল করা যায় এই চিন্তাই তাদের মনের অনেকখানি অংশ অধিকার করে থাকতো।

স্যামুয়েল একজন ভাল বক্তা। পিতার মত তার কথাতেও মাখানো ছিল মিষ্টতা এবং সহজ সরল ভাব, যা শুনে জনসাধারণ তার প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হতো। এভাবে নিজের স্বভাবজ গুণের দ্বারা স্যামুয়েল তার কর্মস্রোতে ভেসে চললো নির্বিঘ্নে। দিনরাত তার কর্মচিন্তার জন্যে নিজের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা ভুলে গেল। সংসারের দায়দায়িত্বের কথাও মনে থাকে না। ফলে সংসারে দেখা দিল আর্থিক অনটন। শেষ পর্যন্ত সংসার হয়ে উঠলো অচল। তাই কিছু পয়সা উপার্জনের দিকে মন পড়লো স্যামুয়েলের। চার্চের কাজে অধিকমাত্রায় ঝুঁকে পড়লো। দেশের মুক্তি-সংগ্রামের কাজে পড়লো ফাঁক। চার্চে যেসব ধর্মযাজক ছুটিতে থাকতেন তাদের হয়ে বক্তৃতা দিতো স্যামুয়েল। স্ত্রী মেরীও এ বিষয়ে স্যামুয়েলকে বিশেষ সাহায্য করতো। সে নানারকম বই পড়ে স্বামীর জন্যে বক্তৃতাগুলি ঠিক করে রাখতো।

অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে স্যামুয়েলের দু'টি ফুসফুস জখম হয়ে পড়লো। ঐ অবস্থায় সে চলে এলো ওল্ডহ্যামে।

ওদিকে শিশু-মার্গারেট তার ঠাকুরমার কাছে অতি আরামে দিন কাটাচ্ছিল। সে তার ঠাকুরমার চোখের মণি। ঠাকুরমার কাছে কতরকম রূপকথার গল্প শুনতো সন্ধ্যেবেলায় তিনি যখন এসে বসতেন ঘরে রাখা জ্বলন্ত উনুনের ধারে। ঠাণ্ডায় হিম হয়ে যেতো বৃদ্ধার হাত-পা। তিনি এসে বসতেন উনুনের ধারে হাত-পা গরম করার জন্যে। সেইসময় মার্গারেটও এসে বসতো তাঁর কাছে। জ্বলন্ত অগ্নিশিখার খবরাখবর নিতো। ঠাকুরমাকে প্রশ্ন করতো মার্গারেট, কেমন করে এলো ঐ জ্বলন্ত অগ্নিশিখা? ঠাকুরমাও উত্তর দিতেন ঠিক ঠিক ভাবে।

এরপর দিনের বেলা এলে মার্গারেট ছুটে চলে আসতো ঠাকুরমার যত্নে লালিত ছোট্ট ফুলবাগানটির কাছে। তার মধ্যে ঘোরাফেরা করতো নাচানাচি করতো লঘু শরীর নিয়ে। ঠিক যেন ফুলের বনে মধুলোভী প্রজাপতির মত। মার্গারেট প্রজাপতির দিকে তাকাতো অবাক-বিস্ময়ে। তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে গড়ে তুলতো স্বপ্নরাজ্য।

আর একজনকে অত্যন্ত ভালবাসতো মার্গারেট। তিনি জর্জ কাকা। তিনি একজন বিখ্যাত ডাক্তার। বনে বনে প্রায় ঘুরে বেড়াতে তার বড় আনন্দ হতো। এমন কি ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে সে তার প্রিয় জর্জকাকার কোলে মাথা গুঁজে শুতো। তারপর গভীর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়তে। ঘুম ভাঙলে কাকাকে নানারকমভাবে বিরক্ত করতো গল্প শোনার জন্যে। কাকাও বলতেন অপরূপ সব রূপকথার গল্প।

এমনিভাবে ছোটবেলাকার আনন্দের দিনগুলি কাটতে লাগলো মার্গারেটের তার প্রিয় জর্জকাকা আর ঠাকুরমার কাছে। এই সময় ঠাকুরমার টেবিলের ওপর রাখা বাইবেলের রঙিন ছবিগুলি দেখে বর্ণপরিচয় শিখতে লাগলো।

মার্গারেট বেশ আনন্দেই ছিল তার ঠাকুরমার কাছে। কিন্তু

হঠাৎ তার সেই আনন্দের দিনগুলিতে ছেদ টেনে দিলে তার বাবা স্যামুয়েল। মার্গারেটের বয়স তখন সবে চার বছর। ঠাকুরমার প্রিয় সঙ্গিনী সে। ঠাকুরমাকে কখনো নজরছাড়া হতে দিতো না। সবসময়ে চোখেচোখে রাখতো। ঠাকুরমাও তাঁর আদরের নাতনীকে সর্বদা স্নেহের আড়ালে রাখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন।

একদিন মার্গারেট তার ঠাকুরমার ফুলবাগানে এসে আনন্দে বিহার করছিল। ফুলের বুকে রঙিন প্রজাপতি উড়ে এসে কেমন-ভাবে মধুপান করছে তাই অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে দেখছিল মার্গারেট। এমনসময় কার এক মধুর-স্নিগ্ধ ডাকে তার চমক ভাঙলো। সে শুনতে পেলে সে মধুর আহ্বান—মার্গারেট—প্রিয় মার্গারেট।

মার্গারেট অমনি তার ছোট্ট মুখটি ঘুরিয়ে তাকালে আগন্তুকের প্রতি। দেখলে তিনি আর কেউ নন। তিনি হচ্ছেন তারই পিতা স্যামুয়েল।

বাবা বললেন, তুই যাবি না? তোকে আমি নিতে এসেছি। তাই শুনে মার্গারেট বাবার কাছে না এসে ঠাকুরমার কাছে চলে এলো। তাঁর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে ফুসফুসিয়ে কাঁদতে লাগলো। সে তার প্রিয় সঙ্গী ঠাকুরমাকে ছেড়ে যাবে না। ছোটবেলা থেকে ঠাকুরমাকেই সে জানতো। মাকে সে তখনো পর্যন্ত দেখে নি—তার সঙ্গে তার হৃদ্যতাও নেই। তাই বাবার মুখে যাবার কথা শুনে সে মুষড়ে পড়লো। কান্নায় ভেঙে পড়লো তার হৃদয়।

ঠাকুরমা তাকে কত করে বোঝালেন। কিন্তু তবু শুনলে না মার্গারেট। অবশেষে স্যামুয়েল তাকে কতরকম করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে এলেন ওল্ডহ্যামে। ঠাকুরমার কাছ থেকে আসার আগে স্যামুয়েল তাকে বললেন, তুমি চলো ওল্ডহ্যামে, মার্গারেট। সেখানে তোমার এক প্রিয় সঙ্গিনী আছে। সে হচ্ছে তোমার ছোট

বোন। তার সঙ্গে কত খেলাধূলা করবে। এখানে তো তুমি একা আছো। এখানে কোন সঙ্গী নেই তোমার। তোমার কত কষ্ট হচ্ছে বলো তো?

বাবার কথায় প্রথমে সায় দিতে পারে নি মার্গারেট। সামান্য চোখের জল ফেলেছিল। বোধ হয় সে তার প্রিয় সঙ্গী জর্জকাকা আর ঠাকুরমার কথা চিন্তা করেই চোখের জল ফেলে থাকবে।

ওল্ডহ্যামে এসে মার্গারেট তার মা ও ছোট বোনটিকে কাছে পেলে। বোনের কান্না তার কাছে প্রথম প্রথম ভাল লাগে নি। তারপর সয়ে গেল সব। বোনটিকে কাছে কাছে রেখে কতরকম খেলাধূলা করতে লাগলো। বোনকে সঙ্গে করে বিদ্যালয়ে যেতে লাগলো। এভাবে মার্গারেটের দিনগুলি বেশ ভালভাবেই চলতে লাগলো। বাড়ীতে একটি চাকর ছিল। তার সঙ্গে ভাব জমালে মার্গারেট। সে বেশ সুন্দর সুন্দর ভূতের গল্প বলতে পারতো। মার্গারেট সেগুলি প্রাণভরে শুনতো।

মার্গারেটের বয়স যখন সাতবছর, তখন তার ঠাকুরমা মারা যান। সেইসময় স্যামুয়েল গেছল মায়ের কাছে। তাঁর শেষ সময় ছিল সেখানে। পরে মেয়ের কাছে ফিরে এসে গল্প করলে ঠাকুরমার শেষ সময়ের কথা।

মার্গারেট মনোযোগ দিয়ে শুনলে। এক ফোঁটা চোখের জলও ফেললে না।

ওল্ডহামে বেশ কয়েকবছর কাটলো স্যামুয়েলের। এখানে সে ধর্মযাজক এবং রাজনীতিকের কাজ করতে লাগলো। অত্যধিক কাজের চাপের জন্যে তার শরীর গেল ভেঙে। সে তখন শহর ছেড়ে গ্রামের শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে মনস্থ করলো। সেই আশা নিয়ে সে চলে এলো ডেভনের গ্রেট টরেন্টন গ্রামে। এখানকার সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাস করার আনন্দে

মার্গারেটের মন ভরপুর হয়ে উঠলো। পরে সে একটি নতুন বোন কাছে পেলে।

গ্রামে এসে স্যামুয়েল গ্রামবাসীদের মাঝে বেশ ভালভাবে কাজ করতে লেগে গেল। তাদের কাছে কেবল ধর্মজগতের কথা বলতো না, সেইসঙ্গে ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক নানারকম গল্প করতো। মার্গারেট থাকতো বাবার সঙ্গে। সে মন দিয়ে শুনতো সেগুলি। বাবাকে উৎসাহ দিতো। বাড়ী এসে সে বাবার কাছে নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করে বাবার বলা বক্তৃতা নকল করে শোনাতো। এভাবে অতি শৈশবকাল হতে বাবার সান্নিধ্যে থেকে এবং তাঁর কাছে শিক্ষা পেয়ে মার্গারেটের মন বিপ্লবী হয়ে উঠলো। তখন থেকেই তার মন ছুটে চলতো মুক্তি-সংগ্রামের দিকে। সে কোন বাধা মানতে চাইতো না। ক্রমে সে ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করতে সুরু করলে। কালে মার্গারেট তার স্বদেশে এবং ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের পিছনে রসদ জুগিয়েছিল।

স্যামুয়েল প্রতি রবিবার মেয়েদের কাছে ডেকে বাইবেলের গল্প শোনাতো। মার্গারেট মন দিয়ে শুনতো সেসব গল্প।

ওল্ডহ্যামে থাকার সময় পর পর তিনটি শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হলো। স্যামুয়েলের বড় আশা ছিল যে সে একটি পুত্রসন্তানের জনকী হবে। বিধি হলেন বাম। পুত্র জন্মগ্রহণ করলো। কিন্তু বেশীদিন সে বেঁচে থাকলো না। অল্পদিনের জন্যে পৃথিবীর আলো দেখে আবার চলে গেল নিজের দেশে। তার সঙ্গে সঙ্গে শিশু অ্যানিও মারা গেল। ফলে স্যামুয়েলের মন গেল একেবারে ভেঙে। সে নিজেকে বড় অসহায় আর দুর্বল ভাবতে লাগলো। তবু সে নিজের কাজ চালিয়ে গেল পুরোদমে। দশ বছরের মেয়ে মার্গারেট তার সঙ্গে গেল।

এইসময় ভারত থেকে এক ধর্মযাজক ইংলণ্ডে গেল। মার্গারেটকে দেখে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। তারপর তাকে আশীর্বাদ

জানিয়ে বললে, ভারতবর্ষ সতন্ত্র হয়ে খুঁজছে তার দেবতাকে। সে যেমন আমাকে ডাক দিয়েছিল তেমনিভাবে ডাক দেবে তোমাকেও। তুমি প্রস্তুত থেকো সেদিনের জন্যে।

ধর্মযাজকের কথা কানে গেল স্যামুয়েলের। সে বিস্ময় প্রকাশ করে বললে, সত্যিই কি আমার মেয়ের মধ্যে আপনি দেখতে পেয়েছেন মহীয়সী মহিলার প্রতিভূ?

ধর্মযাজক বললেন, হ্যাঁ।

তাই শুনে আনন্দে বুক ফুলে উঠলো স্যামুয়েলের। সে মেয়েকে চেপে ধরলে বুকের মধ্যে। তারপর তার গালে ও কপালে এঁকে দিলে সোহাগের চুম্বন। সেদিন থেকে মার্গারেটের প্রতি তার দৃষ্টি উত্তরোত্তর ভাল হতে লাগলো। মেয়ের ভাবী জীবনের প্রতি স্থায়ী হলো সুদৃঢ় বিশ্বাস। তাই স্যামুয়েল চৌত্রিশ বছর বয়সে যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে তখন সে স্ত্রীকে ডেকে বললে, যেদিন ভগবান ওকে ডাক দেবে সেদিন তুমি ওকে বাধা দিও না। ও একটা কাজ করতে এসেছে,—এ আমি বেশ বুঝতে পারছি। ওর যখন বিরাট কাজে নামার সময় আসবে তখন যেন তুমি বাধা দিও না।

স্ত্রীও সম্মতি জানালে স্বামীর কথায়। তাই শুনে নিশ্চিন্ত মনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে স্যামুয়েল।

পিতাকে হারিয়ে কেঁদে উঠলো মার্গারেট। সে কি আকুল-ভাবে কান্না। স্যামুয়েল কেবল যে তার স্নেহময় পিতা, তা নয়, সে ছিল তার একান্ত অনুরাগী বন্ধু।

পিতার শোক ভোলবার জন্যে তার দাদু হ্যামিল্টন তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তারপর হ্যামিল্টন ঠিক করলেন, মার্গারেট ও তার বোন মে কে পাঠাবেন কংগ্রিগেশনালিস্ট চার্চের হ্যালিফ্যাক্স কলেজে।

৪

বিদ্যালয়ে মার্গারেট

স্বাধীন ও মুক্ত মন নিয়ে দুই বোন পড়তে এলো হ্যালিফ্যাক্সের বিদ্যালয়ে। কিন্তু এখানে আসার পর থেকে তাদের মন চলে গেল এক গণ্ডীর মধ্যে। বিদ্যালয়ের নিয়মকানুনের মধ্যে আবদ্ধ হলো তাদের স্বাধীন মন। তবু তারা ভ্রূক্ষেপ করলে না। বিদ্যালয়ের কঠোর নিয়ম মেনে চলতো। অবসরসময়ে তারা চলে আসতো বিদ্যালয়ের সামনে একটি পাহাড়ে। তার চূড়ার ওপর উঠে ইচ্ছামত খেলাধূলা করতো। সেখানে থাকতো না কোন নিয়মকানুন।

বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী মিস্ ল্যারেট খুব সাদাসিধেভাবে থাকতেন। যতটা সম্ভব নিজে কঠোরভাবে নিয়ম মেনে চলতেন যাতে তাঁর দেখাদেখি অন্যান্য ছাত্রীরা বিদ্যালয়ের নিয়মনিষ্ঠা মেনে চলে। মার্গারেটের প্রতি অন্যরকম দৃষ্টি ছিল মিস্ ল্যারেটের। তার মুক্ত মনের পরিচয় পেয়ে ল্যারেট অন্তরে অন্তরে খুব খুশী হতেন। তবু মাঝে মাঝে তিনি মার্গারেটকে বলতেন, তোমার মনের স্বাধীন সত্তার পরিচয় পেয়ে আমি খুশী হয়েছি, কিন্তু তবু আমি ও জিনিসকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারলুম না।

সত্যি মার্গারেট বিদ্যালয়ের অন্যান্য মেয়েদের তুলনায় একটু স্বতন্ত্র ধরনের। লেখাপড়ায় তার বুদ্ধিও ভিন্ন প্রকারের। সে বেশ ভালভাবে লেখাপড়া করতো। তবু তার মন ছুটে চলে যেতো খেলাধূলার আসরে—মুক্ত মনের আঙিনায়। তার ওপর তার মাথায় ছিল একরাশ সোনালী চুল। তাইতে তার মুখশ্রী সুন্দরতর হয়ে উঠতো। কিন্তু মিস্ ল্যারেট তা আদৌ পছন্দ করতেন না। তিনি ছাত্রীদের মধ্যে কেশ-পরিচর্যার বাড়াবাড়ি আদৌ মেনে নেন.

নি। তাই একদিন মার্গারেটের কাছে এসে বললেন, মাথায় এত বড় বড় চুল রাখা চলবে না। চুল ছোট করে কাটতে হবে।

মার্গারেটের মুখ মলিন হয়ে গেল প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কথা শুনে। তবু তাঁর আদেশ শিরোধার্য করলে। চুল কাটায় জানালে সম্মতি।

মিস্ ল্যারেট নিজের তত্ত্বাবধানে চুল কেটে দিলেন মার্গারেটের। তারপর মন্তব্য করলেন, এক বছরের আগে এরকম চুল আর রাখতে পারবে না।

তাই মেনে নিলে মার্গারেট।

বিকেলে চার্চে যখন সকল মেয়েরা প্রার্থনা করতে যেতো, মার্গারেটও যেতো তার ছোট বোনটিকে সঙ্গে নিয়ে। নতজানু হয়ে যীশুর ক্রুশে-আঁটা প্রতিমূর্তির সামনে বসে মেয়েরা প্রার্থনা করতে লাগলো। মিস্ ল্যারেট নিজে সেই প্রার্থনার পরিচালিকা। তিনি বাইবেল হতে কবিতা আবৃত্তি করতেন, আর ছাত্রীরা তাই মনোযোগ দিয়ে আবৃত্তি করতো।

এরপর চলতো প্রত্যেক ছাত্রীর প্রতি মৃদু অনুশাসন। কে কোন্ দোষে দোষী তাই স্মরণ করিয়ে দেওয়া ওদের। ওরা বিনা প্রতিবাদে সেগুলিকে মেনে নিয়ে প্রার্থনা জানাতো যীশুর কাছে ভবিষ্যতে যাতে ওরকম দোষে লিপ্ত হতে না হয়। মার্গারেটের দোষ বেশী থাকতো বলে তাকে বেশীক্ষণ ধরে নতজানু হয়ে শাস্তি-ভোগ করতে হতো। চোখের জলে তার বুক ভেসে যেতো। তবু সে এতটুকু প্রতিবাদ করতো না। নিজেকে নির্মল করার উৎসাহে সে সকল প্রকার কঠিন অনুশাসন শান্তচিত্তে আর নীরবে মেনে নিতো। নিজের বোন তার সঙ্গে সমান শাস্তি ভোগ করতো। তবে মার্গারেট অনেক সময় নিজে বোনের হয়ে শাস্তি মেনে নিতো। বোনকে সে কতো স্নেহ করতো। নিজের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে বোনকে খাওয়াতো।

বিস্তালয়ের কঠোর নিয়মকানুনের মধ্যে থেকেও মার্গারেটের মন মাঝে মাঝে উড়ে চলতো কল্পনার রাজ্যে। তার ঘরে যে কটি মেয়ে থাকতো তাদের নিয়ে সে বেরিয়ে পড়তো বোর্ডিং ছেড়ে। চলে আসতো প্রকৃতির নির্জন প্রান্তরে। সেখানে নেই কোন গুরুজনের শাসন। নিজের মনে নিজেকে পাওয়ার স্বাধীনতা থাকতো। সে প্রাণখোলা মনে আলাপ-আলোচনা করতো। কতরকম রূপকথার গল্প বলতো সঙ্গীদের সঙ্গে। দু'টি গল্প তার কাছে অতিশয় প্রিয় ছিল। একটি হচ্ছে দেবদূতের গল্প। পথের ধারে জেকব ঘুমিয়ে পড়েছিল তার ক্লান্ত শরীরটিকে এলিয়ে দিয়ে। তার সঙ্গে ছিল এক পাল রঙ-বেরঙের ভেড়া। তারা জল খাবার পর আনন্দে বিচরণ করে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ আকাশের বুকে কালো মেঘের মধ্যে থেকে নেমে এলো সোনার সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়ে দেবদূতেরা ওঠানামা করতো। তারা শান্তচিত্তে আর আনন্দিত মনে ঘোরাফেরা করলে। তাদের গায়ে পড়লো জ্যোৎস্নার আলো। সেই আলোর বন্যায় তাদের মন আরও উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তারা নৃত্য শুরু করে দিলে।

মার্গারেটের মুখে ঐ দেবদূতদের কথা শুনে তার সঙ্গিনীরা উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলো, আমরাও দেবদূত। কি মজা! কি মজা!

আর একটি গল্প মার্গারেট প্রায়ই বলতো। একদিন এক মাতাল মদ খেয়ে টর হয়ে পড়ে গেল গর্তের মধ্যে। গর্তটি ঘুটঘুটে অন্ধকার। হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে সে যখন অন্ধকার গর্তের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসছিল ওপরের দিকে তখন একটা বড় মদের পিপেতে মাথা লেগে গড়িয়ে পড়লো সে মাটির ওপর। তাই দেখে ছোট ছোট পিপেগুলো অন্ধকারে হেসেই কুটিকুটি। হাসলে আর বললে, আরো গড়াও, আরো গড়াও।

এরপর বড় পিপেটা বারকয়েক দুলে নিয়ে তারপর কয়েকটা ঝুল দিয়ে গড়িয়ে পড়লো মাতালটার ওপর। তখন মাতালের

মনে রাগ হলো। সে কটু ভাষায় যা তা বলতে লাগলো। শেষ-কালে ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে আর একটা ডিগবাজি খেয়ে ভাঙা-পা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড় দিলে।

মার্গারেটের মুখে ঐ ধরনের গল্প শুনে মেয়েরাও আহ্লাদে আটখানা হয়ে নিজেরা মেঝের ওপর গড়াগড়ি দিতো আর উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠতো, আঃ কি মজা! কি মজা!!

মার্গারেটও তাদের মনে আনন্দ দেবার জন্যে আরও ভালভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলতো গল্পগুলি। এভাবে অনেক গল্প বলতো মার্গারেট। তার ফলে সে বিদ্যালয়ের সঙ্গীদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠলো। কেউ তাকে নজরছাড়া করতে চাইতো না। তাকে দূর থেকে একবার দেখলেই আর রক্ষে থাকতো না। অমনি কাছে এসে বলতো, গল্প বলো—গল্প বলো না একটা।

গল্পবলিয়ে মার্গারেটও তাদের আবদার রাখতো।

দু'টি বছর কেটে গেল মিস ল্যারেটের সঙ্গে মার্গারেটের। এরপর ঐ বিদ্যালয়ে এলেন কলিন্স। তিনি খুব মেধাবী শিক্ষয়িত্রী। সাহিত্য ও কলাবিদ্যায় তাঁর রুচি, অথচ পড়ান বিজ্ঞান বিষয়ের বই। মার্গারেটের সঙ্গে কলিন্সের হৃদ্যতা ক্রমশ গাঢ় হয়ে উঠলো। মাত্র তেরো বছর বয়সে মার্গারেটের মধ্যে জ্ঞান আহরণের জন্যে অসম্ভব কৌতূহল লক্ষ্য করে বিস্মিত হলেন কলিন্স। তিনি দেখলেন, মার্গারেট যেন স্কুলের পড়াশুনোর বাইরে অজানা রাজ্য সম্বন্ধে জানবার জন্যে বিশেষ কৌতূহল পোষণ করে মনের মধ্যে। একদিন তিনি মার্গারেটকে নির্জনে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, তুমি পড়তে পড়তে একমনে উদাসভাবে কি সব চিন্তা করো বলো তো?

মার্গারেট কোনরকম দ্বিধা না করেই বলে উঠলো, আমি চিন্তা করি ঈশ্বরের জন্য। তিনি কি আছেন?

কলিন্স অবাক হয়ে গেলেন কিশোরী মেয়ের মুখে এই ধরনের

কথাবার্তা শুনে। কিছু না বলে তাকিয়ে রইলেন তার মুখের পানে।

মার্গারেট আবার প্রশ্ন করলে, মানুষের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর সে কোথায় যায়?

কলিন্স বললেন, ওসব কথা জানবার সময় নয় এখন। তুমি নিজের খেলাপড়া নিয়ে থাকো। ওসব কথা বড় হলে জানতে পারবে।

কিন্তু তবু মার্গারেট ছাড়লে না। ঈশ্বর সম্বন্ধে কৌতূহল তার মনকে শান্ত হতে দিলে না, চিত্ত হয়ে উঠলো চঞ্চল! কখনো সে বাইবেলের পাতা খুলে বসতো। খানিকটা পড়ে নিয়ে আবার বাইবেলটা দূরে সরিয়ে দিতো। তখন পড়তো বিজ্ঞানের বই।

এমনিভাবে অগোছালো মন নিয়ে মার্গারেট দিন কাটাতে লাগলো। বুদ্ধিমতী কলিন্স বুঝতে পারলেন, মার্গারেটের জন্যে এক নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। ভাবলেন, ওর মনকে শিল্পকলায় নিয়োজিত রাখলে ও পাবে শান্তি।

এই ভেবে কলিন্স একদিন মার্গারেটকে কাছে ডেকে বললেন, ছাখো মার্গারেট, এই বিরাট বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন ঈশ্বর। তিনি এই পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তোমার চারিপাশে যেসব দৃশ্য দেখছো এসবই তাঁর সৃষ্টি। সুতরাং এইসব জিনিসের মধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করো। এগুলিকে আগে জানতে শেখো। তাহলেই তুমি তাঁকে জানতে পারবে।

বুদ্ধিমতী কলিন্সের কথায় সায় দিলে মার্গারেটের উৎসাহী মন। সে লাফিয়ে বলে উঠলো, হ্যাঁ—হ্যাঁ। আমি তাই জানবো—জানতে চেষ্টা করবো। কিন্তু কিভাবে জানবো তা আমায় বলে দিন।

কলিন্স বললেন, আমি বলবো। তোমাকে এই গাছটার ছবি আঁকতে হবে। এর মধ্যে তিনি রয়েছেন।

মার্গারেট তখন খাতা-পেন্সিল নিয়ে একমনে গাছের ছবি আঁকায় মেতে যেতো।

এভাবে ধীরে ধীরে তার মন কেন্দ্রীভূত হতে লাগলো। ছবি আঁকার কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন তার মুখের ভাষাও হলো সংযত এবং ভাবগম্ভীর। পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে ছবি-অঙ্কনের বিদ্যায় সে খুঁজে পেলে খানিকটা স্বাধীনতা যা তার প্রকৃতি ও মন একান্ত-ভাবে চায়।

বছরের মাঝামাঝি এবং শেষসময় দু'বার ছুটি হতো বিদ্যালয়ে। এই ছুটির সময় মার্গারেট চলে আসতো আয়র্ল্যাণ্ডের বাড়ীতে। দাদুর সঙ্গে ওর খুব ভাব। দাদুও মার্গারেট আর মে-কে কাছে পেয়ে আনন্দে মেতে উঠতেন বেশ কয়েকদিন। দাদু এককালে কর্ক-ব্যবসায়ী ছিলেন। শেষ জীবনটা কাটাচ্ছেন রাজনীতি নিয়ে। 'তরুণ-আয়র্ল্যাণ্ড' সঙ্ঘের অবিসংবাদিত নেতারূপে পরিচিত। স্বদেশের রাজনীতি এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার দিকে ঝুঁকেছেন এখন। জীবনভর হোমরুল আন্দোলনে যোগ দিয়ে এসেছেন। স্ত্রী অনেক আগেই মারা গেছেন। তথাপি তিনি স্ত্রীর সেবা, এবং স্বামীর অসাধারণ কর্তব্যের কথা আজন্ম মনে রেখেছেন। দেশসেবার কাজে স্ত্রীর কাছ থেকে যেরকম অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন তিনি, তার গর্বেই দিন কাটান ভালভাবে। পাঁচজনের কাছে বলেন স্ত্রীর কথা।

ভোরবেলায় হ্যামিল্‌টন বেরিয়ে যেতেন বাইরে। হাতে থাকতো পত্রিকা। মার্গারেটের ইচ্ছে জাগতো সেও দাদুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। দাদুও তার ইচ্ছা দমন করতেন না। বেরিয়ে পড়তেন কিশোরী নাতনীর হাত ধরে। একে মার্গারেটের মন স্বাধীন গণ্ডীর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে চাইতো, তার ওপর দাদুর মত স্বাধীনচেতা মানুষের সংস্পর্শে আশার ফলে তার মনে আনন্দ আর ধরে না। দাদুর কাছে দেশের কথা শুনলে তার মন ও হৃদয় গর্বে

উন্নত ও গতিশীল হয়ে উঠতো। দেহের বিভিন্ন স্থানে নৃত্য করতো রক্তের কল্লোলিত ধারা। মোটকথা মার্গারেট প্রথম দেশসেবার প্রেরণা লাভ করেছিল তার দাদুর কাছ থেকে। এই প্রসঙ্গে মার্গারেটের প্রখ্যাত জীবনীকার শ্রীমতি লিজেল রেঁম লিখেছেন তাঁর 'নিবেদিতা' গ্রন্থে—'দাদু যখন বুট পরে পাইপটি জ্বালিয়ে বেরোবার জন্য তৈরী হন, মার্গারেট মনে-মনে ভাবে, আমি যদি ওঁর সঙ্গে যেতে পেতাম! বেশ জানে, ওঁর ঝোলা-ভর্তি রয়েছে 'দি নেশন' নামে একটা নিষিদ্ধ পত্রিকা, ওগুলো বিলি করতে চলেছেন উনি। দাদুর গর্বে ওর বুক ভরে ওঠে।

বৃদ্ধ ধীরে-ধীরে নাতনীর কাছে মনের কবাট খুলে দিলেন। হাত ধরে তাঁর সঙ্গে সে-ও বাইরে বেরুতে শুরু করল। দাদু বুঝেছিলেন, মার্গারেটের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ, তাঁর বিশ্বাস আর উদ্দীপনার আগুনও মেয়ের মাঝেও জ্বলছে। দু'জনের মনের গড়ন একই রকম। মার্গারেট তাঁর গর্বের ধন, তাঁর সর্বস্ব। দেশকে ওঁরা দু'জনেই প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন, তাই যত দিন যায় দাদু-নাতনীর অন্তরঙ্গতা বেড়েই চলে। শেষ পর্যন্ত দাদুর সঙ্গে সব-জায়গায় ও যেতে আরম্ভ করলে। বন্ধুদের কাছে নাতনীর পরিচয় দিতে গিয়ে শুধু বলেন, 'টাইরনের নোব্‌ল্‌-বংশের মেয়ে ও, আমার আর জন নোব্‌লের নাতনী'। একজন আইরিশের কাছে ওর এই পরিচয়ই যথেষ্ট। বুঝতে পেরে গৌরবগর্বে মার্গারেটের মুখ লাল হয়ে ওঠে। উত্তরকালে নিবেদিতা প্রায়ই বলতেন, 'স্বদেশ যে কী বস্তু তা প্রথম শিখেছি আমার দাদু আর ঠাকুমার কাছে।'

(নিবেদিতা—শ্রীমতী লিজেল রেঁম—পৃঃ ২১-২২)

ছুটি শেষ হলে দাদুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মার্গারেট আর মে আবার চলে আসতো হ্যালিফ্যাক্সের বিদ্যালয়ে। আসার সময় দাদু মার্গারেটের বাক্সের মধ্যে ভরে দিতেন একগাদা বই। কবি মিল্‌টন ও সেক্সপীয়রের বই-ই বেশী থাকতো। আর তার সঙ্গে

থাকতো আয়র্ল্যাণ্ডের দেশহিতৈষী নেতা বরার্ট এমসমায়ের জীবনী। অবসরসময়ে এগুলি পড়ার জন্যে দাদু দিতেন। তিনি মার্গারেটের মন বুঝেছিলেন। নাতনীর স্বাধীন মন যে স্কুলের পড়াশুনোর গণ্ডী ছেড়ে আরও অধিকদূর অগ্রসর হতে চায়, একথা তিনি অনেক আগে থেকেই বুঝেছিলেন। তাই তাকে স্কুলপাঠ্য বই ছাড়াও অন্য রকম অনেক বই পড়তে দিতেন। মার্গারেটও দাদুর দেওয়া বইগুলি মনোযোগ-সহকারে পড়তো। কিন্তু বাদ সাধতেন বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী মিস্ কলিন্স। মার্গারেট তাঁকে একটু ভয় করে চলতো। তবু কলিন্স মুখে শাসন করলেও অন্তরের অন্তরে ভালবাসতেন মার্গারেটকে। তার মুক্ত মন আর স্বাধীন চিন্তার প্রবাহের সুযোগ করে দিতেন। এই সময় মার্গারেট প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করলে। বিদ্যালয়ের পত্রিকায় সেগুলি ছাপা হতে লাগলো। যেসব প্রবন্ধ রাজনীতি আর দেশের কল্যাণকে কেন্দ্র করে লেখা হতো মার্গারেট সেগুলিকে যত্নের সঙ্গে পাঠিয়ে দিতো দাদু হ্যামিল্‌টনের কাছে। দাদুও খুশী হতেন সেগুলি পাঠ করে।

এভাবে মার্গারেটের জীবন স্বাধীনতার আনন্দে মেতে উঠতে লাগলো দিনের বেশীর ভাগ সময়েই। বিদ্যালয়ের শেষ বছরটি তার কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর বলে বোধ হলো। কেননা, সে আর চাইতো না কোন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে নিজের মনকে। দেশের ধর্ম ও রাজনীতিকে কেন্দ্র করে বিরাট এক কর্মপ্রবাহের মাঝে ছুটে চলতে চাইতো মার্গারেট। তার এই মুক্ত মনের জন্যে তার মা অনেক সময় অনুযোগ করতেন। প্রায়ই আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের কাছে জেদ করে বলতেন, বড়টা অমনধারা হলো কি করে? আমার সঙ্গে যে ওর মতের কোন মিল নেই।

ইদানীং মার্গারেটের মা বেলফাস্টে বিদেশীদের জন্যে একটা বোর্ডিং খুলেছেন। নানারকম বাস্তব অবস্থার মধ্যে থেকে এবং

অনেক অভাব-অভিযোগের মুখোমুখি হওয়ার ফলে তাঁর মেজাজ কেমনধারা খিটখিটে হয়ে উঠছিল। তাই মেয়ের মতের সঙ্গে তাঁর মত মেলে না। কোথায় যেন একটা গরমিলের সন্ধান পাওয়া যেতো। তার জন্যে কিশোরী মার্গারেট আদৌ ঘাবড়াতো না। সে ছুটে চললো জীবনদেবতার আহ্বানে তাঁর ঈপ্সিত কর্মের আবর্তে, তারই আকর্ষণে সে বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলো।

স্বাধীন জীবন

আঠারো বছর বয়েস মার্গারেটের। এরই মধ্যে লেখাপড়া শেষ করে অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা লাভ করলে সে। ছোট ভাই আর বোনকে প্রাণভরে ভালবাসতো মার্গারেট। ভাইকে ডাকতো খোকা বলে, বোনকে ডাকতো খুকু। মায়ের প্রতিও মার্গারেটের টান অসাধারণ। মাকে কাজে অবসর দেবার জন্যে সে স্থির করলে বিদ্যালয়ে শিক্ষায়িত্রীর কাজ নেবে। এই ভেবে সে 'চার্চ নিউজ' পত্রিকায় একটা দরখাস্ত লিখলে। দরখাস্তটি ছাপাও হলো। এর কিছুদিন পরে মার্গারেটের নামে একটি পত্র এলো। তার নতুনকর্মে নিয়োগপত্র। কেসউইকের একটা প্রাইভেট আবাসিক বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর পদে যোগ দিলে সে মাত্র দু'বছরের জন্যে। সেখানকার পরিবেশ মার্গারেটের কাছে বেশ ভালই লাগলো। বিদ্যালয়ে চোদ্দ থেকে ষোল বছরের মেয়েদের সাহিত্য আর ইতিহাস পড়ানোর কাজে লেগে গেল। ক্লাসে মেয়েদের বেশ ভালভাবে পড়াতো। তার পড়ানোর মধ্যে কোনরকম পেশাদারী

ভাব ছিল না। সে এমনভাবে পড়াতে লাগলো যেন মনে হতো ছাত্রীদের সাথে গল্প বলছে। পাঠ্য বিষয়গুলি নিজের মনের মধ্যে আয়ত্ত করে ছাত্রীদের সামনে গল্পাকারে প্রকাশ করতো। তার ঐ প্রকার অভিনব শিক্ষাদান-প্রণালী দেখে ছাত্রীরা মুগ্ধ হয়ে যেতো। ক্রমশ মার্গারেটের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

কেস্‌উইকের প্রাকৃতিক পরিবেশ মার্গারেটের তরুণ মনে দোলা দিলে। বিশেষ করে প্রার্থনার সময় গির্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনলে তার মনে অপূর্ব এক আনন্দ ও দিব্যানুভূতির প্রকাশ হতো। সে চোখ বুজিয়ে ধ্যান করতো। ধ্যান করার সময় তার মনে হতো জগতের মহামানব এবং ত্যাগী সাধুপুরুষগণ একে একে তার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন। তাকে হাত তুলে আশীর্বাদ করে আবার চলে যাচ্ছেন। মার্গারেট তাদের আশীর্বাদের পরশ পেয়ে অন্তরে উপলব্ধি করলে গভীর এবং প্রেমঘন আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। তার মন তখন বিচরণ করতে লাগলো অন্য এক অপূর্ব আনন্দময় জগতে যেখানে রাগ নেই, দ্বেষ নেই, দুঃখ নেই, শোক নেই। আনন্দ আর আনন্দ— অনাবিল অমৃতময় সে আনন্দ। সেই আনন্দের বন্যায় মার্গারেটের মন ভেসে বেড়াতো, বিশেষ করে সে যখন প্রার্থনার জন্যে আসতো গির্জার বেদীর কাছে।

এইসময় সে ভাবতে লাগলো ক্যাথলিক মঠে যোগ দেবার কথা। তার মন ক্ষণে ক্ষণে উদাসীন হয়ে পড়তো। বিদ্যালয়ে পড়াশুনো করার সময় যেমন তার মন মাঝে মাঝে পলাতক হতো দূর এক কল্পনার রাজ্যে পরে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেও তার মন সেইরকম ভাবে কল্পনারাজ্যের উদ্দেশে ধাবিত হতে লাগলো। তাই সে বিদ্যালয় থেকে বাড়ীতে ফিরেও শান্তি পেত না। মা, ভাই ও বোনের সঙ্গে ভালভাবে আগেকার মত আর মিশতে পারতো না। আগেকার দিনে মার্গারেটের ভেতর কেমন যেন এক হাসিখুশী ভাব ছিল। সকলের সঙ্গে মেলামেশা করার এক গভীর

এবং সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষা ছিল। এখন থেকে সে ক্রমশই গম্ভীর হয়ে উঠলো। তার ভাবনাও দু'পাখা মেলে উড়ে চললো অনির্বচনীয় কোন আধ্যাত্মিক রাজ্যে। এই অবস্থায় বাড়ীতে ফিরেও সান্ত্বনা পেলে না মার্গারেট। বোন মের মন রাখা দায়। মেরী নোবলের মনও মার্গারেটের সঙ্গে মিলতো না। তাই মার্গারেট বাড়ীতে থাকলে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতো, মনে হতো সে যেন পিঞ্জরাবদ্ধ এক বনবিহঙ্গ। বাড়ীতে থেকে এরকম বন্দীর মত জীবন অসহ্য হয়ে উঠতো মার্গারেটের। তাই সে কেসউইকের মত মুক্ত এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশে দ্রুত ফিরে আসার জন্যে তৈরী হতো। মা মেরী নোবলের চোখে সেটা হতো দৃষ্টিকটু। তিনি ভাবতেন অন্য কথা। মেয়ে যে কুলধর্ম রক্ষা করে চলতে পারে না তার জন্যে তাঁর মানসিক অতৃপ্তির সীমা ছিল না। তবু তিনি ছোট ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সবকিছু মানিয়ে চলতে চেষ্টা করতেন।

আদর্শ শিক্ষিকার মত জীবন যাপন করতে চাইতো মার্গারেট। সে যে আদর্শ খ্রীষ্টান, তা সে কাজে পরিচয় দেবে, কথায় নয়। মানুষের সেবা করাই হচ্ছে পৃথিবীর সকল ধর্মের সার কথা। সেই সার কথা পালন করে মার্গারেট। মানুষের সেবার মধ্যে বিলিয়ে দেবে নিজেকে। খ্রীষ্টধর্মের আদর্শও তাই। এই সঙ্কল্প নিয়ে সে কেসউইক ছেড়ে চলে এলো রাগ্‌বির অনাথ-আশ্রমে। এখানে থেকে সে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যব্রত নিলে। এই আশ্রমে কয়েকজন অনাথা মেয়ে থাকতো। তাদের এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হতো যাতে তারা গৃহস্থবাড়ীতে গিয়ে গেরস্থালির কাজকর্ম করতে পারে। মার্গারেট তাদের সেইভাবে শিক্ষা দিলে এতটুকু কার্পণ্য না ক'রে। প্রায় এক বছর কাল রইলো সেখানে। তারপর আবার শিক্ষাব্রতীর জীবন বেছে নিলে। রেক্সহ্যামের সেকেণ্ডারী স্কুলে শিক্ষকতার পদ পেলে

মার্গারেট। তখন তার বয়স মাত্র একুশ। রেক্সহ্যাম শহরটি খনি-অঞ্চলের মধ্যে গড়ে উঠেছে। ওখানকার বিত্যালয়ে পড়তে আসে খনি-অঞ্চলের শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা। শহরের মাঝখানে একটা গির্জা আছে। সেখানে নাম লেখালে মার্গারেট। স্কুল থেকে ফিরে দিনের বাকি সময়টা কাজ করবে সে সেবাব্রতীর ভূমিকা নিয়ে। তার মন সর্বদা চায় দরিদ্রের সেবা করতে। সে এমনভাবে মনপ্রাণ নিয়োগ করলে দরিদ্রের সেবায় যে তার অদ্ভুত কর্মধারা দেখে সকলে বিস্মিত হলো। এমন সেবাব্রতী এবং নিষ্ঠাপরায়ণা কন্যা তো সচরাচর চোখে পড়ে না। গির্জার কর্তৃপক্ষরা বিস্মিত হলেন। কিন্তু তাঁরা পরে মার্গারেটের কাজ সমর্থন করলেন না। গরীব লোক দেখলেই তাদের ছুঃখছুর্দশার কথা জানাতো চার্চের কর্তৃপক্ষের কাছে, তারা চার্চে যোগ দিক বা না দিক, ধর্ম মানুক আর না মানুক। চার্চের কর্তৃপক্ষ কিন্তু মার্গারেটের এই অবাস্তর প্রস্তাব মেনে নিলে না। তাঁরা স্পষ্ট বললেন, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে পরের সেবা করা, কিন্তু যারা গির্জার নিয়মকানুন মানবে না বা এখানে এসে উপাসনায় যোগদান করবে না—তারা যত দরিদ্রই হোক না কেন, তাদের সেবা করার ক্ষমতা আমাদের নেই।

তাঁদের এই প্রকার অমানবতাপূর্ণ যুক্তি শান্তচিত্তে মেনে নিতে পারলে না মার্গারেট। দীন-ছুঃখীদের প্রতি এরকম পক্ষপাতছুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী কিভাবে সহ্য করবে সে! তাই একদিন সকলকে অবাক করে দিয়ে গির্জার খাতা হতে নিজের নাম কাটিয়ে নিলে। এবার থেকে সে স্বাধীনভাবে দীনছুঃখীদের ছুঃখের প্রতিকারের জন্যে কর্মে রত হলো। তরবারির তুলনায় লেখনীর শক্তি অধিক, এই প্রবাদের ওপর বিশ্বাস ছিল তার। সেই বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর তার ভাবীকালের কর্মের সূচনা করলে। চার্চ থেকে পদত্যাগ করে সে ওখানকার ছুরভিসন্ধিমূলক কার্যকলাপ প্রসঙ্গে একটি

খোলা চিঠি লিখলে 'নর্থ ওয়েল্‌স্‌ গার্ডিয়ানে'। এর পর থেকে মার্গারেট একের পর এক প্রবন্ধ লিখলে ঐ পত্রিকায়। বিভিন্ন প্রকার ছদ্মনামে প্রবন্ধগুলি প্রকাশ হতে লাগলো। তার ছদ্ম-নামগুলির মধ্যে ছিল 'ডবলিউ নীলাস', 'জনৈকা জরতী' এবং 'অন্ত্যজ' প্রধান। পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার ফলে কিছু টাকাও পেলে মার্গারেট। সেই অর্থ দিয়ে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্মে সে পত্তন করলে একটি লঙ্গরখানা, একটি ডাক্তারখানা আর একটি চলন্ত লাইব্রেরী। এছাড়া এখানকার সংস্কৃতিমূলক কেন্দ্র এবং স্টেডিয়াম নির্মাণের তাগিদ দিয়েও নানারকম সৃষ্টিধর্মী প্রবন্ধ লিখতে লাগলো।

মার্গারেট যখন অফিস-অঞ্চলে চাঁদা আদায় করে বেড়াতো, তখন তার সঙ্গে আলাপ হলো একজন তরুণের। তার বয়স তেইশ বছর। কোন কেমিক্যাল ল্যাবরেটরির ইঞ্জিনীয়ার। বাড়ী তার ওয়েল্‌স্‌-এ। তরুণের মায়ের সঙ্গেও আলাপ হলো মার্গারেটের গির্জার এক অনুষ্ঠানে। ওর কাজ ও পড়াশুনো নিয়ে বেশ আলাপ-আলোচনা হতো। তারপর থেকে মার্গারেট প্রায়ই আসা-যাওয়া করতো ঐ ইঞ্জিনীয়ারের বাড়ীতে। ক্রমে তার সঙ্গে গভীর প্রণয় জমে উঠলো। উভয়ের মধ্যে মনের মিল হওয়াতে একদিন প্রস্তাব জানালে বিবাহের কিন্তু মার্গারেটের ভাগ্যে সুখ লেখেন নি বিধাতা। কিছুদিন পরে মার্গারেটের পিতা যে অসুখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল, এই তরুণটিও ঠিক সেই অসুখে প্রাণ হারালে। মার্গারেটের জীবনস্বপ্ন হয়ে গেল বৃথা। ঘরবাঁধার আকাঙ্ক্ষা হলো অস্তমিত। সে তখন দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে সুখের সন্ধানে ছুটে চললো। রেক্সহ্যাম আর তার কাছে প্রিয় বলে বোধ হলো না। সে তখন অন্য জায়গায় দরখাস্ত করলে বদলির জন্মে। কয়েক সপ্তাহ পরে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সে রেক্সহ্যাম ত্যাগ করে চলে এলো চেস্টারে।

৬

শিক্ষাব্রতী মার্গারেট

নতুন জায়গায় এসেও শান্তি পেলে না মার্গারেট। সে চায় সঙ্গী। মনোমত সঙ্গী না পাওয়ার জন্যে তার মনে জাগলো বিরক্তি। তাই সে ঠিক করলে তার নিঃসঙ্গ জীবনে মনোমত সঙ্গী পেতে হলে অধ্যয়ন আবশ্যক। শিক্ষাজীবনে পুনরায় প্রবেশ করার জন্যে তার মন তৈরী হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে সে নিজের আত্মীয়-স্বজনকে কাছে পাবার জন্যে ব্যস্ত হলো। ভাবলে, মাকে আর চাকরি করতে দেবে না। ছোট বোন যে তো এখন একটা চাকরি পেয়েছে। লিভারপুল শহরে শিক্ষয়িত্রীর কাজ। ভাই রিচমণ্ড পড়ে লিভারপুল কলেজে। চেস্টার থেকে লিভারপুল মাত্র বারো মাইল। সপ্তাহে দু'দিন মার্গারেট ভাই ও বোনের সঙ্গে দেখা করে আসতে পারে। মাকে লিভারপুলে নিয়ে আসার জন্যে চেষ্টা করলে মার্গারেট। মাকে চিঠির পর চিঠি দিলে, তোমাকে আর কাজ করতে হবে না। তুমি লিভারপুলে চলে এসো। আমরা দু'টি বোন তো রোজগার করছি। তাতে করে যেভাবেই হোক চলে যাবে আমাদের সংসার।

বড় মেয়ের চিঠি পেয়ে খুশিতে ভরে উঠলো মেরী নোবলের মন। তিনি চলে এলেন লিভারপুলে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে। এভাবে মার্গারেট মাঝে মাঝে কাজের অবসরে মা, ভাই আর বোনদের সঙ্গে মেলামেশা করে বেশ আনন্দ পেতে লাগলো।

শিক্ষয়িত্রী-জীবনে চারটি বছর কেটে গেল মার্গারেটের। এবার পাঁচ বছরে পদার্পণ করলো তার শিক্ষয়িত্রী-জীবন। এখন থেকে তার জীবনে প্রকাশ পেল বিচিত্র এক অনুভূতি। বড়দের পড়াতে

পড়াতে সে জানতে পারলে, তাদের মনের গতি ঠিক ঠিকপথে চালিত হয় নি। তারা যা হতে চায় বা হতে চেয়েছিল তা তারা হতে পারে নি বা হতে পারছে না। তাদের মনের সেই আদিম প্রার্থনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে জগদ্দল এক বাধা। সেই বাধার মূল অনুসন্ধান করতে ব্রতী হলো মার্গারেট। সে শিশুদের মন ও শিক্ষা নিয়ে দিনরাত পড়াশুনো করতে লাগলো। শিশুমন ও তাদের শিক্ষাপদ্ধতির উন্নতির জন্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় মনীষীরা যেসব বিষয় চিন্তা করেছেন, তাঁদের কথা মার্গারেট মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলো। সুইজারল্যাণ্ডের পেস্তালোৎসি আর জার্মানীর ফ্রোবেল এই দু'জন মনীষী শিশুশিক্ষা নিয়ে যেসব কথা বলেছেন বা চিন্তা করেছেন, তার তুলনা দুনিয়ায় মেলা ভার। মার্গারেট তাঁদের লেখা বই পড়তে লাগলো। এই সঙ্গে সে লিভারপুলের কয়েকজন শিশুমন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করলো। তাঁদের মধ্যে অন্যতমা হলেন মিসেস ডি-লীউ। তিনি ছিলেন ডাচ-মহিলা। তিনি মার্গারেটের মনে শিশুশিক্ষা প্রসঙ্গে অসাধারণ কৌতূহল দেখে আনন্দিত হলেন। একদিন মার্গারেটকে একান্তে আহ্বান জানিয়ে বললেন, আমি বা আমরা কয়েকজন লজম্যানরা শিশুদের মন ও শিক্ষা সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে তৈরী করার ব্রত গ্রহণ করেছি। এই নিয়ে আমরা অনেকদিন ধরে অনেক কথা ভেবেছি এবং অনেকের সঙ্গে আলাপ করেছি। তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছ দেখে খুশী হয়েছি।

মার্গারেট হেসে বললে, আমিও নিজেকে গর্বিত বোধ করছি আপনাদের সঙ্গে মিলতে পারার জন্যে। কেননা, আমার মনে বর্তমানে এক প্রশ্ন এসে দেখা দিয়েছে। শিশুরাই জাতির ও দেশের ভবিষ্যৎ। অথচ তাদের প্রতি আমাদের তেমন দৃষ্টি নেই। আমরা নিতান্ত অবহেলাভরে তাদের মানুষ করে তুলি। তাদের মনের বিকাশের ধারা এবং কিভাবে সেই ধারাকে সুশিক্ষিত, মার্জিত

এবং সমাজ-সংসারের কল্যাণের কাজে লাগাতে পারা যায়, তার কোনরকম প্রচেষ্টাই আমরা করি না। এখন আমাদের কাজ হবে তেমনধারা সুন্দর ও সৎ উপায় অনুসন্ধান করে বের করা যার দ্বারা আমরা আমাদের দেশের ভাবী সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারবো।

মার্গারেটের কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন ডি-লীউ। তিনি মার্গারেটের এই সুন্দর যুক্তিকে স্বাগত জানালেন এবং লজম্যানদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে প্রস্তাব পেশ করলেন। মার্গারেট তাই করলে। অবসরসময়ে সে কখনো নিজের ঘরে বসে আত্মবিশ্লেষণ করতো—ভাবতো তার বিগত জীবনের কথা। বিশেষ করে শৈশবকালের কথা। তখন তার মনে যে স্বাধীন সত্তার প্রকাশ হয়েছিল এবং তার দাদু ও বাবা তাকে যেভাবে উৎসাহ দিয়েছিলেন, তার সুন্দর ও সফল পরিণাম এখন সে বুঝতে পারছে। সেও চাইতো শিশুমনকে এইভাবে গড়ে তুলতে। এই উদ্দেশ্যে সে লজম্যানদের ফ্ল্যাটে এসে দিনের পর দিন আলাপ-আলোচনা করতে লাগলো। লজম্যানরা তাদের বাসার মধ্যে একটা ছোট বিদ্যালয়ও খুললে পরীক্ষামূলকভাবে। মার্গারেট সেই বিদ্যালয়ে যোগদান করলে। সেখানে কয়েকজন তরুণ লেখকদের সঙ্গে পরিচয় হলো মার্গারেটের। তারা একটি ক্লাব খুলেছিল। তার নাম 'গুড সান্‌ডে ক্লাব'। মার্গারেট সেই ক্লাবে উৎসাহী সভ্যা হলো এবং নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতে লাগলো। সেইসঙ্গে নিজের পারিবারিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রসোত্তীর্ণ গল্প রচনা করতে লাগলো। মেরী নোবল মার্গারেটকে তার পুরোনো দিনের কথাগুলি গল্পাকারে বলতো। তাই শুনে নিয়ে মার্গারেট লিখে যেতো একটির পর একটি গল্প। ক্লাবের সভ্যরা সেই গল্প পাঠ করে আনন্দিত হতো। কেবল সভ্যরা কেন, অনেক নাগরিকও যোগদান করতো ক্লাবের প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে।

এভাবে ছ'টি বছর কাটিয়ে দিলে মার্গারেট তার নতুন ভাবের জীবনে। একদিন মিসেস ডি-লীউ এসে তাকে বললেন, মার্গারেট আমি স্থির করেছি লণ্ডনে গিয়ে ছোটদের জন্যে একটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবো। তুমি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবে কি?

ডি-লীউর কথা শুনে আনন্দিত হলো মার্গারেট। বললে, হ্যাঁ যাবো। তবে আর একটু বিলম্ব হবে আমার যেতে। কেননা, চুক্তি-অনুযায়ী এখানে আমাকে বেশ কিছুদিন থাকতে হবে।

মিসেস ডি-লীউ বললেন, বেশ তাই হবে।

এরপর কিছুদিন চেস্টারে কাটিয়ে মার্গারেট তার মা-বোন আর ভাইকে নিয়ে চলে এলো লণ্ডনে। বোন মে চাকরি ছেড়ে দিলে।

লণ্ডনে আসার পর উইম্বল্ডনের একটি ছোট্ট বিদ্যালয়ে যোগ দিলে মার্গারেট। চার থেকে ছ'বছরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হলো এই বিদ্যালয়। পঞ্চাশের ওপর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা। তারা পূর্ণ-স্বাধীনতা নিয়ে যে যার ইচ্ছামত খেলার ছলে এক এক বিষয়ে পড়াশুনো করতে লাগলো। মার্গারেট এমনিধারা মুক্ত জীবন ও তার গঠনই আশা করেছিল। সাধারণ বিদ্যালয়ের মত ধরাবাঁধা শিক্ষয়িত্রীর জীবন সে চায়নি। সে স্বাধীনভাবে স্বাধীন মন নিয়ে শিক্ষা দেবে স্বাধীনতার আবেষ্টনীর মধ্যে। শিশুদের মন সুন্দর আর সরল। তাদের মধ্যে সুষ্ঠু চিন্তাধারা এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাবধারা ষোলকলায় ফুটিয়ে তুলতে মন-প্রাণ সমর্পণ করলে মার্গারেট। শিশুদের প্রকৃতি ও গতিবিধি লক্ষ্য করতো মার্গারেট। কোন্ শিশু কি করতে চাইতো বা কোন্ শিশুর মন কিরকম, তাই চিন্তা করে সেই কাজে নিযুক্ত করতো তাদের। এইভাবে তাদের মন কোন এক বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে আনন্দ পেত মার্গারেট।

এমনিভাবে তার জীবন এগিয়ে চললো। অবসরসময়ে সে লেখাপড়া নিয়ে থাকতো। লণ্ডনে সেই সময় একটি সমিতি ছিল।

তার নাম 'আধুনিক-শিক্ষা-সমিতি'। তার সভ্যা হলো মার্গারেট। বিভিন্ন স্থানে সমিতির পক্ষ থেকে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলো। তার বক্তব্যের মূল কথা হলো, শিশুদের স্বাধীনতা দিতে হবে যাতে করে তারা নিঃসঙ্কোচে বেড়ে উঠতে পারে। শিশুদের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ-মমতা দেখানোই হচ্ছে পাপ। যেসব মাতাপিতারা শিশুদের অত্যধিক স্নেহ দেন তাঁরা প্রকারান্তরে তাদের ক্ষতিই করেন। অত্যধিক স্নেহবশত যেসব মাতাপিতা তাঁদের সন্তানদের কাছে কাছে রাখেন, তাঁরাও প্রকারান্তরে ক্ষতিই করেন সন্তানদের। শিক্ষকেরাও কম ক্ষতি করেন না ছাত্রদের। যেসব ছাত্ররা যে বিষয়ে মনোযোগী নয়, যারা স্কুলের পঠন-পাঠন ঠিক ঠিক বুঝতে পারে না, তাদের ওপর জোর করে সেইসব পাঠ্য-বিষয় চাপিয়ে দেন। এতে করে শিশুদের মনের চিন্তা বা ভাবধারা যায় ভিন্ন পথে। উত্তর-জীবনে তারা হয়ে ওঠে ভিন্ন মানুষ। এভাবে তাদের বিকাশোন্মুখ ভাবী জীবনের পথ সঙ্কটাপন্ন ও গতিরুদ্ধ হয়ে যায়। জীবন তখন সফল না হয়ে ভারবাহী হয়ে ওঠে।

মার্গারেটের সুচিন্তিত বক্তৃতাগুলি কেউ না শুনে পারতো না। তার অনেকগুলি বক্তৃতা জনসাধারণের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠলো। এইভাবে মার্গারেট শিশু-বৃদ্ধ সকলের কাছেই প্রশংসা ও স্নেহ পেতে লাগলো।

বিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিতো মার্গারেট। তারপর বাড়ীতে এসে সে পড়াশুনো করতো। সেক্সপীয়রের নাটকগুলি তার কাছে খুবই প্রিয় ছিল। ভাই রিচমণ্ডকে অবসরসময়ে সেক্সপীয়রের নাটকগুলি পড়ে শোনাতো। সময় সময় রিচমণ্ড তার ভাবুক দিদিকে নিয়ে যেতো থিয়েটার-হলে। সেখানে সেক্সপীয়রের কোন নাটকের অভিনয় হলে তো কথাই থাকতো না। মনোযোগ দিয়ে শুনতো মার্গারেট। কেবল কবি সেক্সপীয়রের নাটক ভাল লাগতো মার্গারেটের এমন কথা

বলা উচিত নয়। ফরাসীদের অনেক বিখ্যাত কবি ও নাট্যকারের লেখা বইও মনোযোগ দিয়ে পড়তো মার্গারেট। সময়সময় সেগুলির অভিনয়ও দেখতে যেতো অপেরা-হাউসে।

লিভারপুলে বীটিদের দুই ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ হলো মার্গারেটের। বড়টি হলেন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি। তিনি লিখেছেন 'জুড় দি অব্‌স্কিওর'। আর ছোটটির নাম অক্‌টেভিয়াস্‌। তিনি হলেন সাংবাদিক এবং 'উইম্বলডন্‌ নিউজ'-এর সম্পাদক। মার্গারেট বড়টির নাম দিলে কবি। এই কবিকে ঘিরে সেইসময় একদল লেখকদের জটলা হতে থাকে। কবি মার্গারেটকে সেই লেখকদলের 'মক্ষিরানী' বলে অভিহিত করলো।

ক্রমে অক্‌টেভিয়াস তার পত্রিকায় মার্গারেটের লেখা বুয়রযুদ্ধ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলে। ঐসব প্রবন্ধে মার্গারেটের নতুন চিন্তাধারার প্রকাশ দেখা গেল। এছাড়া 'ডেলি নিউজ', 'রিভিউ অব্‌ রিভিউজ্‌' 'রিসার্চ' প্রভৃতি পত্রিকায় মার্গারেট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখলে। এগুলির মধ্যে বেশীর ভাগ প্রবন্ধ ছিল রাজনীতি আর বিজ্ঞান বিষয়ক।

বিদ্যালয়ে পড়ানো এবং নিজস্ব লেখাপড়ার কাজ ছাড়াও আর একটি কাজ ছিল মার্গারেটের। সেইসময় লণ্ডনে 'ফ্রী আয়র্ল্যাণ্ড' নামে এক বিদ্রোহী-সম্প্রদায় ছিল। মার্গারেট তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে স্বদেশের স্বাধীনতার কথা নিয়েও আলাপ-আলোচনা চালাতে লাগলো। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় গোপনে বিদ্রোহীদের নিয়ে সভা বসতো। সভায় দেশের স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা হতো। ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডে গড়ে উঠলো আর একটি বিদ্রোহী দল।

একদিন রাশিয়ার জনপ্রিয় বিপ্লবী-নেতা প্রিন্স পিটার ক্রপট্‌কিন এলেন বিদ্রোহীদের সঙ্গে দেখা করতে। মার্গারেটের মনে অনেক দিনের বাসনা সে দেখা করবে ঐ বিপ্লবীর সঙ্গে। এবার তাঁকে

তার সামনে দেখতে পেয়ে খুব খুশী হলো মার্গারেট। এই প্রসঙ্গে 'যুগবাণী' শারদীয়া সংখ্যা ১৩৭৩ সালের 'নিবেদিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখা হয়েছে: 'নিবেদিতার পিতা ছিলেন বিপ্লবী। আলস্টারের জঙ্গলে বিপ্লবী পিতার সঙ্গে কন্যা ঘুরেছিলেন, বিপ্লববাদে দীক্ষা নিয়েছেন। বিপ্লবের টেকনিক আরও ভালভাবে আয়ত্ত করবার জন্য শিক্ষালাভ করতে গিয়েছেন রাশিয়ার বিখ্যাত বিপ্লবী-নেতা ক্রপট্‌কিনের কাছে। রাশিয়ার জার তখন বৈপ্লবিক নিহিলিস্ট-সংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। নিহিলিস্টদের হাতে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু ঘটেছে। লণ্ডনে আইরিশ বিপ্লবের যতগুলি কেন্দ্র ছিল নিবেদিতা তার সবগুলির পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজে বোমা তৈরি করতে পারতেন।'

বিখ্যাত বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কিন্তু এসব কথা বিশ্বাস করতেন না। তাঁর সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার আলাপ ছিল। তিনি জানতেন নিবেদিতা ছিলেন মনে-প্রাণে জাতীয়তাবাদী। তিনি এ দেশের মুক্তি-আন্দোলন সমর্থন করতেন, সংগ্রামবাদীদের উৎসাহ দিতেন কিন্তু তিনি নিজে কখনো এই সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নেন নি। অন্তরাল হতে মুক্তি-যোদ্ধাদের অনুপ্রেরণাই দিয়ে এসেছেন। কি নিজের দেশ আয়র্ল্যাণ্ডে কিবা ভারতে সর্বত্র মুক্তি-সংগ্রামের অন্তরালে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে এসেছেন নিবেদিতা। শিক্ষা ও ধর্মের মাধ্যমে জনসাধারণের বিবেক ও আত্মিক শক্তির জাগরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। কেননা তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী নারী। তিনি বুঝেছিলেন জনসাধারণের মনকে যদি একবার ঠিকভাবে গড়া যায়, তাহলে দেশে বিপ্লব আসতে দেরী হবে না;—প্রচলিত পুরোনো রীতি-নীতি বদলে দিতে পারবে। সবদিক হতে মঙ্গল আসবে দেশে।

অনেকে নিবেদিতার জীবনে এই বৈপ্লবিক অনুপ্রেরণা অন্যভাবে

লক্ষ্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন অধ্যাপক ও ঐতিহাসিক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ও অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: '...বাংলার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় নিবেদিতার পরোক্ষ প্রেরণা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না, কিন্তু গিরিজাবাবুর গ্রন্থে এই আইরিশ ভগিনীর বিপ্লব-বাদী কর্মের গুরুত্ব অযথা বাড়ানো হয়েছে।'...(স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ—হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়—পৃঃ ১৬৫)। লণ্ডনের শহরতলিতে ঈলিং নামে এক ছোট্ট শহরে সস্ত্রীক বাস করতেন ক্রপট্‌কিন। তিনি ছিলেন নির্বাসিত নেতা। নিজের নিজের মনোমত ভূমিকা নিয়ে স্বদেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে মন-প্রাণ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বলে সেখান থেকে নির্বাসিত হয়ে চলে এসেছিলেন লণ্ডনে। মার্গারেট প্রায়ই দেখা করতে আসতো ক্রপট্‌কিনের সঙ্গে তাঁর বাসায়। তাঁর মুখে শুনতো নানারকম রাজনৈতিক কথা। ক্রপট্‌কিন বললেন, তোমরা আগ্রহভরে রাশিয়ার দিকে তাকিয়ে আছো। সেখানে তলে তলে সাম্যবাদের আন্দোলন সারা দেশকে কাঁপিয়ে তুলছে। তোমরা তাদের কথা নিয়ে ভাববে এবং আলোচনা করবে কিন্তু অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করবে না। তোমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলন হচ্ছে অন্য বস্তু। আর এক কথা জেনে রাখো, সকল দেশের মানুষের স্বাধীনতা-আন্দোলন একরকমের হয় না। স্বাধীনতা-কামী বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতা-আন্দোলনের পৃথক পৃথক ধারা আছে। সেই ধারায় তারা নিজস্ব পথ কেটে চলে। এর ফলেই ঘটে তাদের ক্রমোন্নতি। স্বাভাবিক বিবর্তনই যখন দ্রুততর গতিতে ঘটে, তখন তাকে বলে বিপ্লব। ওটা যে ভুঁইফোঁড় নয় এবং ধীরে ধীরে আসে এ-কথা সহজে ভুলে গেলে চলবে না।

এভাবে ক্রপট্‌কিনের কাছে অনুপ্রেরণা পেয়ে অনেকে স্বদেশের

মুক্তি-আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলে। মার্গারেটও খুশী হলো তার মনের মত আলাপ-আলোচনা শুনে।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে ডি-লীউ-এর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলো মার্গারেটের। সে উইম্বলডনের অন্য এক জায়গায় একটি নতুন ধরনের স্কুল খুললে, তার নাম 'রাস্কিন স্কুল'। সেখানে ছোটদের যেমন শিক্ষা দেওয়া হবে, তেমনি বড়রা এসেও শিশু-মনস্তত্ত্ব আর শিশুশিক্ষা নিয়ে গবেষণা করতে পারবে। মার্গারেটের ডাকে অনেক গুণীজ্ঞানী মানুষ এসে তার স্কুলে দিনের পর দিন গবেষণা চালালেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিখ্যাত চিত্রকর মিঃ এবেনজার কুক্। এই শিল্পী আঁকতেন শিশুদের জন্যে ছবি। লণ্ডনশহরে তাঁর খুব নামডাক। এঁর কাছেই মার্গারেট ছবি আঁকার নিয়মকানুন শিখে নিয়েছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে ভারতে এসে এখনকার শিল্পীদের মধ্যে নতুন প্রেরণা জুগিয়েছিলেন।

এরপর মার্গারেটের সঙ্গে আলাপ হলো লেডি রিপনের। লেডি রিপন ছিলেন কুকের অন্যতম বান্ধবী। তিনি মার্গারেটকে প্রীতির নজরে দেখতে লাগলেন। মার্গারেট প্রায়ই ওঁর 'সেলুনে' গিয়ে শিল্প ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতো। ক্রমে ওটি পরিণত হলো একটি নামজাদা ক্লাবে। নাম হলো 'সিসেম ক্লাব'। 'সেণ্ট জেমস্ গেজেট'-এর সম্পাদক আর্. ম্যাকনীল ও মার্গারেটের অক্লান্ত চেষ্টায় ডোভার ষ্ট্রীটের ওপর গড়ে উঠলো ক্লাবটি। এখানে জগৎ-বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং বৈজ্ঞানিকরা আসতেন নানাবিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে। এই ক্লাবে মার্গারেটের সঙ্গে একদিন দেখা হলো লেডি ইসাবেলের সঙ্গে। তিনি অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে মার্গারেটের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন শিশুশিক্ষার নানা-রকম সমস্যা নিয়ে।

ক্রমে মার্গারেট 'সিসেম ক্লাব'-এর দক্ষিণহস্ত হয়ে উঠলো। সে হলো ক্লাবের অন্যতম বক্তা ও সেক্রেটারী। 'শিশু মনস্তত্ত্ব' আর

'নারীর অধিকার' নিয়ে বক্তৃতা দিতো দিনের পর দিন। ম্যাক্লীন যতদূর পারতো ওকে সাহায্য করতো। সেও উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের মানুষ। রাজনীতি করতো। তবে তার মতবাদ ছিল ভিন্নধরনের। ম্যাক্লীন ছিল গোঁড়া ইউনিয়নিস্ট আর মার্গারেট ছিল পুরো আইরিশ জাতীয়তাবাদী। ত্ব'জনের মধ্যে মতবাদ নিয়ে ভীষণ তর্কাতর্কি চলতো। তবে তা ছিল নিতান্তই বাহ্যিক ব্যাপার। তর্কের খাতিরে তর্ক মাত্র। তার জন্যে উভয়ের অন্তরের প্রীতি-ভালবাসা ক্ষুণ্ণ হয় নি।

এইভাবে অতি অল্পকালের মধ্যেই মার্গারেটের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। সে অনেক বিখ্যাত লোকের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেললে। যার জন্যে তার ভাগ্যে জুটে গেল অসংখ্য বন্ধু ও বান্ধবী। তাদের নিয়ে সে বেশ কোলাহলপূর্ণ জীবন উপভোগ করতে লাগলো। কিন্তু মনে মনে তার জীবন-স্বপ্ন মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইলো। সে নারী। তাই হতে চাইতো জননী। নারী-জীবন সার্থক ও সুন্দর হয়ে ওঠে সন্তানের জননীতে। এতদিন সে ছিল একা। এবার সে চাইলে একজন জীবনসঙ্গী। তার ভাবী জীবনকে ভরিয়ে তুলবে সন্তানের সাযুজ্য। তার প্রণয়ীর জন্যে সে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে রইলো। মা মেরী নোবল্ তাঁর ভাবী জামাতাকে দেখে পছন্দ করলেন। কিন্তু মার্গারেটের ভাগ্য বিরূপ। তাই সে টিকে থাকল না তার জীবনে। অন্য মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল তার প্রেমিকের। সুতরাং ঘরবাঁধার স্বপ্ন চিরকালের মত চুরমার হয়ে গেল মার্গারেটের। ভগ্নমন এবং ক্রন্দনাকুল অন্তর নিয়ে মার্গারেট ছুটে এলো হ্যালিক্যাক্সের মিস্ কলিন্সের কাছে।

মিস্ কলিন্সের প্রীতিলাভ করে ধন্য হলো মার্গারেট। তিনি এক সপ্তাহ রাখলেন মার্গারেটকে তাঁর কাছে। অনেকরকম প্রশ্ন করে মার্গারেটের কাছ থেকে জেনে নিলেন সব কথা। মার্গারেট তাঁর কাছে মনের সব লজ্জা ত্যাগ করে খুলে বললে

সমস্ত প্রণয়ব্যাপার। এর সঙ্গে তার স্বল্পকথাও জানালে মিস কলিন্সের কাছে। বললে, আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল। আমি আশা করেছিলুম অনেক, পুত্র, কন্যা, স্বামী, সংসার সবকিছু। কিন্তু বিধাতা আমার কপাল মন্দ করলেন। আমাকে সর্বসুখ হতে বঞ্চিত করলেন তিনি।

এই কথা বলতে বলতে মর্মান্তিক কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো মার্গারেট। তাই দেখে কলিন্স তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, জীবনে সুখ যেমন বাঞ্ছনীয়, তেমনি দুঃখও। কেবল সুখ চাইবে আর দুঃখ চাইবে না, এও কি কখনো হতে পারে! দুঃখ আসবেই আসবে। বরং তার জন্যে প্রস্তুত থাকো মার্গারেট। দুঃখের আঘাতে খুলে যাবে তোমার অন্তররাজ্যের দরজা। তার অভ্যন্তরে তুমি তখন দেখতে পাবে দিব্যজ্যোতি। ক্রমে তার মহিমা তুমি উপলব্ধি করবে আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার অন্তর আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠবে। তখন বোধ হবে, এই পার্থিব জীবনের সুখ-দুঃখ—সংসারের চাওয়া-পাওয়া সবই মায়া-মরীচিকা।

কলিন্সের কথা শুনে কতকটা শান্ত হলো মার্গারেট। কলিন্স পুনরায় মার্গারেটকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ধৈর্য ধরো মার্গারেট— আত্মস্থ হও। প্রভু নিশ্চয়ই তোমাকে কৃপা করবেন। তিনি যে প্রেমময়। মানুষের দুঃখ তিনি সইতে পারেন না। মানুষের অন্তরসাগরে প্রেমের তুফান তোলবার উদ্দেশ্যেই তিনি বইয়ে দিয়েছেন দুঃখের বিক্ষুব্ধ ঝটিকা। সুতরাং তুমি এই ঝটিকাকে ভয় কোরো না। একে তোমার ভয় করলে চলবে না। একে আসতে দাও। পরে দেখবে তুমি প্রেমপূর্ণ অন্তর নিয়ে এগিয়ে চলেছ প্রেমময় ঈশ্বরপুত্রের দিকে। তিনি তোমার প্রতি প্রীত হয়ে আশীর্বাদ করবেন। তাঁর আশীর্বাদ লাভ করলে তুমি হবে প্রকৃত সুখী, মনে-প্রাণে উপলব্ধি করবে পরম শান্তি।

এভাবে কলিন্সের কথাগুলি শুনে মনের মধ্যে খানিকটা শান্তি অনুভব করলে মার্গারেট। তারপর সে ফিরে এলো লণ্ডনে।

লণ্ডনে ফিরে এসে আবার পুরোনো জীবন যাপন করতে লাগলো মার্গারেট। বহির্জীবনের নানারকম কাজে নিজেকে সর্বদা জড়িয়ে রাখতো বলে তার মন দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা থেকে আস্তে আস্তে সরে এলো। তবু অন্তরের অন্তঃস্থল হতে গুমরে উঠলো একটা কাতর ক্রন্দন-সুর। কামনা-বাসনার সংসারজগতে চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বকে ঘিরে তার মন ক্ষণে ক্ষণে বিচলিত হয়ে উঠতো। অপর পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে মেলাতে বসতো তার জীবন। মাঝে মাঝে ভাবতো, সে বুঝি জীবনে কি মহামূল্য জিনিস হারাতে বসেছে। জীবনের আসল চাওয়া তো এখনো বাকী। সেইটা পেলে সে হবে পূর্ণ। তা নাহলে তার শূন্যহৃদয় সারাজীবন কেঁদে মরবে। এখন তার বয়স উনত্রিশ বৎসর। এই অল্পবয়সে সে অনেক কিছু লাভ করেছে। নিজের সৌভাগ্যবলে সম্মান এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সত্য, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সে সুখী নয়। সর্বদা নিঃসঙ্গ থাকার দুঃখ তাকে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললে, মাঝে মাঝে যন্ত্রণাদায়ক মোচড় দিলে। তাই মাঝে মাঝে তার মন ঈশ্বরের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। ভাবলে, ঈশ্বর দয়ালু নন, তিনি নিষ্ঠুর! অন্যকে সব দিয়েছেন, আর তাকে কেন বঞ্চিত রেখেছেন ব্যক্তিগত জীবনে? ঈশ্বর আছেন একথা বিশ্বাস করতো মার্গারেট। তথাপি তার মনে মাঝে মাঝে সংশয় ও সন্দেহ দোলা দিতো। সে ভাবতো যদি তিনি আছেন, তবে আমার অন্তর এমন হাহাকার করে কেন? দুঃখের গাঢ় তমসা কেন অন্তরকে ঘিরে থাকে? সমাজ-সংসারে আমার নাম বা প্রতিপত্তি হয়েছে। তার জন্যে আমার জীবনে কিছু

সুখ আসা উচিত। কিন্তু তা আসছে না। আমার মন সদাসর্বদা উচাটন হয়ে থাকে। কি যেন এক অজ্ঞাত বস্তু লাভের আশায় আমার মন সদাসর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে। তাকে দেখতে পাচ্ছি না। এই না-দেখতে পাওয়ার অশান্তি আমার মনে আরও জ্বালা ধরিয়ে দেয়, অন্তরকে ভরিয়ে দেয় অসীম ব্যাকুলতায়।

সময় সময় এই ধরনের ভাবনার মাঝে ডুবে যেতো মার্গারেট। তার চিত্ত হতো বিকল। সে নিজেকে স্থির রাখতে পারতো না। হয়ে যেতো অন্যমনা।

একদিন এমনিভাবে তন্ময় হয়ে ভাবছিল মার্গারেট। সেইসময় চিত্রকর কুক এসে বললে, শুনেছি তুমি ঈশ্বর সম্বন্ধে খুব চিন্তা করো। তার সম্বন্ধে কিছু জানার আগ্রহও তোমার খুব আছে। তাই বলছি, তুমি চলে যাও লেডি ইসাবেল মার্গসনের বাড়ীতে। তিনি কয়েকজন বন্ধুকে যেতে বলেছেন। সেখানে একজন সন্ন্যাসী এসেছেন।

নিতান্ত কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলে মার্গারেট, কে তিনি? কোথায় তাঁর বাড়ী?

কুক বললেন, শুনেছি তিনি ভারতীয়। তিনি একজন হিন্দু সন্ন্যাসী। এসেছেন পরাধীন ভারতবাসীর সযত্নলালিত সনাতন ধর্মের মুখপাত্র হয়ে।

মার্গারেট বললে, তাহলে আমি যাবো তাঁর বক্তৃতা শুনতে।

এই কথা বলার পর মার্গারেট চলে এলো সিসেম ক্লাবে। সেখানে সদস্যদের সঙ্গে এই হিন্দু সন্ন্যাসী সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করে জেনে নিলে খুঁটিনাটি অনেককিছু। ক্লাবে সেদিন উপস্থিত ছিলেন মিঃ স্টার্ডি এবং হেনরিয়েটা মুলার। এই স্টার্ডির বাড়ীতেই স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে এসে উঠলেন। এখানে বেশ কয়েকমাস কাটান। স্টার্ডি স্বামীজীর পরিচয় দিলেন মার্গারেটের কাছে। বললেন, উনি সম্প্রতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

থেকে ফিরেছেন। ওখানে শিকাগো শহরে বিরাট এক ধর্ম-সম্মেলন হয়। তার নাম বিশ্বধর্ম-সম্মেলন। বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মমতের মনীষীরা ঐ সম্মেলনে এসে বক্তৃতা দেন নিজেদের ধর্মমত-প্রসঙ্গে। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষ হতে গিয়েছিলেন হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হয়ে। প্রথমে তিনি ঐ সম্মেলনে বক্তৃতা দেবার সুযোগ পান নি। পরে পেলেন। তিনি বললেন, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। আমরা যাকে সত্য বলে আঁকড়ে ধরবো তাই ঈশ্বরের প্রতিভূ। তিনি দেশ কাল ও পাত্রভেদে বহুরূপে বিরাজ করছেন। এগুলি হচ্ছে তাঁর বিভূতির প্রকাশ। বিভিন্ন ব্যক্তির মত বিভিন্ন। তাই তারা সম্প্রদায়ে আর ধর্মে মিথ্যা ভেদাভেদ এনেছে। মূলে কিন্তু সকলেই সমান। সকলেই সেই এক ও অদ্বিতীয় পরমপুরুষের সন্তান। সেখানে কোন জাতিভেদ বা ধর্মসম্প্রদায়ের ঠাঁই নেই। সেখানে সকলেই এক। তাই বিশ্ববাসী সকলেই হচ্ছে ভাই-বোন। প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছেন তিনি। এই সত্যটুকু জানতে পারলে প্রত্যেকের অন্তরে আর বৈরীভাব থাকবে না। তখন সকলে সমবেত হবে এক মহামিলনের আঙিনায়।

তাঁর সুন্দর সরস এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শুনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রশংসা করলে। স্বামীজী সেখানে কেবল একদিনের জন্যে বক্তৃতা দেন নি। তিনি বেশ কয়েকদিন যাবৎ হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে একের পর এক বক্তৃতা দেন। সকলে সেই সব বক্তৃতা শুনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। এইভাবে স্বামীজী আমেরিকাবাসীদের মন চিরকালের জন্যে জয় করেন। ত্যাগী সন্ন্যাসী প্রায় রিক্তহস্তে সামান্য কিছু সম্বল করে আমেরিকায় পাড়ি দেন। কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর সামান্য অর্থ নিঃশেষিত হয়ে যায়। তিনি বড় অসুবিধায় পড়লেন। পরে ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁর কষ্টের লাঘব হলো। কয়েকজন শিষ্যশিষ্যাসহ লণ্ডনে আসার আগে একজন আমেরিকান ভদ্রলোক আরএকজন আমেরিকান মহিলাকে

সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা দেন স্বামীজী। পাঁচজনকে দেন ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা। এরাই ভাবীকালে আমেরিকায় স্বামীজীর স্বপ্ন সফল করে তুলবে। (এই লেখকের লেখা 'মহামানব বিবেকানন্দ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

স্টার্ডির মুখে স্বামীজীর প্রশংসার কথা শুনে মার্গারেটের মধ্যে অত্যধিক বাসনা জাগলো তাঁকে দেখবার।

একদিন অবসর বুঝে মার্গারেট এলো লেডি মার্গসনের ড্রয়িংরুমে। ঘরটির আবহাওয়া বেশ পবিত্র। জানালা ও দরজায় ঝুলছে পুরু পর্দা। ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে ধূপের সৌরভ। মাত্র জন পনেরো শ্রোতা। তাদের সামনে বসে আছেন এক যুবক ও সুশ্রী দেহসৌষ্ঠবযুক্ত সন্ন্যাসী। তাঁর পরিধানে গেরুয়া রঙের আলখাল্লা। কোমরে খুনখারাপি রঙের কোমরবন্ধ।

নিবেদিতার জীবনীকার শ্রীমতী লিজেল রেমঁ সেদিনকার সভার বেশ সুন্দর এক বিবরণ দিয়েছেন: 'ঘরে অন্তত জনপনেরো লোক। সবাই চুপ। ধূপের চড়া সুগন্ধ বাতাসে মিশছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী হয়ে। পুরো মাপের গেরুয়া আলখাল্লা আর খুনখারাপি রঙের কোমরবন্ধ-পরা স্বামী বিবেকানন্দ—বসলেন ঠিক মার্গারেটের মুখোমুখি। দীর্ঘ সুগঠিত শরীর, প্রসন্ন গাম্ভীর্যের একটা হিল্লোল তাঁকে ঘিরে……ও লক্ষ্য করে। প্রশান্ত আত্মসমাহিত পুরুষ, চারপাশে কি চলছে সেদিকে যেন খেয়ালই নাই। পিছনের কুণ্ডে আগুন জ্বলছে, তার পটভূমিকায় ওঁর ছবিটি। লেডি ইসাবেল যখন একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'স্বামীজী, আমাদের বন্ধুরা সবাই এসেছেন', তখন কেমন একটু মিষ্টি হাসলেন তিনি। দরজাটা টেনে দেওয়া হলো, পর্দা পড়ল। সব নিঝুম। শোনা গেল সন্ন্যাসীর সুরেলা কণ্ঠে প্রার্থনার মন্ত্র—'শিব শিব নমঃ শিবায়।'

'অনেকক্ষণ ধরে বললেন তিনি। বলার ভঙ্গিটি শান্ত, কণ্ঠস্বর পর্দায়-পর্দায় ওঠে-নামে। মাঝে-মাঝে এক-আধটা সংস্কৃত শ্লোক

বলে অনুবাদ করেন চমৎকার ইংরাজীতে।…(নিবেদিতা-শ্রীমতী লিজেল রেমঁ—পৃঃ ৫১) স্বামীজীর সুন্দর এবং সুমিষ্ট কথাগুলি প্রাণভরে শুনে যেতে লাগলো মার্গারেট। তার যুক্তিবাদী মন টলে উঠলো স্বামীজীর কণ্ঠে ভক্তি-বিশ্বাসের কথা শুনে। তাঁর সুন্দর স্বাস্থ্য এবং সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনে অভিভূত হয়ে গেল মার্গারেট। তার ওপর সে স্বামীজীর মুখে শুনলে নতুন কথা। ভক্তি ও বিশ্বাসকে সে এতকাল বিশেষ গুরুত্ব দেয় নি। তার যুক্তিবাদী মন জ্ঞানের বিচার দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরূপণ করার চেষ্টা করেছে। এবার স্বামীজীর মুখে ভক্তি ও বিশ্বাসের নতুন ব্যাখ্যা শুনে তার নাস্তিকঘেঁষা মন আস্তিক্য বুদ্ধিতে ভরে উঠলো। বিশেষ করে সে উপলব্ধি করলে, ঐ হিন্দু সন্ন্যাসীর চোখে, মুখে এবং কথাবার্তায় এমন এক সম্মোহিনী-শক্তি রয়েছে যার আকর্ষণে পাষাণ গলে জল হয়ে যায়, অতি বড় ক্রূর এবং পাষণ্ড ব্যক্তির কপট মনও ভরে ওঠে শান্তির সুষমায়। ছোটবেলায় ও বাবা এবং ঠাকুরদার কাছে শুনেছিল ভারতবর্ষের মুনিঋষিদের সম্বন্ধে নানারকম গল্প। তাঁরা নাকি বনে-জঙ্গলে হিংস্র বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গে মিতালি করে বাস করতেন। তাঁদের অমিত তপঃশক্তি হিংস্রতা নষ্ট করে দিতো ঐসব জন্তু-জানোয়ারদের।

এবার স্বামীজীর মধ্যে ঐপ্রকার সম্মোহিনী-শক্তি, পরকে আকর্ষণ করার মতো দৃষ্টিশক্তি, পরের মনকে জয় করার মত সুমিষ্ট বাক্‌শক্তি দেখে মোহিত হয়ে গেল মার্গারেট।

স্বামীজী একের পর এক বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। তিনি বললেন, 'মানুষ ভাবে তাকে ছাড়া ভগবানের বুঝি একদণ্ডও চলে না। কিন্তু ভগবান যে অনন্তস্বরূপ। তাঁকে মানুষ কি-বা দিতে পারে!……আঁধারের মাঝে আমরা যে হাতখানিকে দেখি আমাদের দিকে সে তো আমাদেরই হাত। আমরা আসন্তোর স্বপন-পসারী…সান্ত্যের স্বপ্নে বিহ্বল।

'মানুষ কি চায়? সে সুখও চায় না, দুঃখও চায় না। সে চায় মুক্তি। কেবল মুক্তি চাই। আমাদের যা কিছু তপস্যা তা কেবল মুক্তির জন্যে…'

চুপ করে স্বামীজীর কথাগুলি শুনলে মার্গারেট। ক্ষণিকের জন্যে তার মন চলে গেল শান্তির রাজ্যে। কিন্তু বেশীক্ষণ টিকে রইলো না। আবার ফিরে এলো যুক্তিতর্কের ওপর ভর করে। তার মনকে একবার নাড়াচাড়া দিয়ে নিলে। তবু তখনকার মত সবকিছু নীরবে সহ্য করে নিলে মার্গারেট। সেদিন তার কোন প্রতিবাদ জানালে না। সভায় উপস্থিত অন্যান্য মেয়েদের মধ্যে অনেকে বিরূপ মন্তব্য করলে: উনি কি আর এমন নতুন কথা বলেছেন। সবই তো পুরোনো।

যাহোক তিন সপ্তাহের মধ্যেই লণ্ডনে স্বামীজীর প্রশংসা ছড়িয়ে পড়লো। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে নানারকম মন্তব্য প্রকাশিত হলো।

ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেটের জনৈক সংবাদদাতা লিখলেন, 'স্বামীজী যখন কথা বলেন, তখন তাঁর মুখ বালকের মুখের মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মুখখানি এতই সরল, অকপট ও সদ্ভাবপূর্ণ… আমার সঙ্গে যত লোকের দেখা হয়েছে তার মধ্যে ইনি যে একজন প্রধান মৌলিক ভাবপূর্ণ ব্যক্তি, একথা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি।'

এমনি সব মন্তব্য করলে স্বামীজী-প্রসঙ্গে। কেউ কেউ আবার তাঁর বিরুদ্ধাচরণও করলে। তবে তার সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য।

ইসাবেলের ড্রয়িংরুমে একাধিকবার বক্তৃতা শুনেছিল মার্গারেট স্বামীজীর। সে যুক্তিপূর্ণ মন দিয়ে স্বামীজীর কথাগুলি শুনতো। সহজে মেনে নিতো না। ধারালো সমালোচনা করতো প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে।

মার্গারেটের মধ্যে এই প্রকার ভাব দেখে আনন্দিত হলেন

স্বামীজী। তিনিও গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ করার আগে এমনিধারা নানা সন্দেহ ও অবিশ্বাসপূর্ণ মন নিয়ে অনেক কাল অশান্তির মধ্যে কাটিয়েছেন। স্বামীজীও বেদান্তদর্শনের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে মার্গারেটের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে লাগলেন। শেষকালে মার্গারেট স্বামীজীর কাছে মন ও আত্মা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে। স্বামীজী বললেন, মন ও আত্মাকে জানতে হলে ঈশ্বরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে; বিশ্বাস রাখতে হবে গুরু আর বেদান্তবাক্যের ওপর। তবেই হৃদয়ে জাগবে উপলব্ধি। সেই উপলব্ধির পূর্ণ আলোয় প্রকাশ পাবে মন ও আত্মার স্বরূপ।

এবার স্বামীজীর কথা পুরোপুরি মেনে নিলে মার্গারেট। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এবং অনেকদিন অপেক্ষা করে মার্গারেট এবার সায় দিলে স্বামীজীর কথায়। তাঁর মহান্ তত্ত্বাদেশ ও বেদান্তব্যাখ্যা সত্য বলে মেনে নিলে মার্গারেট নিজের জীবনে। মনে মনে সে স্বামীজীকে গুরুরূপে বরণ করলে।

এভাবে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনে সমগ্র লণ্ডনবাসী মুগ্ধ হলো। তারা একদিন স্বামীজীকে বললে, শুনলুম আপনি নিউইয়র্কে যাবেন। যাবার আগে আপনার কাছ থেকে আমরা আরও কিছু শুনতে চাই।

রাজী হয়ে গেলেন স্বামীজী। পিকাডেলির প্রিন্স-হলে সভা বসলো। সেখানে বহু গুণী-জ্ঞানীরা এলেন স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে। স্বামীজীও সকলকে উত্তেজিত করে বজ্রকঠিন ভাষায় এক বক্তৃতা দিলেন: 'তোমাদের কলকব্জা, ছাপাখানায় যা না হয়েছে তার চাইতে খ্রীষ্ট বা বুদ্ধের কয়েকটা কথায় মানবসমাজে ঢের বেশী উপকার হয় নি কি? পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে নির্লজ্জ অনুদারতা, নিষ্ঠুর যুদ্ধপিপাসা আর নিদারুণ অর্থলোভ জড়িয়ে আছে। এ-সভ্যতাকে স্বীকার করতে গেলে যে মূল্য দিতে হয়,

শান্তিপ্রিয় হিন্দু কোনও দিন তা দেবে বলে কি তোমরা আশা করো ?'

স্বামীজীর এমনধারা জোরালো বক্তৃতা শুনে 'স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকা লিখলে, 'সেদিন এক ভারতীয় যুবক 'প্রিন্সেস্' হলে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের পর এক কেশবচন্দ্র সেন ছাড়া ভারতবাসীদের মধ্যে এরূপ উৎকৃষ্ট বক্তা আর কখনো ইংলণ্ডের বক্তৃতামঞ্চে দেখা যায় নি।......বক্তৃতা দেবার সময় তিনি মহাত্মা বুদ্ধ বা যীশুর দু'চারটি কথার তুলনায় রাশি রাশি কলকারখানা, নানারকম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও পুস্তকাদি দ্বারা মানুষের যে কত সামান্য উপকার সাধিত হচ্ছে সেই সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। বক্তৃতাটি তিনি যে আগে তৈরী করে রাখেন নি, এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। তাঁর কণ্ঠস্বর মধুর এবং বক্তৃতা দেবার সময়ে মুখে একটা কথাও বাধে না।'

মার্গারেট শুনলে স্বামীজীর বক্তৃতা। এর কিছুদিন পর স্বামীজী এক কৌতূহলী সাংবাদিককে বললেন, 'আমি কোনও গুপ্তবিদ্যা সমিতির পক্ষ থেকে মন্ত্র-তন্ত্রের কুহক দেখাতে আসিনি, আর ওসবেও কারও মঙ্গল হয় বলে বিশ্বাসও করি না। সত্য স্বপ্রকাশ, দিনের আলোয় প্যাঁচার মত মুখ লুকোয় না সে। সবাই তাকে যাচাই করে নিতে পারে।'.....

এই সত্যকেই এতদিন ধরে খুঁজছিল মার্গারেট। এবার স্বামীজীর কথা শুনে তার ওপর গভীর শ্রদ্ধা জাগলো। তাঁর আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে এগিয়ে এলো মার্গারেট। মনে মনে স্বামীজীকে আচার্যের সিংহাসনে বসিয়ে সত্যের স্বরূপ জানা ও তাকে জীবনে উপলব্ধি করার আপ্রাণ আকুলতা প্রকাশ পেল তার অন্তর-বাইরে।

স্বামীজীর সঙ্গে মার্গারেটের প্রথম দর্শন এবং পরবর্তীকালে তাঁর সুদৃঢ় প্রভাবের কথা স্মরণ করে মার্গারেট ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে

কোলকাতা থেকে লিখেছিল : 'মনে কর সে-সময় উনি যদি লণ্ডনে না আসতেন! এ-জীবনটাই তাহলে একটা কন্ধকাটা স্বপ্ন হয়ে থাকতো। কিন্তু আমি জানতুম কারও ডাক শুনতে পাবই। তার জন্যে একটা নিরন্তর প্রতীক্ষা আমার ছিল, ডাক এলো সত্যি। যদি অভিজ্ঞতা বেশী থাকতো, হয়তো সংশয় হতো, জীবনে শুভ লগ্ন এলেও মেনে নেওয়া হয়তো শক্ত হতো। আমার ভাগ্য ভাল, আমি কিছুই জানতুম না। তাই দোটানার যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পেয়ে গেছি।···ভেতরে আমার আগুন জ্বলতো, কিন্তু প্রকাশের ভাষা ছিল না। এমন কতদিন হয়েছে, কলম হাতে নিয়ে বসেছি অন্তরের দাহকে রূপ দেবো বলে—কিন্তু কথা জোটে নি। আর আজ আমার কথা বলে যেন শেষ করতে পারি না। দুনিয়ায় আমি যেমন আমার ঠিক জায়গাটি খুঁজে পেয়েছি, দুনিয়াও তেমনি আমারই অপেক্ষায় তৈরী হয়ে বসেছিল যেন। এবার তীর এসে লেগেছে ধনুর ছিলায়।···কিন্তু স্বামীজী যদি না আসতেন আমার জীবনে? যদি হিমালয়শিখরে ধ্যানে ডুবে থাকতেন? অন্ততঃ আমার কথা বলতে পারি···আমি তো এখানে আসতে পারতুম না···।'

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে লীলাসহচরী হবার জন্যেই যেন মার্গারেট নোবল পৃথিবীতে এসেছে। তা সে যে দেশেই জন্মাক না কেন, বিধির বিধানে এই দুই মহান্ আত্মা একত্রিত হয়ে ভারত তথা বিশ্বের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেছেন। ধন্য তাঁরা আর ধন্য এই পুণ্যভূমি—মহান্ তীর্থ ভারত।

৮

শিষ্যা হওয়ার প্রস্তুতি

কে তুমি? তোমায় আজও পর্যন্ত চিনতে পারলুম না। তোমার সুমিষ্ট ও সারগর্ভ বক্তৃতাবলী শুনে মুগ্ধ হয়েছি। তোমার প্রফুল্লিত হাস্যানন নিরীক্ষণ করে চমৎকৃত হয়েছি। তোমার অন্তরে সত্যের প্রতিষ্ঠা জেনে অভিভূত হয়েছি। তোমার হিন্দুধর্মের সপক্ষে বক্তৃতাগুলি একের পর এক মনোযোগের সঙ্গে শুনেছি। তবু আমার মনে তৃপ্তি নেই। মাঝে মাঝে মনে হয়, তোমার সব কথা সত্য নয়। তুমি যেন কিছু বাড়িয়ে বলছো, করছো সত্যের অপলাপ। জানিনা আমি কিছু। আমার মধ্যে সত্যের প্রকাশ হয় নি হয়তো। তাই তোমার প্রতি এমন সন্দেহ জাগছে। শ্রদ্ধাও ঠিকমত আসছে না। তাই তৃপ্তি পাচ্ছি না আমার অন্তরে আর মনের মাঝে।

হে সত্যের জ্যোতি, আদর্শের ধ্রুবতারকা, তুমি এসো, তোমায় আমি প্রাণভরে নিরীক্ষণ করি। আমার বিচার আছে, আছে আমার মানসিক দ্বন্দ্ব আর কথার তর্ক। এতে করে তোমাকে আমি বুঝতে পারছি না। তুমি এসে আমাকে নিয়ে যাও তোমার সত্যের আলোকরাজ্যে—তর্কের আর সংশয়ের সর্বপ্রকার গণ্ডীর বাইরে। তাহলে যদি তোমাকে ঠিক ঠিক চিনতে পারি, বুঝতে পারি তোমার সত্তার স্বরূপ—তোমার অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে বুঝতে পারি তোমার আদর্শ ও জীবনের লক্ষ্য।

এমনিধারা আকুতি মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে মার্গারেটের অন্তরে। সে স্বামীজীর মুখে অনেক বক্তৃতা শুনেছে হিন্দুধর্ম আর বিশ্বধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধে। মুগ্ধ হয়েছে সেগুলি শুনে। মনে মনে সত্যের প্রতিভূ স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে।

ভেবেছে, ইনিই হচ্ছেন আদর্শ মানুষ—সত্যের জাজ্বল্যমান প্রতীক। ইনি সত্যকে জেনেছেন ঠিক ঠিকভাবে। তা নাহলে এরকম মধুর ভাষণ এবং নিষ্ঠাপূর্ণ কর্মাবলী সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দ চলে এলেন নিউইয়র্ক শহরে। মার্গারেট একা অবস্থান করতে লাগলো লণ্ডনে। সে একাকিনী হয়ে বুঝতে চেষ্টা করলে হিন্দুধর্মের সারকথা। চিন্তার গভীরে প্রবেশ করে হিন্দুধর্মের রত্নাকরে ডুব দিয়ে মণিমানিক্য আহরণ করতে ব্রতী হলো। নিজের বিদ্যালয় নিয়ে ব্যস্ত থাকতো দিনের বেশীর ভাগ সময়। অবসরসময় সে ভারতীয় ধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করতো। স্টার্ডিকে বলে সে বুদ্ধের জীবনী গীতা এবং ইংরাজীতে অনূদিত কয়েকটি উপনিষদ পড়ে ফেললে। এইসব বইগুলি পড়ার ফলে সে স্বামীজীর মুখে শোনা বক্তৃতার সত্যতা উপলব্ধি করলে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের উদারতা তাকে মুগ্ধ করলে। তার কাছে ম্লান হয়ে গেল নিতান্ত গোঁড়ামিভরা প্রাচীন ইহুদীদের আর্তত্রাণের ধর্ম।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে মার্গারেটের পরিচয় হবার আগে থেকেই সে ধর্মবিষয়ে বেশ ভালভাবে পড়াশুনো করেছে। আট বছর আগে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সে 'নীলাস' ছদ্মনামে খ্রীষ্ট বিষয়ে প্রবন্ধ লিখলে। তার একটি প্রবন্ধের নাম 'শিশু খ্রীষ্ট'। তাতে সে লিখলে, "খ্রীষ্টের আনন্দবাদ" কথাটা শুনলে লোকে হাসবে। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে—কাঁটার মুকুটকে যশের কিরীট মনে করা, ন্যায় আর সত্যের আকুতি ও এষণায় পূর্ণানন্দের অবর্ণনীয় আস্বাদ পাওয়া—এ-রহস্যের দীক্ষা তিনিও কি দেননি মানুষকে? তাঁর মধুর জীবনকাহিনী যতই পড়ি ততই প্রাচীন ভারতের বুদ্ধদেবের কথা মনে না করে পারি না। বহু শতাব্দী আগে তিনিও মারের পরীক্ষা আর প্রলোভন জয় করে লোকোত্তর পুরুষ বলে গণ্য হয়েছিলেন। মনে পড়ে সক্রেটিসের কথা। তাঁর জীবনেও সেই

কঠোর সত্যনিষ্ঠা, সেইসঙ্গে মন-কেড়ে-নেওয়া নম্রতা আর মাধুর্য। বুদ্ধ আর সক্রেটিসকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তাঁদের পুণ্যস্মৃতির আভাই কি এসে পড়েছিল খ্রীষ্টের শৈশবকাহিনীতে অথবা মানব-মনের একই উৎস হতে উদ্ভব বলেই তাঁদের স্বভাবে এই মিল কিনা কে বলবে?'

এভাবে মার্গারেট অনেক দিন ধরে ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ পাঠ করে ফেলে। অনেক সময় তার কাছে গ্রন্থবিষয় দুর্বোধ্য ও জটিল বলে বোধ হতো। তখন সে নিতান্ত অসহায় বোধ করতো নিজেকে। তখুনি মনে পড়ে যেতো স্বামীজীর কথা, 'নিজেকে কখনও অসহায় মনে কোরো না। মানুষের বুকে ভগবান কেমন করে থাকেন জানো? বড় ঘরের পর্দানশীন হিন্দু মেয়ের মত। আড়াল থেকে তিনি সব দেখেন। কিন্তু তিনি যে আছেন তা বাইরের কেউ জানতে পারে না। তেমনি করে তিনিই আছেন তোমার হৃদয়ে।'

স্বামীজীর কথা মনে পড়লে মার্গারেটের হৃদয় আশায় ভরে উঠতো। মন দুলে উঠতো উৎসাহের হিল্লোলে। সে নিজেকে আদৌ অসহায় বোধ করতো না। গভীর আশা এবং একনিষ্ঠ বিশ্বাস নিয়ে ভাবতো সে, আমার অন্তরে যখন তিনি রয়েছেন তখন আমি একদিন না একদিন সাহায্য পাবো তাঁর কাছ থেকে। তিনি আমাকে সাহায্য করবেন আমি যদি দুর্বল হয়ে পড়ি এবং আমাকে সাহায্য করার জন্যে তাঁর কাছে একান্ত আকুতি জানাই। তিনি নীরব থাকতে পারবেন না। একদিন না একদিন তিনি সরব হবেন; আসবেন এগিয়ে আমাকে সাহায্য করতে। আমি স্বামীজীর কথা শুনে এবং হিন্দুধর্মের কয়েকখানি শাস্ত্র পাঠ করে এইটুকু বুঝেছি যে তাঁর কাছে কিছু চাইলে পাওয়া যায়। তিনি জীবের দুঃখ বোঝেন। তিনি রয়েছেন প্রত্যেকের অন্তরে। তাঁকে জানতে হবে—বুঝতে হবে। নিজেকে না জানলে—আত্মদর্শন

না হলে বিশ্বসংসারকে জানা যাবে না। আর বিশ্বসংসারকে জানলে যিনি এই বিশ্বসংসারকে চালনা করছেন তাঁকে জানা যাবে। এভাবে একে একে ক্রমে ক্রমে পূর্ণ সত্যের প্রতি অগ্রসর হতে হবে। তবেই আসবে জীবনের পূর্ণতা, জানা যাবে সকল সত্য এবং জ্ঞান। সেটা একান্ত সময়সাপেক্ষ। তার জন্যে প্রয়োজন প্রস্তুতি। আলোচনা, গ্রন্থপাঠ এবং ধান-ধারণা এইগুলির মাধ্যমে নিজেকে তৈরী করে নিতে হবে জীবনে সত্যের পূর্ণ স্বরূপকে আসন দেবার জন্যে। তবে গুরুকৃপা এবং আশীর্বাদ হলে শিষ্যের অন্তরে সত্যের প্রকাশ ধীরে ধীরে ঘটে। যেমন একসময় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মাঝে এরূপ সত্যের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।

অনেক পড়াশুনা এবং স্বামীজীর কাছ থেকে শোনা হিন্দু-ধর্মের অনেক তত্ত্ব ও তথ্য জেনে নিয়ে মার্গারেট দিনের পর দিন নিজের মধ্যে অন্বেষণ করতে লাগলো সত্যের স্বরূপকে। নিজের জীবনকর্ম ও জীবনস্বপ্ন পর্যালোচনা এবং অনুধ্যান করে খানিকটা যেন আভাস পেলে সত্যের। এর ওপর লণ্ডনে থাকাকালে স্বামীজীর কাছ থেকে খানিকটা ভাব পেয়েছিল মার্গারেট। সেই ভাবই ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন আনতে লাগলো মার্গারেটের জীবনে। গুরুশক্তি আর গুরুকৃপা অলক্ষ্যে থেকেও কাজ করে শিষ্যের ওপর। রাম-কৃষ্ণও ঠিক এমনিভাবে কৃপা করেছিলেন তাঁর প্রিয়শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে। সুতরাং মার্গারেটের আর ভয় কি! পরম ভরসার সুদৃঢ় আশ্রয় সে খুঁজে পেলে যেন স্বামীজীর কথায়—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত' আর গীতার আদর্শের মাঝে। গীতায় পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ দুর্বলচিত্ত এবং ভগ্নহৃদয় অর্জুনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন :

'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ! নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ!'

কেবল ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে সময় কাটাতো না মার্গারেট। তার সঙ্গে রাজনীতির বিষয় নিয়েও পড়াশুনা করতো। তার আজন্মকালের স্বভাব রাজনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির—দেশের কথা চিন্তার সঙ্গে ভগবানের কথা চিন্তা করা। এ অধিকার সে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিল তার পিতার কাছ থেকে। সে রাজনীতি প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিতে দিতে প্রায়ই ঈশ্বরপ্রসঙ্গে এসে যেতো! সে বললে, মানুষ তার ক্ষুদ্র স্বার্থকে প্রসারিত করবে। প্রথমে সে সংসারে স্ত্রী-পুত্র-পিতামাতার প্রতি কর্তব্য করবে। তারপর তা প্রসারিত করবে প্রতিবেশীদের অন্তরে। সেখান হতে তা গ্রাম-নগর ও দেশের মধ্যে প্রসারিত করবে। দেশ থেকে পরে বিদেশে এবং পরিণামে তা বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়বে। এভাবে মানুষ নিজেকে বিলিয়ে দেবে বিশ্বের মাঝে। সে হবে বিশ্বনাগরিক এবং লোকোত্তর সত্তার অধিকারী। এমনি করে পরিণামে খুঁজে পাবে মানুষের ওপরে অধিষ্ঠিত মঙ্গলময় এবং কল্যাণকর্তা জগদীশ্বরকে। তখন সে নিজেও হবে দেবাবিষ্ট।

মার্গারেটের কথাগুলি বেশ যুক্তিপূর্ণ এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য। জনসাধারণ সেগুলি শুনে যেতো মন-প্রাণ দিয়ে। সেই সময় লণ্ডনে এবং আয়র্ল্যাণ্ডের রাজনীতিতে দেখা দিলে সঙ্কট। মার্গারেটের বন্ধু রোনাল্ড ম্যাক্‌নীল হোমরুল পার্টির প্রবল প্রতিপক্ষ। তিনি পার্লামেণ্টে বেশ গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে জনমতকে উত্তেজিত করে তুললেন। কেবল বক্তৃতা নয় তাঁর নিজের কাগজেও অনেক জ্বালাময়ী প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। মার্গারেটের কার্যকলাপকে নিয়েও ম্যাকনীল অনেক সময় কটাক্ষ করলেন। দু'জনের মধ্যে এই নিয়ে অনেক সময় তর্কবিতর্কও হয়েছে। কিন্তু পরিণামে বন্ধুত্বে চির খায় নি। পার্লামেণ্টের কমন্সসভার অনেক সভ্য আবার সিসেম ক্লাবের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মার্গারেট তাদের সঙ্গে মেলামেশা ও আলাপ-পরিচয় করতো দলের কল্যাণের জন্যে।

এভাবে মার্গারেটের জীবন-তরঙ্গিণী দু'টি ধারায় প্রবাহিত হয়ে চললো। দেখতে দেখতে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস এসে গেল। এই সময় স্বামী বিবেকানন্দ ফিরলেন আমেরিকা হতে লণ্ডনে। মার্গারেটের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করে জানতে পারলেন যে তার জ্ঞান বেড়েছে,—এসেছে তার অন্তরে পরিবর্তন। সে যেন কার অপেক্ষায় দিন গুণছে। বোধহয় সত্যের সন্ধানেও এমনিভাবে অপেক্ষা করছে। স্বামীজী ওর প্রতীক্ষার রহস্য বুঝতে পারলেন। তাই বুঝে নীরব রইলেন। ভাবলেন, ওকে এভাবে বোঝবার জন্যে সময় দেওয়া হোক। পরে ও সবকিছু বুঝে নেবে। তখন ঠিক ঠিক সত্যের পথে এগিয়ে যাবার স্পৃহা জাগবে মনে। তখন গুরুপদে নিজেকে সমর্পণ করে সচ্চিদানন্দকে পাবার জন্যে আকুল হয়ে ছুটবে। সে সময় আসতে এখনো কিছু বিলম্ব আছে। তা থাক। এর মধ্যে মার্গারেটও নিজেকে তৈরী করে নিক। তার অন্তরে যেসব যুক্তি ও তর্কের তরঙ্গ এসেছে একে একে সেগুলি শান্ত হোক। তারপর দেখা যাবে অন্য কাজ। তিনিও তো কম সংশয়বাদী ছিলেন না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব জানবার জন্যে গুরুকে কম পরীক্ষা করেছিলেন! সংশয়-মেঘ তাঁর হৃদয়াকাশে কম ছিল না। এখন মার্গারেটের মনের আকাশে যদি কোন সংশয়-মেঘ থাকে তো থাকুক। একদিন গুরুপ্রদত্ত জ্ঞানের সমীরণে তা কেটে যাবে খানখান হয়ে। তারপর প্রকাশ হবে সত্যের সূর্য—সচ্চিদানন্দের জ্যোতি—অনির্বাণ মুক্তিশিখা। তার আগে মার্গারেট কত তর্ক করবে করুক না, কত যুক্তি দেখাবে দেখাক না। তার জন্যে স্বামীজী মনের মধ্যে এতটুকু ক্ষোভ বোধ করতেন না।

স্বামীজী লণ্ডনে থাকার সময় হিন্দুধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে একের পর এক বক্তৃতা দিতেন। সেগুলি মন দিয়ে শুনে যেতো মার্গারেট। তর্কও করতো স্বামীজীর সঙ্গে। আরও অনেক

শ্রোতা তাঁর সঙ্গে নানারকম তর্ক করতো। স্বামীজী তাদের তর্কযুদ্ধ দেখে মুগ্ধ হলেন। পরে বেদান্তদর্শনের আসল রূপ তাদের কাছে প্রকাশ করে তাদের প্রশ্নের ব্যাখ্যাগুলি করে দিলেন এবং তাদের সে সংশয় চিরকালের মত রহিত করলেন। সপ্তাহের চারদিন তিনি বেদান্তদর্শনের প্রসঙ্গ নিয়ে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্যে অনেক শ্রোতা আসতো। মার্গারেট বসতো তাঁর সামনে। সেও শুনতো অবিচল মনে। মাঝে মাঝে উত্তর-প্রত্যুত্তর হতো মার্গারেট আর স্বামীজীর মধ্যে। স্বামীজী তাকে ভালভাবে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন। বললেন, ইউরোপের মুক্তি নির্ভর করছে যুক্তিসিদ্ধ ধর্মের ওপরে। জড়বাদীর কথা ঠিক—এক বস্তুই বিশ্বময় ব্যপে রয়েছে। তফাত এই যে জড়বাদী তাকে বলে জড়, আমি বলি ঈশ্বর চৈতন্যময়।

এভাবে স্বামীজী অতি সহজ সরলভাবে ভারতীয় দর্শনের মূল কথা তুলে ধরলেন মার্গারেটের কাছে। মার্গারেট অনেক প্রশ্ন করলে তাঁর কাছে। স্বামীজীও সেগুলির উত্তর দিলেন।

সেই সময় মার্গারেটের সঙ্গে আলাপ হলো ম্যাক্‌লাউডের। তিনি তার তুলনায় বয়সে বড়। বেশ সচ্ছল অবস্থা তাঁর। তিনি সুদূর আমেরিকা থেকে এসেছিলেন স্বামীজীর সঙ্গে লণ্ডনে। মার্গারেট ম্যাকলাউডের সঙ্গে ধর্মালোচনায় দিন অতিবাহিত করতে লাগলো। সেই সঙ্গে স্বামীজীর ধর্মালোচনাও শুনলে।

এরপর স্বামীজী মায়াবাদ প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিলেন শ্রোতাদের কাছে। মার্গারেট কিন্তু স্বামীজীর কথিত মায়াবাদ প্রথম প্রথম বুঝতে পারলে না। পরে বুঝতে পারলে। সে ঐ মায়াবাদের একটা স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা খুঁজে পেলে। ভাবলে, মায়াবাদ বলতে বোঝায় এই আছে এই নেই। একটা ঝলমলানি ভাবের অস্তিত্ব। সত্য আর মিথ্যার জটপাকানো একটা রহস্য। ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়নির্ভর মনের মাধ্যমে তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়।

সেইসঙ্গে মনে রাখতে হবে ; এই সবকিছু ছেয়ে আছেন যিনি তিনিই সেই।

স্বামীজীর বক্তৃতাবলী প্রথম প্রথম মার্গারেটের কাছে কঠিন বলে বোধ হতো। তারপর সোজা হয়ে উঠলো। এই প্রসঙ্গে সে বলতো, 'প্রথম প্রথম লক্ষ্যবস্তু মনে হয় অনেক দূরে, যেন বিশ্বপ্রকৃতির অপর পারে। তাকে এতটুকু বিকৃত না করে তার মহিমা একটুও খাটো না করে কাছে পেতে হবে তাকে। কাছে আসতে আসতে সেই আকাশের দেবতা হবেন 'যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।' তারপর সেই বিশ্বের দেবতাই হবেন এই দেহ-দেউলের ঠাকুর, তিনিই আবার জীবের জীবন। এমনি করে পৌঁছই সেই শেষের সত্যে। আরণ্যক ঋষিরা যাঁকে খুঁজেছেন জীবনভর, তিনি যে এই বুকের মাঝে··· ···এইখানে! সোঽহম্···সোঽহম্···আমিই সেই।'

এভাবে মার্গারেটের সাধারণ গতানুগতিক জীবনে এলো পরিবর্তন। তার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অনুভূতি ও উপলব্ধির স্তরগুলি একের পর এক খুলে গেল। সে সংস্কার কাটিয়ে উঠে ছুটে চললো অনির্বাণ জ্যোতির পানে।

এবার মার্গারেট নির্লিপ্ত মন নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলে অন্য সমস্যা। স্বামীজীকে সে এতদিনে ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছে। স্বামীজী নিজের জীবনের চেয়ে দেশের দরিদ্র জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কথা ভাবেন। মার্গারেটও তাদের কথা ভেবেছে যখন সে ছিল রেক্সহ্যামে। দীনদুঃখীদের সেবার মাঝে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিল। স্বামীজীর কাছে সে এইসব বিষয়ে গল্প বললে। স্বামীজীও শুনে খুশী হলেন। এই জীবনই তো তাঁর মনোমত। তিনিও চান দীনদুঃখীদের সেবা। তবে তা হবে নিষ্কাম। কর্ম করে যেতে হবে, আসক্তি থাকলে চলবে না। এইটাই হলো হিন্দু-শাস্ত্রের সারকথা। মার্গারেট বিদেশিনী ও অন্য ধর্মের মানুষ। তাই সে স্বামীজীর এই দার্শনিক মত ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারতো

না। কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করতো, স্বামীজী, আমি তো আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলুম না। আপনি বললেন কর্ম করে যাও, কিন্তু ফলের দিকে তাকিয়ো না। এর অর্থ কি? আমরা তো ফলের দিকে তাকিয়ে তার ভালমন্দ এবং লাভালাভ বিচার করেই কর্ম করি।

স্বামীজী দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, এইটিই হচ্ছে হিন্দুধর্মের অন্যতম সার ও সত্য কথা। এর দ্বারা কর্মে যে অশান্তি বোধ তা সমূলে দূর হয়ে যায়। কর্মে সফলতা দেখেও আনন্দ হয় না, আর বিফলতা দেখেও দুঃখ জাগে না অন্তরে। এর মত এমন সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আর দ্বিতীয় কি খুঁজে পাওয়া যায়! আমি যা বললুম, সেকথা তুমি চিন্তায় ও কর্মে একবার প্রয়োগ করে ছাখো না। তাহলেই তুমি পাবে আনন্দ।

মার্গারেট বললে, কিন্তু এ যে বড় কঠিন জিনিস স্বামীজী। স্বামীজী বললেন, কিছুই কঠিন নয়। সব কাজই প্রথমটা কঠিন বলে বোধ হয়, পরে তা সহজ সরল হয়ে যায়। আমাদের ভারতে এমন কাজ অনেকেই করে থাকেন। তোমরা অতিবড় বিষয়ী। তোমাদের মন জড়বাদে পূর্ণ। তাই তোমাদের কাছে সূক্ষ্ম এই তত্ত্ব কল্পনা বা কর্মে প্রয়োগ করতে অসুবিধা ভোগ করছো।

স্বামীজীর কথায় এবার যেন চমক ভাঙলো মার্গারেটের। সে বেশ ভালভাবে একবার তাকিয়ে নিলে স্বামীজীর মুখের দিকে। তার সুদৃঢ় ও সবল দৃষ্টির সঙ্গে স্বামীজীর বিজ্ঞানঘন অধ্যাত্মপূর্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টির বিনিময় হলো। মার্গারেট যেন বুঝতে পারলে, তার অন্তরে সঞ্চার হচ্ছে কোন এক দিব্যানুভূতি। আনন্দে ঝলমল হয়ে উঠলো তার অন্তঃকরণ। ক্রমে ক্রমে সে উপলব্ধি করলে স্বামীজীর কাছে শোনা নিষ্কাম কর্মের গুরুত্ব।

এরপর স্বামীজী তখনকার দিনে ইউরোপীয় সাহিত্য ও ইতিহাস প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন মার্গারেটের সঙ্গে। সেইসঙ্গে

দেশের জনসাধারণের মধ্যে সেবাকাজ চালানোর জন্যে মার্গারেটের মত কয়েকটি বীরাঙ্গনা ললনার অনুসন্ধান করতে লাগলেন। লণ্ডনে থাকার সময় স্বামীজী ইংরাজদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশদভাবে পর্যালোচনা ও বিচার করলেন। তিনি ভাবলেন, গোলাম না হয়েও হুকুম তামিল করা যায় কী করে সে রহস্য শেখা যায় ইংরেজের কাছ থেকেই। ইংরেজেরা এও শিখিয়েছে যে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রেখেও আইন মানা চলে।

মার্গারেট স্বামীজীকে সঙ্গে নিয়ে রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগদান করতো। সেখানে বসে মনোযোগ দিয়ে সেইসব আলোচনা শুনতো। দু'জনের মধ্যে সেসব বিষয়ে আলাপ-আলোচনাও হতো।

একদিন স্বামীজী বললেন মার্গারেটকে, গোঁয়ারের মত বোমা ছুঁড়ে মারার মধ্যে কোন শক্তি নেই। যে সকলের মাঝে প্রাণ-মন খুলে বলতে পারে, ভগবান ছাড়া আর আমার কোন সম্বল নেই, সেই সত্যিকার বাহাদুর। যে নারী বা পুরুষ জোর করে একথা বলতে পারে তাদের হাল ধরে মহাশক্তি। তারাই যে কোন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে সিদ্ধির দিকে। কারণ তাদের চিন্ময়ী শক্তির স্পর্শে দেশের জনগণের চিত্তে জাগরণ ঘটে—দৈবস্ফুরণ হয়।

স্বামীজী পুনরায় বললেন মার্গারেটকে, তুমি আরও ধীর স্থির হও। একটু গভীরভাবে চিন্তা করতে শেখো। কোন বড় কাজ করবার আগে ভালভাবে বুঝেসুঝে সেদিকে যাওয়া ভাল। আমার জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা আছে। সেইজন্যে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি এই ব্যাপারে।

এই বলে স্বামীজী খানিকক্ষণ নীরব হলেন। তারপর তিনি আরম্ভ করলেন বলতে নিজের ছাত্রজীবনের কথা। তখন তিনি নিজে গভীরভাবে পড়াশুনো করছিলেন, ছাত্র পড়িয়েছিলেন আবার ধর্ম আলোচনায় মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন।

সব শুনে নিয়ে মার্গারেটও মনে মনে ভাবলে, সেও নিজেকে স্বামীজীর মত গড়ে তুলবে। দেশ ও দশের সেবায় এবং সেই সঙ্গে ঈশ্বরের আরাধনায় সে নিজেকে গড়ে তুলবে আদর্শ মানুষ রূপে।

মার্গারেট ভাবতো অনেককিছু ; কিন্তু কাজে তা প্রকাশ করতে পারতো না। স্বামীজীর মত ত্যাগীর জীবন তার কাম্য ছিল না। শুনতে অবশ্য ভাল লাগতো, কিন্তু তাকে বাস্তবে রূপ দেবার কথা চিন্তা করলে তার মন বেঁকে বসতো।

একবার ভাবলে, স্বামীজীকে তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা জানাবে। এতাদন তো সেকথা জানাতে পারেনি। কেবল শুষ্ক দার্শনিক চিন্তা, কথাবার্তা এবং দেশের সেবাকর্ম নিয়ে আলোচনা করেছে। এবার সে মন-প্রাণ খুলে নিজের জীবনের কথা বলবে।

একদিন স্বামীজী একাকী বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় মার্গারেট তাঁর সামনে এসে সলজ্জবদনে দাঁড়ালে। স্বামীজী তার হাবভাব বুঝতে পারলেন। প্রশ্ন করলেন, তুমি আমাকে কিছু বলবে ?

মার্গারেট বললে, হ্যাঁ। আমার মনে একটা বাসনা আছে যা আমি অনেকদিন ধরে আপনার কাছে প্রকাশ করবার জন্যে ভাবছি কিন্তু সমর্থ হই নি।

স্বামীজী বললেন, কি সেই কথা ? আমাকে বলো।

মার্গারেট বললে, এখান থেকে যেসব খ্রীষ্টান ধর্মযাজকরা এশিয়া ও আফ্রিকায় ধর্মপ্রচার করতে যান, তাঁরা বিবাহ করে সস্ত্রীক সেদেশে যান। আমার ইচ্ছে, আপনি ও আমি ঠিক তেমনিভাবেই ভারতে গিয়ে দরিদ্র জনসাধারণের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করবো।

মার্গারেটের কথা শুনে স্বামীজী গম্ভীরভাবে তার দিকে একবার তাকালেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, তুমি ভুল করছো মার্গারেট। আমি সন্ন্যাসী।

স্বামীজীর কাছ থেকে ছোট্ট এই উত্তর পেয়ে মার্গারেটের হৃদয় গেল ভেঙে। তার প্রণয়জীবন আদৌ সুখের ছিল না। জীবনে একাধিকবার সে সুখনীড়ের স্বপ্ন দেখেছে, কিন্তু তা বারবার ভেঙে গেছে কোন এক অজানা শক্তির আহ্বানে।

এবার সে নিজেকে বড় অসহায় বোধ করতে লাগলো। তার অন্তর দুঃখের তিমিরে যেন আর্তনাদ করে উঠলো।

স্বামীজী বুঝতে পারলেন তার অন্তরের ব্যথা। সে যে কঠিন আঘাত পেয়েছে—তার জীবনস্বপ্ন যে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে তা জানতে পারলেন। তবু তিনি দমলেন না। তাঁর গুরুদেবের কথা স্মরণ করে মনে পেলেন বল। অযুত হস্তীর বল। একসময় স্বামীজী গুরুদেবের পদপ্রান্তে বসে ভিক্ষা করেছিলেন নিজের নির্বিকল্প সমাধি। তার উত্তরে গুরুদেব সতেজে জানিয়েছিলেন, ছি! তোর কি ক্ষুদ্র বুদ্ধি। তুই না হবি বটগাছ। তা না হয়ে তুই চাস্ নিজের মুক্তি! তুই হাজারো লোককে আশ্রয় দিবি।

গুরুর সেই ইচ্ছা মহা আদেশের মত স্বামীজীর কাছে এলো। তিনি মাথা পেতে নিলেন। সেই থেকে তিনি ভাবেন না নিজের মুক্তির কথা। দরিদ্র ভারতের দীন-দুঃখীদের সেবার কাজে সঁপে দিলেন নিজের জীবনকে। মার্গারেটকে নিজের জীবনস্বপ্নের কথা জানালেন, আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র-নারায়ণকে ভালবেসে তাদের জন্যে জীবন উৎসর্গ করা। অনাথ-দীনের সেবার মধ্যেই রয়েছেন দয়াল ঈশ্বর। তাদের সেবাভার আমাদের নিতে হবে। এ-অবস্থায় ওদেশে কত বাধা ঠেলতে হবে সে-সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা নেই। মানব-পুত্র যীশুর মাথায় দিয়ে শোবার এক টুকরো পাথরও ছিল না। এই রমতা সন্ন্যাসীদেরও মাথার ওপরে কোনও আচ্ছাদন নেই। সূর্যের আগুনতাতে দিনভোর তাদের পথচলা। কিন্তু শুধু পথ চলার দিন আজ ফুরিয়েছে। আমার বিশ্বাস এমন দিন আসবে, যেদিন

দল বেঁধে সন্ন্যাসীদের যেতে হবে গ্রামে গ্রামে। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির শেষে সন্ধ্যায় চাষীরা ফিরে আসবে ঘরে। তখন এরা তাদের কাছে গিয়ে বসবে—কথা বলবে। সন্ন্যাসীদের কেবল ধর্মের কথা বললে আর চলবে না। পাশ্চাত্য ভাষায় যাকে বলে 'শিক্ষা' সেই শিক্ষা দেওয়ার ভার নিতে হবে তাদের। এই নিরক্ষর অগণ্য চাষী-মজুরের চোখ ফোটানোই হবে সন্ন্যাসী সঙ্ঘের কাজ। ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটাতে হবে। বলতে হবে দেশের কথা, ম্যাজিক-লণ্ঠন দিয়ে শেখাতে হবে জ্যোতিষ ও ইতিহাস, বিদেশের জীবনযাত্রা কেমন তা তুলে ধরতে হবে ওদের চোখের সামনে। সন্ন্যাসীরা পৃথিবীর মানচিত্রে নানা দেশের ছবি দেখিয়ে তাদের সচেতন করে তুলবে বহির্জগৎ সম্বন্ধে। আমাদের কাজ হলো তাদের সামনে একটা বলিষ্ঠ নৈতিক আদর্শ তুলে ধরা, তারা যে ছোট নয় এই আশ্বাস দিয়ে আত্মোন্নতির আশা জাগিয়ে তোলা তাদের মনে। তাহলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। বাকীটা করবে তারা নিজেরা।

স্বামীজীর কথা চিত্রার্পিতের মত শুনলে মার্গারেট। তার বড় ভাল লাগলো স্বামীজীর কথা। তবু তার মন হতে সংশয়মেঘ একেবারে কাটলো না।

এইসময় একদিন স্বামীজী পাড়ি জমালেন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যঘেরা সুইজারল্যাণ্ডে। তখন গ্রীষ্মকাল। তাই স্বাস্থ্যকর স্থানে সুন্দর আবহাওয়ার মধ্যে বেশ কয়েকদিন কাটিয়ে দিলেন। সেখানে পাহাড়ের ওপর রয়েছে কুমারী মেরীর মন্দির। তাঁকে অর্চনা করলেন স্বামীজী। এইসময় স্বামীজীর মনে এক স্বপ্ন এসে উঁকি-ঝুঁকি মারলে। তাঁর ইচ্ছা জাগালো, তিনি ভারতে ফিরে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে কুমায়ুন নামে জায়গায় এমনি ধারা এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। সেখানে আসবে দেশবিদেশের মানুষজন। তারা এসে ভারতের অধ্যাত্ম সাধনা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবে।

স্বামীজীর এই স্বপ্ন সফল করবার জন্যে সম্মতি জানালেন সেভিয়ার দম্পতি। তাঁরা বললেন, আমরা আপনার সঙ্গে ভারতে গিয়ে পার্বত্য অঞ্চল কুমায়ুন এলাকায় একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করবো এবং সেখানে জীবনের বাকী সময়টা কাটিয়ে দেবো। স্বামীজীর অন্যান্য শিষ্যরাও এ কাজে মত প্রকাশ করলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন স্বামীজীর স্টেনোগ্রাফার গুডউইন আর হেনরিয়েটা মুলার।

মার্গারেটও চাইলে এবার স্বামীজীর কাজে সাহায্য করতে। সে স্বামীজীকে নানাভাবে উৎসাহ দিতে লাগলো। তার উৎসাহ লাভ করে স্বামীজী লণ্ডনের বিভিন্ন স্থানে একের পর এক বক্তৃতা দিতে লাগলেন। এমনি করে রাজযোগ প্রসঙ্গে অনেকগুলি বক্তৃতা দিলেন। সেই সব বক্তৃতাগুলি একত্রে সংগ্রহ করে একটি বই প্রকাশ করা হলো। তার নাম দেওয়া হলো 'রাজযোগ'। দেখতে দেখতে তার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে গেল। অন্য বিষয় নিয়ে স্বামীজী আরম্ভ করলেন বক্তৃতা।

এবার স্বামীজী মার্গারেটের কাছে নিজের দেশের স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন। তিনি মার্গারেটের মুখের দিকে তাকালেন একবার। তারপর মন্তব্য করলেন, স্বদেশে স্ত্রী-শিক্ষার একটা পরিকল্পনা করছি। মনে হয়, তোমার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাবো।

মার্গারেট অমনি বলে উঠলো, আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করবো স্বামীজী।

স্বামীজী পুনরায় বললেন, আমার স্ত্রীশিক্ষার পরিকল্পনা কেন জানো? আমাদের দেশে মেয়েদের অনেক দুঃখ। তারা লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পায় না। ফলে তারা দুঃখের অন্ধকারে দিন কাটাচ্ছে। তাদের দুঃখ দূর করার জন্যে শিক্ষার প্রয়োজন। আমি তাদের যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চাই। আমার এক

বোন শশুরবাড়ীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। তাই দেখেশুনে আমাদের দেশে অশিক্ষিতা ও অবলা নারীর প্রতি আমার সহানুভূতি বেশী। তাদের দুঃখ দূর করার জন্যে আমি দৃঢ়-সঙ্কল্প। ভারতবর্ষের হাজার হাজার মেয়ে প্রতীক্ষা করে আছে, পশ্চিমের একটি মেয়ে যদি পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জন্যে যোঝে, তাদের পথ দেখিয়ে দেয়, তারা মাথা তুলে সাড়া দেয়। অবরোধে রুদ্ধ হিন্দুমেয়ের অন্তর শিশুরই মত আধফোটা, কিন্তু তার চরিত্রে আছে সরল বিশ্বাস আর অক্ষয় উৎসাহের অনুপম ঐশ্বর্য। ত্যাগ আর সহিষ্ণুতায় তাদের জীবন গড়া, আদর্শরক্ষার জন্যে যুঝতে তারা জানে। এই গুণে সতীর তেজ আজও তাদের মাঝে অম্লান হয়ে জ্বলছে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির বন্যায় একদিন ওদেশের গ্রামের কুটীর-কয়েদখানা আর পাহাড়-জঙ্গল হতে জনাকীর্ণ নগর পর্যন্ত সবই ভেসে যাবে, সারা দেশ জেগে ওঠবে তাঁর নামে। সেদিন দেশের ডাকে সাড়া দেবার জন্যে বহু কর্মী চাই……নারী-পুরুষ দুই-ই……

স্বামীজীর কাছ থেকে এরকম উদ্দীপনাভরা কথাবার্তা শুনে মার্গারেটের মন চঞ্চল হয়ে উঠলো তাঁর সঙ্গে কাজে নামতে। সে এবার স্বামীজীর সঙ্গে ভারতবর্ষে এসে কাজ করতে মনস্থ করলে। তার মন থেকে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সব দূর হয়ে গেল। সে নিজের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ভারতবর্ষের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করতে চাইলে। এখন থেকে সে ভাবতে আরম্ভ করলে, স্বামীজীর কাজই আমার কাজ। তাঁর চিন্তা আমার চিন্তা। তাঁর স্বপ্ন আমার স্বপ্ন।

স্বামী বিবেকানন্দও ঠিক এরকমটি চেয়েছিলেন। বিদেশিনী মার্গারেটের মধ্যে যে স্বাধীন এবং বিপ্লবীভাব লক্ষ্য করেছিলেন তার উজ্জ্বল তেজে এ দেশের নারী-শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তিনি মার্গারেটকে আন্তরিকভাবে চাইলেন ভারতমাতার মুক্তির

ঘোর কাটাবার জন্যে। মার্গারেটও তার স্বাধীন সত্তা ও উদার মন নিয়ে এগিয়ে এলো স্বামীজীর পাশে। তবে সে তার মনের গুহ্য সংকল্প-বাক্য নিজের মুখে প্রকাশ করলো না স্বামীজীর কাছে। অন্যজনের মুখ দিয়ে বললে। সে লোকটি হলেন হেনরিয়েটা মুলার।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস। এই মাসের এক শুভদিনের শুভক্ষণে মার্গারেট তার মনের কথা জানালে হেনরিয়েটাকে, আপনি আমার কথা স্বামীজীকে বলুন। আমি ওঁর সঙ্গে যেতে চাই ভারতবর্ষে। সেখানে গিয়ে দীনদুঃখীদের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করবো।

হেনরিয়েটা বললেন, বেশ, একদিন তাহলে স্বামীজীকে আমার বাসায় নেমন্তন্ন করবো। তুমিও থাকবে।

সম্মতি জানালে মার্গারেট।

একদিন হেনরিয়েটার আমন্ত্রণ পেয়ে স্বামীজী এলেন তাঁর বাসায়। সঙ্গে এলো মার্গারেট।

অনেক রকম কথাবার্তা হবার পর হেনরিয়েটা জানালেন স্বামীজীর কাছে মার্গারেটের কথা, মার্গারেট তার জীবন আপনার কাজে উৎসর্গ করতে চায়।

এই কথা শুনে এতটুকু বিস্মিত হলেন না স্বামীজী। তিনি জানতেন মার্গারেটকে খুব ভালভাবেই। তবে তার মনের সম্পূর্ণ খবর এতদিন পরে প্রকাশ পেল হেনরিয়েটার কথায়। তিনি মনে মনে আনন্দিত হলেন। ক্ষণকালের জন্যে মার্গারেটের প্রসঙ্গ সরিয়ে রেখে নিজের কথা বললেন, আমি আমার কথাই বলতে পারি। দেশের যে-কাজের ভার মাথায় নিয়েছি তার জন্যে দু'শো বার জন্ম নিতে আমি রাজী।

এরপর স্বামীজী দু'চার কথা বলে বিদায় চাইলেন হেনরিয়েটার কাছে। মার্গারেট স্বামীজীর মুখের দিকে ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে

রইলো। সে ভাবলে, কৈ স্বামীজী তো তাকে বললেন না তাঁর শেষ কথা। সে যা করতে চায় তার সমর্থন কোথায় তাঁর বক্তব্যে?

এমনি সব প্রশ্ন মার্গারেটের চিত্তকে অধীর করে তুললে।

স্বামীজীও বুঝতে পারলেন মার্গারেটের মনের ভাব। সে যেন কোন বিষয় জানবার জন্যে বা শোনবার জন্যে অতিশয় ব্যগ্র হয়ে উঠেছে।

একটু চিন্তা করে নিয়ে স্বামীজী মার্গারেটের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর তার কাঁধে তাঁর ডান হাতটি স্পর্শ করে বললেন, হ্যাঁ, ভারতবর্ষই তোমার আপন ঠাঁই। কিন্তু তার জন্যে তোমায় প্রস্তুত থাকতে হবে। তিলে তিলে ভারতবর্ষের সেবায় তোমাকে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

এই বলে হেনরিয়েটা এবং মার্গারেটের কাছ থেকে বিদায় নিলেন স্বামীজী।

হেনরিয়েটা তখন মার্গারেটের মুখের দিকে তাকালেন। মার্গারেটও তাকাল তাঁর মুখপানে। দু'জনের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

তারপর হেনরিয়েটা ধীর বচনে এবং নম্রভাবে জানালেন মার্গারেটকে, এবার পেলে তো পরম আশ্বাস স্বামীজীর কাছ থেকে। যাও, এখন থেকে নিজেকে প্রস্তুত করো ভারতবর্ষের সেবার জন্যে।

মার্গারেট হেনরিয়েটার কথা শুনে আনন্দে অভিভূত হলো। সে হেনরিয়েটার একটা হাত স্পর্শ করে চুম্বন করলে। তারপর নতজানু হয়ে তাঁর সামনে বসে বললে, আপনি আশীর্বাদ করুন যেন আমি স্বামীজীর স্বপ্ন ও সত্যের জন্যে নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করতে পারি।

সামান্য হেসে বললেন হেনরিয়েটা, আমি আর কি আশীর্বাদ করবো তোমাকে। তিনি তো তোমাকে আশীর্বাদ করে গেলেন

এবং প্রয়োজন হলে তিনিই তোমাকে টেনে নেবেন তাঁর কোলে তাঁর ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যে।

হেনরিয়েটার কথা শুনে মনে মনে খুসী হলো মার্গারেট। তার অন্তর এক অনাস্বাদিত আনন্দে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। সে ভাবলে, সে যেন কোন দেবলোকে অবস্থান করছে। সেই অনির্বচনীয় আনন্দের স্বরূপ সে ব্যাখ্যা করতে পারছে না। তবে মনে মনে ভাবলে, এবার তার বুকের ওপর থেকে বিশ মন পাথর সরে গেল। তার ভাবী জীবনের সুন্দর ও সার্থক দিনের আগমন আসতে আর বেশী দেরী নেই। সেই শুভ অনাগত দিনের আশু আগমনের প্রতীক্ষায় দিন গুণতে লাগলো মার্গারেট।

৯

ভারতের পথে মার্গারেট

তুমি আমার প্রাণে জ্বালিয়ে দিলে কর্মপ্রেরণার জ্যোতি। সেই আলোকে আমি কাজ করে যাবো। তোমার ঈপ্সিত কর্ম আমি করবো ভারতবর্ষের মাটিতে গিয়ে। তার আগে আমি যে আরও কিছু শুনতে চাই। হে বিজয়ী বীর! তুমি আমার অন্তরকে জয় করেছো। সেই জয়ের মালা আমার কণ্ঠে পরিয়ে দাও ভালভাবে। আমি তোমার হাতে দেখতে পাচ্ছি সে মালা। দাও আমাকে পরিয়ে সে মালা।

মার্গারেটের এই প্রকার দরদী আহ্বান তার ভাবী গুরু অন্তর্যামী স্বামী বিবেকানন্দ বুঝতে পারলেন। তাই তিনি এগিয়ে এলেন বিজয়ী বীরের মত মার্গারেটের কাছে। তার সামনে তুলে ধরলেন তাঁর জীবসেবার পরিকল্পনা। সর্বজীবে প্রেম দেখিয়ে শিবজ্ঞানে

সেবা করার মাঝেই রয়েছে প্রকৃত মনুষ্যত্ব। বেদান্তের সত্য মার্গারেটের সামনে তুলে ধরলেন বক্তৃতার মাধ্যমে। তিনি বললেন ঈশ্বর নিরাকার ঠিকই কিন্তু ঐ নিরাকারের সর্বশেষ পরিণাম হচ্ছে সাকার। তিনি সাকাররূপে আসেন আমাদের মাঝে।

স্বামীজী পুনরায় প্রচার করলেন, প্রকৃতির সকল রহস্যের ব্যাখ্যা রয়েছে তার অন্তরে। সুতরাং তার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করে তা প্রকাশ করতে হবে। এইদিক দিয়ে বেদান্ত আর বিজ্ঞানে আশ্চর্য মিল রয়েছে। দ্বৈতবাদী ধর্ম বা শাস্ত্র কেবল বাইরে হাতড়িয়ে মরে। প্রকৃতির তত্ত্ব খুঁজতে হবে নিজের ভেতরে।

এভাবে একের পর এক বক্তৃতা দিয়ে যান স্বামীজী। গুড্‌উইন সেগুলি লিখে রাখেন নোট বইয়েতে। মার্গারেট প্রায় সব দিন স্বামীজীর বক্তৃতা শোনার জন্যে আসতো। সে ঐগুলি শুনে নিয়ে নিজের মনের মত গড়ে তুলতো তার আগামী দিনের জীবন। ইতিমধ্যে সে স্বামীজীর কাছে এই প্রসঙ্গে বেশ দু'চার কথা শুনেছে।

ছ'মাস আগে স্বামীজী লিখেছিলেন মার্গারেটকে, আমার জীবনদর্শন কি অল্প কয়েক কথায় তা বলতে পারি। মানুষ যে অমৃতের পুত্র এই বাণী তাকে শোনাতে হবে। কি করে এ-সত্যকে জীবনের প্রতিটি কর্মে ফুটিয়ে তোলা যায় তার শিক্ষা দিতে হবে।

'সমস্ত জগৎ বাঁধা রয়েছে কুসংস্কারের শেকলে। আমি যে কেবল নির্যাতিতকেই করুণা করি তা নয়, যে নির্যাতন করে তার জন্যেও আমার দুঃখ হয়। একটা কথা আমার কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। দুঃখের একমাত্র কারণ অবিদ্যা, তাছাড়া কিছুই নয়। জগৎকে কে দেখাবে আলোর পথ? প্রাচীনকালে যজ্ঞ বা আত্মোৎসর্গকে মানা হতো বিশ্বের বিধান বলে। যাই বলো না কেন, যুগ যুগ ধরে এ বিধানই কায়েম থাকবে। পৃথিবীর যাঁরা বীর, যাঁরা মহাপ্রাণ, বার-বার তাঁরা

নিজেদের উৎসর্গ করবেন, "বহুজনসুখায় বহুজনহিতায় চ"। অনন্ত প্রেম ও করুণা নিয়ে এক বুদ্ধ নয়, শত-শত বুদ্ধকে আসতে হবে জগতের প্রয়োজনে।

'পৃথিবীর সবধর্ম আজ প্রাণহীন এবং ভণ্ডামীতে ভরা। আজ পৃথিবীর প্রয়োজন চরিত্রবল। এমন মানুষ চাই, যাদের জীবন শুধু নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমের একটা বহ্নিদহন। সেই প্রেমে তুচ্ছ মুখের কথায় সঞ্চারিত হবে বজ্রের তেজ।

'তুমি যে সংস্কারমুক্ত এতে আমি নিঃসংশয়। তোমার গভীরে আছে জগৎকে টলিয়ে দেবার বীর্য।···এমনি আরও অনেকে আসবে। আমরা চাই উদ্দীপ্ত বাণী, দুর্ধর্ষ কর্মশক্তি। জাগো, জাগো হে বিরাট! হাঁকো, হেঁকে চলো—ঘুমন্ত দেবতার ঘুম ভাঙুক, অন্তরের ঠাকুর সাড়া দিন তোমার হাঁকারে। জীবনে এ ছাড়া আর কী করবার আছে? কোন্ বড় কাজ? আমি এগিয়ে চলেছি, আর কাজ গড়ে উঠছে আমার পিছু পিছু। আমি ছক কাটি না কোনখানে। ছক আপনি কাটা হয়ে যায়, আপনি কাজ হয়। আমি শুধু বলে চলি, জাগো জাগো।

মার্গারেট স্টার্ডি প্রমুখ স্বামীজীর অন্তরঙ্গদের মন কিছুদিনের জন্যে দুলে উঠলো স্বামীজীর অভাবে। স্বামীজী তখন লণ্ডন ত্যাগ করে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছলেন। ইতিমধ্যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রিয় শিষ্য স্বামী অভেদানন্দকে ভারত হতে ইংলণ্ডে যেতে বললেন। ওখানে তাঁর আরব্ধ কাজ করবার নির্দেশ দিলেন।

স্বামীজীর কথামত স্বামী অভেদানন্দ চলে এলেন লণ্ডনে। তিনি উইম্বলডনেই মার্গারেটের এক বন্ধুর বাসায় অবস্থান করতে লাগলেন। ঐসময় তিনি সপ্তাহে দু'দিন করে মিলতেন লণ্ডন-বাসীদের সঙ্গে। তাদের মধ্যে ধ্যানধারণার বিষয় নিয়ে বিষদভাবে আলোচনা হতে লাগলো। অভেদানন্দকে কাছে পেয়ে লণ্ডন-

বাসীরা স্বামী বিবেকানন্দের অনুপস্থিতির দুঃখ খানিকটা ভুলে গেল।

ওদিকে স্বামী বিবেকানন্দ ফিরলেন ভারতবর্ষে। মাদ্রাজ-বাসীরা তাঁকে প্রথম সম্বর্ধনা জানালে। তাদের কাছে স্বামীজী জানালেন ভারতবর্ষে তাঁর ভাবী ক্রিয়াকলাপের কথা। তিনি ভারতীয় ধর্মের মধ্যে কুসংস্কার দূর করে তাকে মানুষের সেবায় লাগাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। আমাদের ধর্মতত্ত্ব কেবল পুঁথির মধ্যে থাকবে এ কখনো সম্ভব হতে পারে না। ধর্ম হচ্ছে মানুষের জন্যে। মানুষের সেবায় যদি তাকে না লাগাতে পারা যায় তাহলে কি হবে! বনের বেদান্তকে নিয়ে আসতে হবে ঘরের মধ্যে।

ইতিমধ্যে বরাহনগরে যে রামকৃষ্ণ মঠ অস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখানকার তরুণ সন্ন্যাসীরা অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে যে যার সব পর্যটকের ভূমিকা নিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়লো। স্বামীজী ঠিক করলেন, এইসব তরুণদের নিয়ে একটা স্থায়ী মঠ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে তাদের থাকবার কষ্ট না হয়। তারা ঐ মঠে থেকে প্রচার করবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রেত ধর্মের রহস্য অর্থাৎ শিবজ্ঞানে জীবসেবা। এই মঠের জন্যে টাকা দরকার। স্বামীজী অর্থের কথা ভাবতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন, দেশের জনসাধারণের অর্থে গড়তে হবে এই মঠ। অনেক বিদেশী শিষ্য-শিষ্যরা টাকা নিয়ে এগিয়ে এলো। স্বামীজী তাদের দান গ্রহণ করলেন।

ক্রমে গঙ্গার ধারে বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রস্তুত হলো। পশ্চিম দেশ থেকে অর্থ ও জনবল এলো। স্বামীজী মিশনারী ধাঁচে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি বললেন, একদল ত্যাগী যুবক এই মিশনে কাজ করবে। তারা নিজেদের সংসারের কথা ভাববে না। তারা ধর্ম ও মানবসেবা নিয়ে জীবন কাটিয়ে

দেবে। তারা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা অনুযায়ী ধর্মের মাধ্যমে সাম্য আনবে সমাজের বিভিন্নক্ষেত্রে। তাদের কাজে কোনরকম ভণ্ডামী থাকবে না। থাকবে কেবল সমদৃষ্টি নিয়ে শিবজ্ঞানে জীবসেবা।

প্রথমে স্বামীজী মুষ্টিমেয় অনুরাগী ভক্তদের নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ীতে সভা বসলো মিশনের ভাবী কর্মপ্রণালী নির্ধারণ করার জন্যে। প্রথম প্রথম স্বামীজী মানুষের সহযোগিতা কামনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মনোমত সাহায্য পেলেন না। পরে ধীরে ধীরে তা এলো। অনেক গৃহী ভক্তও যোগ দিলে মিশনে। তথাপি সঙ্ঘ গড়ার কাজে প্রথম প্রথম স্বামীজীকে অশেষ দুঃখকষ্ট বরণ করে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাঝ দিয়ে যেতে হলো। ফলে অল্প দিনের মধ্যে তাঁর শরীর পড়লো ভেঙ্গে। তবু তিনি দমলেন না। মন-প্রাণ সমর্পণ করলেন মঠের কাজে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই মে একখানা চিঠিতে লিখলেন মার্গারেটকে: একেকটা সময় আসে যখন মানুষের মন একেবারে ভেঙে পড়ে—বিশেষত একটা আদর্শের পেছনে সারা জীবন খেটে তাকে অংশত সার্থক করবার ক্ষীণ আশার মুখে হঠাৎ যদি মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়ে। রোগের জন্যে আমি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করি না। শুধু এই আফসোস, আমার আদর্শকে রূপ দেবার এতটুকু সুযোগও আজ পর্যন্ত পেলুম না। তুমি তো জানো, মুশকিল হলো টাকার অভাব। হিন্দুরা শোভাযাত্রা ইত্যাদি অনেক কিছুই করছে, কিন্তু তারা টাকা দিতে পারবে না। এ-দুনিয়ায় এক যা ভরসা পেয়েছিলুম ইংল্যাণ্ডে। সেখানে থাকতে ভেবেছিলুম, কলকাতায় অন্ততঃ ধর্ম-কেন্দ্রটা খোলার পক্ষে হাজার পাউণ্ডই যথেষ্ট। দশ-বারো বছর আগেকার কলকাতা সম্বন্ধে আমার যে-অভিজ্ঞতা তাই থেকেই এই হিসেব করেছিলুম। এখন সব-কিছুর দাম তিন-চার গুণ

বেড়ে গেছে। অবশ্য কাজ আমি আরম্ভ করেছি কোনমতে। একটা নড়বড়ে ছোট্ট পুরোনো বাড়ি ভাড়া হয়েছে তিন টাকায়। সেখানে প্রায় চব্বিশটি তরুণকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

স্বামীজীর চিঠি পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো মার্গারেট। সে ভাবলে, এতদিনে বুঝি স্বামীজীর স্বপ্ন সফল হয়েছে।

এরপর থেকে মার্গারেট রামকৃষ্ণ মিশনের কথা বিদেশে প্রচার করতে লাগলো। এই মিশনের দু'টি হলো প্রধান কাজ। একটি হচ্ছে, সকলকে সঙ্ঘের বশ্যতা স্বীকার করতে হবে। এখানে যেসব সন্ন্যাসী থাকবে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীন হবে। দেশের দীনদুঃখীদের সেবাকর্মে করবে আত্মোৎসর্গ। দ্বিতীয় কথা হলো গৃহস্থ আর সাধুদের মধ্যে কিভাবে সংযোগ রক্ষা করা যাবে সেই সমস্যার সমাধান করা। এককালে পশ্চিম দেশে সেণ্ট্ ফ্রান্সিস্ আর ক্যাথারিন্ অব্ সিয়েনা ঈশ্বরের করুণার কথা ঘরে ঘরে প্রচার করেছেন। সেইসঙ্গে অসীম ধৈর্যে ধনীর দরজায় দরজায় ঘুরেছেন সাহায্যের জন্যে। একালে স্বামীজীও সেইরূপ কর্ম করার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। মিশনের দৃঢ়ব্রত এক ব্রহ্মচারী তরুণ সম্প্রদায় এই কাজ করতে লাগলেন। তাঁরা মিশনের দৈনিক কাজের তালিকা প্রস্তুত করতেন। তার একটা প্রতিলিপি পাঠাতে লাগলো লণ্ডনে মার্গারেটের কাছে। সেই তালিকা পাঠ করে মার্গারেটের চিত্ত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠতো। সেই সঙ্গে সে আরও কিছু নতুন কর্মসূচী জুড়ে দিতো। একসময় সে ভাবলে একটা নতুন পরিকল্পনার কথা। মন্তব্য করলে, '……আমি যদি ভারতবর্ষে যাই, মঠের পরবর্তী রিপোর্টে একটি লাইন নতুন করে জুড়ে দেওয়া হবে—"মেয়েদের জন্যে একটি বিদ্যালয় খোলা হয়েছে।" '

এই কথাটির কথা চিন্তা করে আনন্দ পেলে মার্গারেট। এভাবে মার্গারেটের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের পত্রালাপ ঘটতে

লাগলো। স্বামীজী তাঁর 'রামকৃষ্ণ মিশনে'র কার্যাবলী জানান পত্রের মারফতে আবার মার্গারেটও লণ্ডনে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখার কর্মসূচী জানালে স্বামীজীকে। এবার কাজের মধ্যে দিয়ে এবং তপস্যার মারফতে ধীরে ধীরে মার্গারেটের মধ্যে পরিবর্তন আসতে লাগলো। সে স্বামীজীর কথায় ও কাজের মধ্যে পূর্ণ আস্থা খুঁজে পেলে।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন স্বামীজী আগাগোড়া হতে চিঠি লিখলেন মার্গারেটকে: 'সোজাসুজিই বলি তোমায়। তোমার প্রত্যেকটি কথার দাম আছে আমার কাছে, প্রত্যেকটা চিঠিই হাজার বার সুস্বাগত। যখনই ইচ্ছা হবে সুযোগ মিলবে, আমায় চিঠি লিখো। যা মনে আসে তাই লিখো, তোমার কোনও কথাই ভুল বুঝবোনা, অবুঝ হয়ে উড়িয়ে দেবো না। ওখানকার কাজের কোনও খবর কিন্তু আজও পাইনি। কেমন চলছে বলতে পারো? আমায় নিয়ে যত উৎসবই হোক না, ভারতবর্ষ থেকে কোনও সাহায্য আশা রাখি না। বড় গরীব এরা।

'গাছতলায় থেকে কোনমতে দেহটা টিকিয়ে রেখে চলা, এই শিক্ষাই পেয়ে এসেছি। ঠিক সেইভাবেই এখানে কাজ শুরু করেছি। পরিকল্পনাও কিছু রদ-বদল হয়েছে। কয়েকটি ছেলেকে দুর্ভিক্ষ-অঞ্চলে কাজ করতে পাঠিয়েছি। ফল হয়েছে ভোজবাজির মত। আগেই জানতুম, এবার চাক্ষুস দেখলুম। জগৎকে নিজের অনুকূলে পাওয়ার পথ হৃদয়ের ভেতর দিয়ে—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে। সুতরাং আপাতত ঠিক করেছি, নিম্নশ্রেণীর নয় ভদ্রশ্রেণীর একদল তরুণকেই গড়ে-পিটে তুলবো। নিম্নবর্ণের জন্যে কিছুদিন সবুর করতে হবে। প্রথমে ভদ্রছেলের একটা দল পাঠিয়ে দেশের সর্বত্র কাজের ভূমিকা রচনা করতে হবে। দেশের অধ্যাত্ম-প্রগতির জন্যে এরা কুলি-মজুরের কাজ করে রাস্তা পরিষ্কার করুক। তারপর আসবে বড় বড় সিদ্ধান্ত খাটানোর সময়, দর্শন-চর্চার অবসর।

'একদল ছেলেকে শিখিয়ে তোলা হচ্ছে এরই মধ্যে। তবে যে সামান্য আশ্রয়টুকু ভাড়া করে আমরা কাজ চালাচ্ছিলুম সেদিনকার ভূমিকম্পে সে-বাড়িটি গেছে। কিছু ভেবো না। নাই-বা থাকলো একটা আশ্রয়, সব-ঝামেলা ঠেলেই এ-কাজ করতে হবে। নেড়া-মাথা, কম্বল সম্বল, আর যখন যা-জোটে তাই খাওয়া—এই এখনকার হাল। কিন্তু এমন দিন থাকবে না, অবস্থার পরিবর্তন হবেই। আমরা মন-প্রাণ দিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছি যে!

'এদেশের লোকের ত্যাগ করবার মত বিশেষ কিছু নেই। এটা একদিক দিয়ে সত্যি বটে। তবু ত্যাগ-বৈরাগ্য রয়েছে আমাদের রক্তে। আমার একটি শিক্ষানবিশ ছেলে একটা জেলার একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের পদ পেয়েছিল, এখানে ওটা দস্তুরমত বড় চাকরি। কিন্তু ছেলেটি কুটোর মত তা ছেড়ে এসেছে।'

স্বামীজীর চিঠিটির বিষয়বস্তু মার্গারেট এবং তার সহকর্মীদের মনে দাগ কাটলো। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কাজে সাহায্য করার জন্যে তারা উঠে পড়ে লেগে গেল। মার্গারেট নিজেই চাঁদা আদায় করতে লাগলো। সে লিখলে লণ্ডনের সংবাদপত্রগুলিতে রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ ও কর্মকে কেন্দ্র করে, 'এ এক অভিনব ধর্ম-প্রতিষ্ঠান। খ্রীষ্টান, মুসলমান এবং হিন্দুর সমবায়ে গড়া এমন সঙ্ঘ বুদ্ধের পর থেকে আর হয়নি। আপনারা মুক্ত হাতে দান করুন। একমাসের মধ্যে দশ হাজার লোককে দুর্ভিক্ষের গ্রাস থেকে রক্ষা করেছে এই সঙ্ঘ। এক মুঠো চালের বিনিময়ে একটা মানুষকে মরণের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনা যায়। আমাদের সাহায্য আজ একান্ত দরকার।'

লণ্ডনের বিভিন্ন পাড়ায়, সভাসমিতি এবং স্কুল-কলেজে ঘুরে বেশ-কিছু পাউণ্ড সংগ্রহ করলে মার্গারেট। তারপর তা একত্র করে পাঠিয়ে দিলে ভারতবর্ষে স্বামীজীর নামে।

স্বামীজীও ঐ টাকা পেয়ে খুসী হলেন। তিনি মার্গারেটের

কাজের জন্যে তাকে প্রশংসা করে চিঠি লিখলেন আর সেইসঙ্গে লিখলেন সে যেন আপাতত ওখানে থেকেই তাঁর সঙ্ঘের কাজ করে যায়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে জুলাইয়ের পত্রে লিখলেন স্বামীজী: 'এখানে না এসে লণ্ডনে থাকলে তুমি আমাদের হয়ে ঢের বেশী কাজ করতে পারবে। নিরন্ন ভারতবাসীদের জন্যে আত্মত্যাগ তোমরা করলে। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।'

কিন্তু স্বামীজীর কাছ থেকে এই ধরনের পত্র পেয়ে খুসী হতে পারলে না মার্গারেট। সে তাঁর কাছ থেকে চেয়েছিল অনেককিছু। তার মনে এখনকার দিনে সবচেয়ে বড় আশা সে ভারতবর্ষে গিয়ে কাজ করবে স্বামীজীর পাশে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সেরকম ইঙ্গিত তো নেই তাঁর পত্রে। তাই মনে মনে অস্থিরতা বোধ করলে মার্গারেট। নিজের মানসিক অশান্তির কথা অন্যভাবে জানিয়ে লিখলে স্বামীজীকে, 'আমি কি ভারতবর্ষের কোন কাজে লাগবো? আপনি একথা আমাকে খোলাখুলি বলুন দেখি। আমি ওখানে যেতে চাই। কেমন করে নিজেকে ভরিয়ে তুলতে হয় ভারতের কাছে সেই শিক্ষাই পেতে চাই।'

মার্গারেটের চিঠি পাঠ করে আনন্দিত হলেন স্বামীজী।

এতদিন ধরে যেন তিনি এই আশা করেছিলেন তার কাছ থেকে। এখন তার মনের পূর্ণ পরিচয় পেলেন। সে যে ভারতবর্ষের জন্যে সত্যি সত্যি আত্মোৎসর্গ করতে চায় এই সত্যটুকু জানার জন্যে স্বামীজী দীর্ঘদিন প্রতীক্ষা করেছিলেন এবং নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও কর্মের মাধ্যমে মার্গারেটের হৃদয় ও মস্তিষ্ক এইভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করছিলেন। এবার তার মনের পূর্ণ প্রস্তুতি এবং পরাধীন ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যক্লিষ্ট ভারতবাসীদের সেবার জন্যে হৃদয়ের একান্ত আকুলতা দেখে তিনি নিজের মতামত পুরাপুরিভাবে ব্যক্ত করলেন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ শে জুলাইয়ের এক পত্রে: 'কাল স্টার্ডির এক চিঠিতে জানলুম, এখানকার অবস্থাটা

নিজের চোখে দেখবার জন্যে ভারতে আসবে স্থির করে ফেলেছো।···তবে খোলাখুলিই বলি। ভারতবর্ষের জন্যে যে-কাজ তুমি করবে, তার বিরাট সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়। পুরুষ নয়, সিংহিনীর মত শক্তিময়ী একটি নারী চাই। এদেশের জন্যে, বিশেষ করে এদেশের মেয়েদের জন্যে খাটতে হবে তাকে।

'ভারতবর্ষ আজও মহীয়সী নারী সৃষ্টি করতে পারেনি। অন্য দেশের কাছ থেকে এ-জিনিস তাকে ধার করে আনতে হবে। তোমার শিক্ষা, আন্তরিকতা, পবিত্রতা, বিপুল মানব-প্রেম, সংকল্পের দৃঢ়তা—সবচেয়ে বড় কথা তোমার কেল্টিক রক্তের তেজ—এইসব আছে বলে এদেশের জন্যে যেমন মেয়ে চাই, তুমি ঠিক তেমনি।

'তবু ভাববার আছে অনেক-কিছু। এখানে এসে যে দারিদ্র্য, কুসংস্কার আর দাস-মনোবৃত্তি দেখতে পাবে, ওখানে থেকে তা কল্পনায়ও আনতে পারবে না। এখানে এসে তোমাকে অর্ধনগ্ন জনসাধারণের মাঝখানে পড়তে হবে। তাদের ধারণা সব অদ্ভুত। তারা জাতিভেদ মানে, একসঙ্গে বসবাস করতে পারে না। সাদা চামড়ায় মানুষকে তারা এড়িয়ে চলে—ভয়েও বটে, ঘৃণাতেও বটে। সাদা আদমীদেরও তারা চক্ষুশূল। আবার এদিকে শ্বেতকায়রা তোমাকে মনে করবে মাথা-পাগলা, তোমার প্রত্যেকটি চাল-চলন সংশয়ের চোখে লক্ষ্য করবে।

'এখানকার আবহাওয়া ভয়ানক গরম। বেশীর ভাগ জায়গায় শীতকালটা তোমাদের গ্রীষ্মকালের মতন। আর দক্ষিণ দেশে তো সবসময় আগুনের হল্কা বইছে যেন। শহরের বাইরে কোনরকম ইউরোপীয়ান স্বাচ্ছন্দ্য পাবার উপায় নেই।

এ সত্ত্বেও যদি এখানে আসতে সাহস করো, তোমায় স্বাগত সম্ভাষণ জানাই—একবার নয়, একশো বার। আমার কথা যদি বলো, অন্যত্র যেমন এখানেও তেমনি আমি নগণ্য লোক। তবু

আমার যেটুকু প্রভাব আছে, তোমার পেছনে তার সবটুকুই আমি নিশ্চয়ই প্রয়োগ করবো।

'ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে অবশ্যই ভাল করে ভেবে দেখবে। আর কাজে নামবার পর যদি ব্যর্থকাম হও কিংবা মন বিগড়ে যায়, আমার দিক থেকে কথা দিচ্ছি, তুমি এদেশের কাজ করো আর নাই করো, বৈদান্তিক হতে পারো বা নাই পারো, আমরণ আমি তোমার পাশে থাকবো। "মরদ কী বাত হাথী কা দাঁত" একটা কথা আছে। পুরুষের জবানের নড়চড় হয় না। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি। আবারও একটু সাবধান করে দিই, তোমায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।……র পক্ষচ্ছায়ায় বা কারও আশ্রয়ের ভরসা করা চলবে না।'

এমনিভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনাভরা পত্র লিখতে লাগলেন স্বামীজী মার্গারেটকে উদ্দেশ্য করে। মার্গারেটও লিখলো স্বামীজীকে। এভাবে তাঁর ভবিষ্যতের কর্মসূচী নিয়ে অনেকগুলি পত্র আদান-প্রদান হলো। স্বামীজীর পত্রে মার্গারেট জেনে নিলে ভারতবর্ষে গিয়ে তাকে কি কাজ করতে হবে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর স্বামীজী লিখলেন মার্গারেটকে, এমন লোক আছে যাদের কেউ চালিয়ে নিলে খুব ভাল কাজ করতে পারে। সবাই কিছু নেতা হয়ে জন্মায় না। কিন্তু যিনি শিশুর মত নেতৃত্ব করতে পারেন, তাঁকেই বলি আদর্শ নেতা। বলতে গেলে শিশু সবারই মুখ চেয়ে থাকে, অথচ বাড়ির রাজা সেই-ই। অন্ততঃ আমার মতে, সার্থক নেতৃত্বের রহস্য এই।……অনুভব করে অনেকে অনেক-কিছুই, কিন্তু অল্প-লোকেই তা প্রকাশ করতে পারে। ভালবাসা দরদ বা সহানুভূতি প্রকাশ করবার ক্ষমতা যার যত বেশী, সেই তত বেশী কোনও একটা আদর্শ পরের মনে চারিয়ে দিতে পারে।……

'সবচাইতে মুশকিলের কথা এই, অনেককেই দেখলুম, তাদের প্রায় সবটুকু ভালবাসাই আমাকে দিতে চায়। কিন্তু বিনিময়ে

আমি তো আমার সবটুকু তাদের দিতে পারি না। তাহলে আমার কাজ সেইদিনই খতম হয়ে যাবে। অথচ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টির ব্যাপ্তি যাদের আসেনি তারা কিন্তু এমন প্রতিদানের আশা রাখবেই। মানুষের প্রাণঢালা ভালবাসা যত পাই ততই ভাল, নইলে কাজ চলবেই না। কিন্তু আমাকে থাকতে হবে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক। তা নাহলে ঝগড়া আর রেষারেষিতে সব ছারেখারে যাবে। যিনি নেতা, তাঁকে নৈর্ব্যক্তিক ভূমিতে থাকতে হবে। তুমি যে এটা বোঝ তাতে আমার সন্দেহ নেই। নিজের প্রয়োজনে অন্যের ভক্তি-ভালবাসার সুযোগ নিয়ে কাজ আদায় করবে, তারপর আড়ালে মুচকি হাসবে—এমন জানোয়ার হওয়ার কথা আমি বলছি না। আমি নিজে যা, তাই বলছি। অত্যন্ত গভীরভাবে কাউকে ভালবাসতে পারি কিন্তু যদি দরকার হয়, "বহুজনহিতায় বহুজন-সুখায়" নিজের হৃৎপিণ্ড নিজের হাতে উপড়ে ফেলার শক্তি রাখি। পাগলের মত ভালবাসব, কিন্তু কোন বন্ধন থাকবে না। ভালবাসার শক্তিতে জড় চিন্ময় হচ্ছে, এই হলো বেদান্তের সার কথা। সেই একই আছেন বিশ্ব ভরে। অজ্ঞানী তাঁকে বলে জড়, জ্ঞানী বলেন ভগবান। জড়ের মাঝে তিলে-তিলে চৈতন্যের আবিষ্কার করেই না এগিয়ে চলেছে মানব-সভ্যতার ইতিহাস। যেখানে ব্যক্তি নেই সেখানেও ব্যক্তিকে দেখে অজ্ঞানী ; আর জ্ঞানী ব্যক্তির মাঝে দেখেন নৈর্ব্যক্তিককে। আনন্দে-বেদনায় সুখে-দুঃখে এই শিক্ষাই না পেয়ে চলেছি—অতিরিক্ত ভাবালুতায় কোনও কাজ হয় না। "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি—" এই হলো নীতি।"

স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে নানাপ্রকার উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করে মার্গারেট ঠিক করলে এবার সে ভারতবর্ষে গিয়ে স্বামীজীর পাশে দাঁড়িয়ে দুর্গত এবং নিপীড়িত ভারতবাসীর সেবায় তার মন-প্রাণ অর্পণ করবে। সে বেশ কিছুদিন ধরে তৈরী হতে

লাগলো ভারতবর্ষে আসার জন্যে। তার মার কাছে নিজের মনের কথা বললে। মা আদৌ আপত্তি জানালেন না। মিঃ স্টার্ডিও উৎসাহ দিলেন মার্গারেটকে ভারতবর্ষে যাবার জন্যে। কেননা তিনি মার্গারেটের অন্তরভাব যতখানি ভালভাবে জানতেন তাঁর মত আর কেউ তা জানতো কিনা সন্দেহ।

যাই হোক রাস্কিন বিদ্যালয়ে মার্গারেটের কাজের ভার সম্পূর্ণ-ভাবে চলে এলো তার ভগ্নী মের হাতে। নেল্ হ্যামণ্ডকেও সব কথা খুলে বললে মার্গারেট। তার হাতে মে কে দেখাশোনার ভার দিয়ে মার্গারেট তৈরী হতে লাগলো ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করার জন্যে। মার্গারেটের অন্যতম বন্ধু অকটেভিয়াস বেঁকে বসলো মার্গারেটের প্রস্তাব শুনে। সে চায় না যে মার্গারেট ভারতবর্ষে গিয়ে সেখানকার জনসাধারণের সেবার ভার গ্রহণ করুক, স্বেচ্ছায় বরণ করে নিক দুঃখদারিদ্র্য। তাই সে প্রথমটা আপত্তি জানালে। পরে অবশ্য সায় দিলে। মার্গারেটের অন্যান্য বন্ধুরা ভাবলে, মার্গারেট ভারতবর্ষে যাচ্ছে নিছক দেশ দেখবার অজুহাতে। সেখানে চিরকাল থাকবে না। আবার ফিরে আসবে। ভাই রিচমণ্ডের বয়েস মাত্র বিশ বছর। তার মনও কেঁদে উঠলো বড়দিদির আসন্ন বিদায়ের কথা শুনে। বিশেষ করে বড়দিদি তাদের সংসারে ছিল একমাত্র আয়ের উৎস। সে চলে গেলে সংসার যে অচল হয়ে যাবে। তবে একটা ভরসা আছে সে বড়দির জায়গায় চাকরি পেয়েছে। সুতরাং সংসারে আর্থিক অনটনের অনেকটা সুরাহা হয়ে যাবে।

এরপর সেই শুভদিন এলো মার্গারেটের জীবনে। সেদিন সে আর একবার বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্লেষণ করে নিলে নিজের অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জীবনের বিস্তৃত কর্মধারাকে। তারপর সে পা বাড়ালে পুণ্যতীর্থ ভারত অভিমুখে দুর্গত ও পরাধীন ভারত-বাসীদের পুণ্য সেবার ব্রত নিয়ে। সেদিন লণ্ডনে খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল।

তার সঙ্গে বৃষ্টি হচ্ছিল বেশ। সেই দুর্যোগের দিনেই জাহাজযোগে মার্গারেট যাত্রা করলে তার আগামী দিনের উজ্জ্বল জীবনকে স্মরণ করে। ডকে এসে সমবেত হলেন মার্গারেটের মা, বোন, ভাই, বন্ধুবান্ধব এবং অনুরাগীবৃন্দ তাকে বিদায় জানাতে। ক্রমে জাহাজ ছাড়ার মুহূর্ত এগিয়ে এলো। মার্গারেট আনন্দাশ্রু নয়নে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলে। জাহাজ তাকে নিয়ে ছুটে চললো ভারতবর্ষ অভিমুখে। সে মনে মনে ভাবলে, এতদিনে বুঝি তার জীবন ধন্য হতে চলেছে।

১০

ভারতের মাটিতে মার্গারেট

ভারতের কল্যাণের জন্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতী শক্তিকে নামিয়ে এনেছিলেন পৃথিবীর মাটিতে। সেই শক্তির সাহায্যে অপর পাঁচজন ব্যক্তির সহায়তায় তিনি করতে চেয়েছিলেন ভারতের সর্ববিধ কল্যাণ। তাই দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে সাধনার শেষলগ্নে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানালেন সকলকে, ওরে আয়, যে যেখানে আছিস্ চলে আয়। মার কাছে এসে একবার প্রার্থনা কর, তোদের আশা পূর্ণ হবে।

ঠাকুর এই প্রকার আহ্বান করেছিলেন ভবতারিণীর নির্দেশে। তিনি মায়ের কাছ থেকে আদেশ পেয়েছিলেন, একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসবে অগণিত ভক্তবৃন্দ দেশবিদেশ থেকে ভারতের কল্যাণকর কাজে আত্মোৎসর্গ করতে।

দেবী ভবতারিণীর ইচ্ছা এতদিনে বুঝি পরিপক্কতা লাভ করলে। দেশের ভক্তবৃন্দ যেমন আসতে লাগলো দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যতীর্থে

তেমনি বিদেশ থেকেও এলেন একাধিক ঠাকুর অনুরাগী। তাদের মধ্যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হচ্ছে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। উত্তরকালে যিনি হন নিবেদিতারূপে পরিচিত।

ভারতমাতার আহ্বান ফিরিয়ে দিতে পারলে না নিবেদিতা। মহান ভারতপুত্র স্বামী বিবেকানন্দের মারফত সে এসে পৌঁছলো ভারতের মাটিতে। জাহাজ তাকে নিয়ে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে এসে পৌঁছলো কলকাতার ডকে।

ডকে লোকের বেশ ভীড় হয়েছিল মার্গারেটকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে। স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর গুরুভাইয়েরাও এলেন মার্গারেটকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে। সুগন্ধি পুষ্পযুক্ত ফুলের মালা গলায় পরিয়ে মার্গারেটকে অভ্যর্থনা জানালে জনৈক তরুণ সন্ন্যাসী। মার্গারেট খুসী হলো ভারতে এসে। এখানকার অধিবাসীদের বিচিত্র পোশাক-পরিচ্ছদ, চলা-ফেরা, হাবভাব প্রভৃতি লক্ষ্য করতে লাগলো সে শিশুর মত অদম্য কৌতূহল আর জিজ্ঞাসু মন নিয়ে। মার্গারেটের অন্যতম জীবনীকার শ্রীমতী লিজেল রেমঁ লিখেছেন: 'কুলিরা ছুটে চলেছে পাহাড়-প্রমাণ বোঝা মাথায় নিয়ে, অর্ধনগ্নদেহে ঘামের ধারা বইছে। পিছনে পিছনে জাহাজের যাত্রীরা চলেছে ঘেঁষাঘেঁষি ঠেলাঠেলি করে। সোনালী-কিনারা-দেওয়া ইউনিফর্ম-পরা পাহারাওয়ালারা হাতের ছড়ি দিয়ে একবার তাদের তাড়া করছে, একবার ঠেলে দিচ্ছে। কোনও-কোনও যাত্রীর গলায় সুগন্ধি মালার বোঝা, তাকে ঘিরে ঘোমটায়-ঢাকা মেয়েরা রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বন্দরের ঠিক বেরবার পথটিতে কেবল ভিড়েরই ঠেলা, তার বিশৃঙ্খল শ্লথ গতিতে গা না ছেড়ে দিয়ে উপায় নেই।

'মার্গারেটের সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছিল পুরুষদের অদ্ভুত পোশাক দেখে। কারও পোশাক শরীরের ওপর কসে জড়ানো, পেশীর রেখাগুলো ফুটে উঠেছে তার ভেতর দিয়ে। কেউ-বা লম্বা ঢলঢলে

শার্টের উপর চড়িয়েছে ওয়েস্টকোট, কারও পোশাক আটসাঁট, কারও বা ঢিলেঢালা। দাড়িতে-চুলেতে দৈত্যের মত একেকটা মানুষ, কানে ঝিক্‌মিক্‌ করছে দামী পাথর, মাথায় পাতলা মসলিনের পাগ। কারও-কারও মাথা একেবারে চেঁচে কামানো, কারও-বা ন্যাড়া মাথায় একগোছা লম্বা টিকি। কারও ডান কানের ওপরে কাঁটা দিয়ে আটকানো একটা ঝুঁটি, আবার কারও ঝাঁকড়া চুল গুচ্ছে-গুচ্ছে এসে পড়েছে কাঁধের উপর। কাস্টম-হাউসের দুয়ার দিয়ে যাত্রীরা একে-একে পার হচ্ছে। কাছেই তালপাতার ছাতার নীচে এক সাধু নিশ্চল হয়ে ধ্যান করছে,—মাথায় জটা, সর্ব-শরীরে লাল-সাদা ডোরা কাটা, দেখতে লাগছে যেন একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি। সুগন্ধি ধূনা পুড়ছে তার পাশে।' (নিবেদিতা—লিজেল রেমঁ—পৃঃ ১০৫—১০৬)

ডক থেকে বেরিয়ে একটা ফিটনে চেপে মার্গারেট চলে এলো কলকাতায় পার্ক স্ট্রীটের এক বাড়ীতে। ওখানে থাকতেন রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন অনুরাগী ভক্ত। ওঁদের ওখানে সাময়িক কালের জন্যে উঠলো মার্গারেট। ওর সঙ্গে দু'চার কথা বলার পর শেষ কথা বললেন স্বামী বিবেকানন্দ, থিতু হয়ে বসে একটু জিরিয়ে নাও। তবে আমার কথা যদি শোন তো বলি, কাল থেকেই কাজ শুরু করে দাও। কাউকে গিয়ে পাঠিয়ে দেবো তোমায় বাংলা শেখাতে।

স্বামীজীর কাছে পরম আশ্বাস পেয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলো মার্গারেট। বিদেশ-বিভূঁয়ে এসে প্রথমটা সে বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল। সেদিনটা মন্দ কাটলো না মার্গারেটের জীবনে। তার কাছে সেই ঐতিহাসিক দিনটি এক অনাস্বাদিত আনন্দের সৃষ্টি করলে। তাই সে অভিভূত হয়ে তার রোজ নামচার পাতায় লিখে রাখলে, '২৮ শে জানুআরি, ১৮৯৮। আমি বিজয়িনী, শেষ পর্যন্ত ভারতে এসেছি।' তথাপি নতুন পরিবেশের মধ্যে এবং জাহাজে

আসার জন্যে পথশ্রান্তিতে ভাল করে ঘুম হলো না মার্গারেটের। সে যেন স্বপ্নের ঘোরে জাহাজের সঙ্গীদের কথা শুনতে পাচ্ছে : 'সবসময় হুঁশিয়ার থাকবে। ভারতবর্ষে বিপদ একেবারে আনাচে-কানাচে। ওখানকার জলে বিষ, ফলে বিষ, ফুলের গন্ধে নেশা ধরে। এক আজব দেশ—একটা গরু বাঁদর কি ময়ূরের কিছু করলে মানুষ মারার চাইতে বেশী গুনার্হ।' সেই রাত্রে স্বপ্নেও দেখলে মার্গারেট, সে এসে পড়েছে একটা জঙ্গলের মধ্যে। সে সম্পূর্ণ একাকিনী। তার আশপাশের জায়গা জলে ভেসে গেছে। সেই জঙ্গল হতে বেরুতে পারছে না সে। পরে একটা ছোট ছেলে এসে তার হাত ধরে এগিয়ে চললো। ক্রমে গাছ-পালা সব ঝাপসা বোধ হলো মার্গারেটের চোখে। হঠাৎ সে শুনতে পেলে মানুষের কোলাহল। গাছপালার পাতাগুলি শনশনিয়ে ছুটে আসছে। ক্রমে সে এসে পড়লো মানুষের ভীড়ের মধ্যে। অমন ভীড় দেখে তার কেমন ভয় হলো, এবার বুঝি ওরা তাকে পিষে ফেলবে। সে তাদের বোঝাতে চাইলে, আমি তোমাদের ভালবাসি। আমি তোমাদের ক্ষতি করবো না। মনে মনে ভাবলে এই কথা কিন্তু কথায় প্রকাশ করতে পারলে না। ওদিকে জনতার তরফ থেকে ফুল আর ফুলের মালা এসে পড়তে লাগলো মার্গারেটের পায়ের কাছে। ফুলের অনির্বচনীয় সৌরভে দিকবিদিক মাতাল হয়ে উঠলো।

স্বপ্ন দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভেঙ্গে গেল মার্গারেটের। তার দু'চোখ জলপূর্ণ হয়ে উঠলো।

স্বপ্নের অর্থ ভালভাবে বুঝতে চেষ্টা করলে না মার্গারেট। ভাবলে, ওরকমটি হবার পিছনে যথেষ্ট কারণ আছে। তার শরীরটা সুস্থ নেই বলেই হয়তো এরকম ব্যাপার ঘটেছে। ভবিষ্যতে হয়তো সে এরকম স্বপ্ন আর দেখবে না।

স্বপ্নের কথা আর মনে না করে সে একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে কলকাতা শহর দেখতে বেরুলো। নানারকম অপরিচিত

দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ ভ্রমণ করার পর বাসায় ফিরলে মার্গারেট।

ওদিকে মার্গারেটের ঘরে এক সন্ন্যাসী এসে হাজির। তার পরণে শুভ্র বেশ—ধুতি-চাদর। স্বামী বিবেকানন্দ পাঠিয়ে দিয়েছেন তাকে মার্গারেটের কাছে বাংলা শেখানোর জন্যে। সন্ন্যাসী এসে মার্গারেটের সামনে দু'খানি বাংলা বই রাখলে। বই দু'টি হচ্ছে 'রামকৃষ্ণের কথা'। সন্ন্যাসী মার্গারেটের কাছে এসে বললে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইংরিজীতে ও-দু'টি অনুবাদ করতে হবে।

ঠাকুরের কথা বলতে ঠিক বুঝতে পারলে না মার্গারেট। কৌতূহলী ও সংশয়ভরা মন নিয়ে প্রশ্ন করলে, কোন্ ঠাকুর? যিশু? কৃষ্ণ?

সন্ন্যাসী বললে, না, আমাদের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

তাই শুনে সপ্রতিভভাবে বললে মার্গারেট, ও, হ্যাঁ—নিশ্চয়ই।

সন্ন্যাসী বললে, তাহলে আজই একাজ শুরু করে দিন।

সন্ন্যাসীর কথামত মার্গারেট অনুবাদের কাজে হাত দিলে।

২৮শে জানুআরি হতে ১১ই মে পর্যন্ত মার্গারেটের জীবনে ঘটে গেল কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ২৭শে ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণের সাধারণ জন্মোৎসবে যোগদান। ১১ই মার্চ স্টার থিয়েটারে প্রথম বক্তৃতা, ১৭ই মার্চ সঙ্ঘজননী শ্রীমার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং ২৫শে মার্চ ব্রহ্মচর্য মন্ত্রে দীক্ষা।

ওদিকে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বিদেশী শিষ্যা হেনরিয়েটা মুলারের সহযোগীতায় বেলুড়ে গঙ্গাতীরে পনরো একর জমি কেনার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। জায়গাটির অবস্থা খুব-ভাল নয় তবে বেশ কিছু মোটা টাকা ঢেলে সংস্কার করতে পারলে ওখানেই অনেক কিছু করা যেতে পারে। বেলুড়ে দু'একটা পোড়ো বাড়ী ছিল। সেগুলি সংস্কার করা হলো। তার একটিতে এসে উঠলেন স্বামীজীর দুই বিদেশী শিষ্যা। একজন হলেন মিসেস সারা বুল অন্যজন মিস

ম্যাকলাউড। ওঁরা ভারতে এলেন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ ও মিশনের প্রধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্যে স্বামী বিবেকানন্দকে সাহায্য করতে। ওঁরা আগেই স্বামীজীর স্বপ্নের কথা শুনেছেন স্বামীজী যখন পাশ্চাত্য দেশে গিয়েছিলেন। তারপর দীর্ঘ চারবছর পরে অনেক বিচার-বিবেচনা ও আলাপ-আলোচনার পর এবার এলেন ভারতে। বেলুড়ের পুণ্য-ভূমিতে থেকে ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হতে লাগলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ তখন থাকতেন তাঁর গুরুভাইয়েদের সঙ্গে নীলাম্বর মুখার্জীর বাড়ীতে। বেলুড় থেকে নীলাম্বর মুখার্জীর বাড়ী প্রায় পৌনে এক মাইল। প্রতিদিন সকালে স্বামীজী ওখান থেকে আসতেন বেলুড়ে মিসেস বুল আর মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে—উপদেশ-নির্দেশ দিতে।

একদিন মিস যোসেফিন ম্যাকলাউড স্বামীজীকে বললেন, আমাদের আসরে যে আইরিশ মেয়েটি আসতো তার কথা তোমাদের মনে আছে? সে এখানে এসেছে। এদেশের সেবায় জীবন দেবে।

ম্যাকলাউড বললেন, স্বামীজী, মেয়েটি এসে আমাদের কাছে থাকুক না।

স্বামীজী ভাবলেন ম্যাকলাউডের কথা। পরে তিনি মার্গারেটকে আসতে বলে তাকে চিঠি লিখলেন।

মার্গারেট ক্ষণমাত্র দেরী না করে চলে এলো ম্যাকলাউডের কাছে। অনেকদিন পরে মার্গারেটকে কাছে পেয়ে খুসী হলেন ম্যাকলাউড। তিনি মিসেস সারা বুলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন মার্গারেটের।

সারা বুল ছিলেন রোমান ক্যাথলিক। ত্রিশ বছর বয়সে

বিধবা হন। এখন তাঁর বয়েস আটচল্লিশ। তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা তাঁকে ডাকতো 'ধীরামাতা' বলে। অগাধ সম্পত্তির মালিক মিসেস সারা বুল। তাঁর স্বামী ছিলেন নরওয়েজিয়ান বেহালাবাদক। উভয়ের মধ্যে বয়সের পার্থক্য ছিল চল্লিশ বছর। বিয়ের দশ বছর পরে বিধবা হন সারা বুল। তারপর তিনি একাই বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনে মিসেস সারা বুল্ মুগ্ধ হন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ভারতে আসেন। তাঁর বৈষয়িক জ্ঞান ছিল অসাধারণ। তিনি অনেক সময় স্বামীজীকে পরামর্শ দিতেন এইসব বিষয়ে। মার্গারেটকে নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের বিদেশী শিষ্য-শিষ্যার সংখ্যা দাঁড়াল মোট ছ'জন। তবে মিস্ ম্যাকলাউড স্বামীজীর শিষ্যা না হলেও পরম সুহৃদ ছিলেন। স্বামীজী তাঁকে ডাকতেন 'জয়া' বলে। উক্ত ছ'জন শিষ্য-শিষ্যারা হলেন ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার, হিনরিয়েটা মুলার, মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড আর মার্গারেট। তাঁরা একত্রিত হয়ে স্বামীজীর সঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রসঙ্গে আলাপ-অলোচনা করতেন। মঠ প্রতিষ্ঠার জন্যে মিসেস বুল স্বামীজীকে অর্থ সাহায্য করবেন এই কথা জানতে পারলে মার্গারেট। সে লণ্ডন থেকে আসবার সময় ওখানকার সহকর্মীদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল যে ভারতে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের খুঁটিনাটি খবর জানাবে তাদের। এবার মার্গারেট ভারতে এসে তার নিজের কথা এবং মঠ প্রসঙ্গে খবরাখবর জানিয়ে একের পর এক পত্র পাঠালে।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুআরি তারিখে মার্গারেট লিখলে নেল হ্যামণ্ডকে : '...তারপর এখানকার কাজের কথা। স্বামীজীর প্রবল আগ্রহ সন্ন্যাসী চালিত একটি বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করা। সেখানে শুধু এদেশে নয় ওদেশেও জ্ঞানবিস্তারের উদ্দেশ্যে তরুণদের তৈরী করা হবে। মনে হয় ঠিক এই কথাটাই আমরা ধরতে পারি নি। সবধরনের অধ্যাত্ম-সাধনাই যে বেদান্তের আলোতে

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আমার এ কথায় তোমরাও সায় দেবে নিশ্চয়। কেবল এই কথা জানা ছিল না যে গত তিন হাজার বছর ধরে এক শ্রেণীর মানুষ এই আলোককে নিজেদের একচেটিয়া করে রেখেছে। এই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যেই স্বামীজী যা কিছু করছেন। আর এর জন্যেই ইংলণ্ডের পক্ষ থেকে আমাদেরও অর্থসাহায্যের একটা ব্যবস্থা করা দরকার। বেশ ভালকরে জানতে চেষ্টা করবে, স্বামীজীর চেষ্টার গোড়ার কথাটা হচ্ছে শিক্ষাবিস্তার। আবার, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচার করা হবে এও একটা দিক। বুঝতেই পারছো, স্বামীজীর কাজের এই দিকটা কারও কারও মনে বেশী দাগ কাটবে।'

মার্গারেট স্বামীজীকে ভালভাবে জানার চেষ্টা করতে লাগলো। স্বামীজীর চরিত্রের নানাদিক। তিনি যুক্তিবাদী, সন্ধানী এবং কর্মী। তাঁর কাজের এই নবধারাকে হয়তো অনেকে স্বাগত জানাতে পেছ-পা হবে। তারা বলবে, এ একটা সাম্প্রদায়িকতা-পূর্ণ সন্ন্যাসীসঙ্ঘের মঠ। এখানে নেই উদারতা—নেই মানবসেবা। মার্গারেট তাদের ভুল ভাঙ্‌বার জন্যে চেষ্টা করলে। সেও সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী। তবে কোন সঙ্ঘ যদি কোন সম্প্রদায়ের হয় এবং তাতে যদি কোন প্রকার ধর্মের গোঁড়ামি না থাকে এবং সে যদি জনসাধারণের সেবার কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করে তাহলে তার বিরুদ্ধে বলার কিছু থাকবে না মার্গারেটের পক্ষে। এই প্রসঙ্গে মার্গারেট তার লণ্ডনের বন্ধুকে আরও লিখলে: 'প্রথমেই ধরা যাক সাম্প্রদায়িকতা। এই জিনিসটায় আমাদের ভুতের ভয়। এ-বিষয়ে আমরা সবাই একমত যে "একটা নতুন সম্প্রদায়" সৃষ্টি করার বাতিকটা এড়াতে হবে। একটা ছাপ মেরে দল তৈরী করা, কোনও দলের ছাপ নেওয়া—এ আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। এখন কিন্তু ব্যাপারটা একা ভেবে দেখবার সময় পেয়েছি। ফলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে "সম্প্রদায়"

মানে একটা সঙ্ঘ, যাতে একদল লোক আরেক দল থেকে নিজেদের পৃথক করে সাবধানে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলে। যারা ঐক্যের পোষকতা না করে সম্প্রদায় গড়ে, অন্য সম্প্রদায় তাদের প্রতিপক্ষ। কিন্তু যদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকে নিজেদের গোষ্ঠী বা সমাজ না ছেড়ে কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের চর্চা বা কোথাও একটা মত কি আন্দোলন সমর্থন করার জন্যে দল বাঁধে সেটা নিশ্চয়ই একটা ধর্ম-সম্প্রদায় হয়ে দাঁড়ায় না। আমাদের দেশে যেমন উপকথা-সংগ্রহের সমিতি, হাসপাতালের রোগীদের রক্ষণাবেক্ষণের সমিতি বা শিশু-নির্যাতন-নিবারণের সমিতি আছে, এও তাই। সেইসঙ্গে সংঘের উদ্দেশ্য আর কাজ-কর্মের পরিষ্কার নির্দেশ থাকায় সদস্যদের সহযোগিতার ক্ষমতাটা এলিয়ে না পড়ে আরও দানা বাঁধে, কর্ম ও চিন্তার পরিসরও বাড়ে। কথাটা মানছ তো? ভাববার একটা সূত্র পেয়েছি বলে "সম্প্রদায়" কথাটার ওপর যে-বিদ্বেষ সেটা এখন জুজুর ভয় বলেই মনে করি। রাশিয়ানদের বা স্কারলেট ফিভার নিয়ে আমাদের যে-ভয় সে যেমন মনের দুর্বলতা ছাড়া কিছু নয়, "নতুন একটা দল হবে" বলে ভয়টাও সেইরকম।···

'ব্যাপারটার আরেকটা দিকও আছে। এ-আন্দোলনে অধ্যাত্মসাধনার ভেতর দিয়ে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের শক্তি আরও সংহত হবে। মিসেস বুল বলেন, থিয়সফিক্যাল সোসাইটি রাশিয়ান গভর্নমেন্টের ধামাধরা। সাম্প্রতিক হাঙ্গামার সুযোগে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির সদস্যেরা জনসাধারণকে আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে পরামর্শ দিয়েছে সত্য কথা। কিন্তু এদিকে হিন্দুধর্মের এই অভ্যুদয়ের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে আর লণ্ডনে। হাতে-কলমে যারা কাজ করছে, তারা আবার ইংল্যাণ্ডেরই একান্ত অনুরাগী। স্বামীজী যতদিন ভারতে আছেন, অন্ততঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে এতটুকু বিদ্রোহের আভাসও পাওয়া যাবে না।

তাই মনে হয়, যারা পাদ্রী পাঠায় এদেশে, তারা ছাড়া ইংল্যাণ্ডের সকল সম্প্রদায়ের কাছেই এ নিয়ে আবেদন করার মত সার্বজনীনত্ব এ-ব্যাপারটার আছে। আর যখন মেয়েদের নিয়ে কাজ শুরু করবো, তখন সমস্ত মহিলানেত্রীরই সহানুভূতি পাবো আশা করি। এমন কাজে কী যে আনন্দ!'

১১

প্রস্তুতি ও দীক্ষা

স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়ই আসাযাওয়া করতেন তাঁর সেই তিনজন মহিলা শিষ্যার কাছে—মিসেস বুল, মিস্ ম্যাকলাউড এবং মিস্ মার্গারেটের কাছে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি ও মার্চ এই দু'টি মাস তিনি এই তিনজন মহিলা শিষ্যাদের কাছে তাঁর ভবিষ্যতের কর্মধারা ব্যক্ত করতেন উদাত্ত কণ্ঠে। কখনো কখনো তিনি না এসে পাঠিয়ে দিতেন একদল তরুণ সন্ন্যাসী। তারা এসে স্বামীজীর কর্মধারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলে যেতো। শিষ্যারাও অনেকরকম প্রশ্ন করে জেনে নিতো।

একদিন স্বামীজী তাদের সামনে উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন: মানুষের সেবা-পূজাই একমাত্র উপাসনা যার দ্বারা সাধক সাধনা আর সাধ্য বস্তুর সাযুজ্য ঘটে।...খাঁটি দেশপ্রেমিকের নিষ্ঠা থাকা চাই আমাদের। এই যে হাজার-হাজার জীব না খেয়ে মরছে, অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, এ দেখে কি হৃদয় কেঁপে ওঠে না? প্রত্যেককে বুঝিয়ে দাও যে সে ছোট নয়, সে ব্রহ্মস্বরূপ। প্রত্যেককে এ সত্য জানবার শেখবার সুযোগ দাও। জাগিয়ে

তোল দেশবাসীকে। তাদের ডেকে বলো, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, ঝাঁপ দাও কাজে। কাজ চাই, কাজ।

মানুষকে সেবা করাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। মানুষরূপী শিব দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। তাদের সেবা না করে আমরা মন্দিরে পাথরের দেবতাকে সেবা করছি। এ তো আমাদের চারিত্রিক দুর্বলতা এবং পলায়নী মনোবৃত্তি। স্বামীজী এসব কাজ ষোল আনা বরদাস্ত করতেন না। তাই তিনি একসময় পত্রমারফত তাঁর সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা এবং তরুণ ব্রহ্মচারীদের উদ্দেশ্যে জানালেন নিজের প্রাণের কথা: 'বেদ কোরান পুরান শাস্ত্র-টাস্ত্র এখন রেখে দে কিছুদিন। মানুষ হচ্ছে জ্যান্ত ঠাকুর, প্রেম আর সেবা দিয়ে তার পূজা চালা। তবে আস্তে-আস্তে সইয়ে-সইয়ে। এক তাদের খাওয়ার ব্যবস্থাটা তোদের আলাদা-আলাদা করতে হবে। কিন্তু সবাইকে শেখাবি যেন, তারা সচ্চরিত্র এবং সাহসী হয় আর পরহিত নিয়ে থাকে। একেই বলে ধর্ম।'…(১৪ই অক্টোবর, ১৮৯৭ মুরী হতে লেখা চিঠি)

মানুষের সেবাই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম, তার মধ্যে প্রকাশ পায় মানুষের পূর্ণ মনুষ্যত্ব। ঈশ্বরের কাছে জাতিভেদ নেই। সেখানে আছে কেবল পূর্ণ মন আর সমর্পিত প্রাণের একীকরণ। এই দু'টি নিয়ে যে কোন লোক তাঁকে সেবা করতে পারে। তাই স্বামীজী স্থানীয় লোকেদের ঠাট্টাবিদ্রূপ এবং বিরূপ সমালোচনা উপেক্ষা করে তাঁর বিদেশী শিষ্য-শিষ্যাদের আদেশ করতেন রামকৃষ্ণদেবের মন্দিরে প্রবেশ করতে। তাঁরাও স্বামীজীর আদেশমত ঠাকুরের মন্দিরে এসে প্রাণ খুলে ভক্তিভরে নিজেদের শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করার সুযোগ পেত। স্বামীজী নিজেই একদিন বললেন, সবল বা দুর্বল, ব্রাহ্মণ কি পারিয়া সকলেই ব্রহ্মোপাসনা করতে পারে, সে অধিকার আছে সকলের। তাঁর যে-রূপ ফোটে তোমার কাছে, তারই উপাসনা করো। সাধনা মানে বাস্তব অভিজ্ঞতা। আত্মসত্তার উপলব্ধিই ধর্ম।

পরে মার্গারেট স্বামীজীর এই কথার মর্ম উপলব্ধি করে সকলের কাছে জানালে : 'তিনি মনে করতেন জাগ্রত-চেতনার প্রথম লক্ষণ হলো পর-পর কতকগুলো বিবিক্ত অথচ সুস্পষ্ট উপলব্ধি। সেগুলোর পরস্পরের মধ্যে কোন সঙ্গতি প্রথম থাকে না। কিন্তু তাতেই সাধকের মনে নিজের ভাবনা অনুযায়ী সেগুলোকে ক্রমে সাজিয়ে নেবার একটা তাগিদ আসে।'

এরপর স্বামীজীর বিদেশী শিষ্য-শিষ্যারা তাঁর সম্বন্ধে এবং তাঁর গুরুদেব রামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানার জন্যে অনুসন্ধিৎসু হলো। তখন মঠের একদল তরুণ ব্রহ্মচারী তাদের সেই অদম্য অনুসন্ধিৎসা মিটিয়ে দিলে। তারা গুরু রামকৃষ্ণ এবং শিষ্য বিবেকানন্দের জীবনস্বপ্ন ও সাধনার অন্তর্নিহিত কথা ব্যাখ্যা করলে বিদেশী শিষ্য-শিষ্যাদের কাছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ চেয়েছিলেন মানুষকে শিবজ্ঞানে সেবা করতে। মানুষ একান্তভাবে নিজের মুক্তির কথা না ভেবে সে ভাববে জনসাধারণের সর্বপ্রকার দুঃখদুর্দশা হতে মুক্তি। এর মধ্য দিয়েই সে লাভ করবে তার ইষ্টকে। কেননা নিরাকার এবং সর্বত্রগামী ব্রহ্মের শেষ পরিণাম হচ্ছে জীব। সেই জীবকে যথাযথভাবে সেবা করাই হচ্ছে মানুষের ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ যখন তাঁর গুরুর কাছে নিজের মুক্তির জন্যে করুণা প্রার্থনা করেছিলেন তখন তাঁর গুরুদেব বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছিলেন, ছিঃ তোর কি হীনবুদ্ধি! তুই নিজের মুক্তি চাস্। তুই না হবি বটগাছ। তোর আশ্রয়ে এসে বহু লোক তৃপ্তি পাবে। (এই লেখকের লেখা 'লীলাময় শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)

গুরুদেবের সেদিনকার সেই কথা শুনে স্বামীজীর ঘুম ভাঙলো। চৈতন্যের আসল সত্তার হলো জাগরণ। তিনি নিজের দেহের দিকে তাকালেন তারপর তাকালেন সর্বপ্রকার জীবের প্রতি। দেখলেন, জীবই শিব। তাঁর মধ্যে যিনি রয়েছেন তিনিই রয়েছেন সর্বজীবের মাঝে। সুতরাং জীবসেবাই হচ্ছে ভগবৎসেবা। এবার থেকে

তিনি সেই মহান সেবাব্রতে—মানুষের চির মহান ধর্মের অনুষ্ঠানে নিজেকে নিয়োগ করবেন। তিনি শিষ্য-শিষ্যাদেরকেও সেই মহান মানবপ্রেম এবং সেবার বাণী জানালেন উদাত্তকণ্ঠে : দীন দরিদ্রের অন্তরের সম্পদকে গ্রহণ করবার মত প্রশস্ত করো হৃদয়কে। তোমাদের বাড়ীতে ঢুকতে দেখলে তারা যেন ভাবে, দেবতা এসেছেন ঘরে। ক্ষুধায় জর্জর দীনহীন কাঙাল ওরা, মানুষের অধিকার হতে বঞ্চিত। কিন্তু ওরাই পরমার্থকে এনে দেবে তোমাদের হাতের মুঠোয়। কেননা তোমাদের মাঝেই তাদের পূজোর ঠাকুরকে তারা দেখতে পাবে। এর বিনিময়ে কী তোমরা দেবে তাদের ?

একদিন মিস ম্যাকলাউড জিজ্ঞেস করলেন, স্বামীজী, কি করে আপনার সবচাইতে বেশী সেবায় লাগবো ?

স্বামীজী বললেন, ভারতকে ভালবেসে তার সেবা করে। এদেশের অন্তর হতে নিরন্তর প্রার্থনা-উৎসারিত হচ্ছে দ্যুলোকের পানে। পূজো করতে শেখো এদেশকে।

এমনিভাবে দিনের পর দিন উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে স্বামীজী তাঁর বিদেশী শিষ্য-শিষ্যাদের মন তৈরী করতে লাগলেন ভারতের মহান সেবাব্রতের জন্যে। বিশেষ করে তাঁর মানসকন্যা মার্গারেটকে তিনি মনের ও হৃদয়ের যাবতীয় জ্ঞান ও ভাব দিয়ে গড়তে লাগলেন। তার কাছ থেকে তিনি অনেককিছু কাজ পাবার আশা করেন। তিনি মহীয়সী হিন্দু মহিলা সেই সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীদের জীবন ও চরিত্র ব্যাখ্যা করতে লাগলেন মার্গারেটের কাছে। উপসংহারে বললেন, ভারতের হিন্দুনারীদের ধর্ম ভোগের মধ্যে নেই আছে ত্যাগে। সংসারের মঙ্গলের জন্যে তারা কিভাবে নিজেকে তিলে তিলে আত্মসমর্পণ করে তা জানতে পারবে তাদের জীবন-কাহিনী পাঠ করলে। ভারতীয় হিন্দু নারীজাতির আদর্শ হলো ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং সেবা। তোমাকে সেই শিক্ষা নিতে হবে।

কেবল উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে নয় প্রাত্যহিক জীবনে নানাপ্রকার আচার-সংস্কারের মধ্যে দিয়েও মার্গারেটের জীবন ত্যাগব্রতী হয়ে ওঠার কাজে অনুপ্রেরণা দিতেন স্বামীজী। নানা প্রসঙ্গ নিয়ে মার্গারেট স্বামীজীর সঙ্গে তর্কবিতর্ক করতো। কিন্তু স্বামীজী নিজের ভাব ও প্রতিভা দিয়ে মার্গারেটের তার্কিক মন সরল সহজ পথে এবং ভক্তি-বিশ্বাসের অন্দরমহলে চালনা করার প্রয়াস পেতেন। এই প্রসঙ্গে মার্গারেটের জীবনীকার শ্রীমতী লিজেল রেমঁ লিখেছেন: '...মার্গারেটের যুক্তি-তর্কের অস্ত্রগুলো তছনছ করে দেওয়াই স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল। অথচ এই মানসিক বিপ্লবের ফলে ওর ব্যক্তিত্ব যেন নষ্ট না হয়, সমস্ত শক্তি দিয়ে ও প্রতিরোধ করুক গুরুর প্রভাব, এও ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা।...এমনি করে ভারতের অন্তরঙ্গ ভাবনার সকল দিকের সঙ্গেই মার্গারেটকে ঘনিষ্ঠ করে তুলতে চাইতেন স্বামীজী।

'শিষ্যাকে যে পথে চালিয়ে নিতে হবে আচার্য তার সব খবরই জানতেন। কিন্তু বাইরে থেকে মাঝে-মাঝে তাঁকে বড় নিষ্ঠুর মনে হতো। বিশেষ করে সব অভ্যাস ছেড়ে পূর্বজীবনের সব-কিছু মুছে ফেলে মার্গারেটকে পুরোপুরি কায়িক সংযমের বিধান মেনে চলতে হবে এমন দাবি যখন করতেন, তখন তো আরও। এই যেমন বললেন, গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা যেভাবে জীবন কাটায় মার্গারেটকে তেমনি চলতে হবে। অবশ্য খুব অল্প সময়ের জন্যে এমন চলা, কিন্তু তার মধ্যে কোনও কাটছাঁট থাকবে না, একেবারে পুরাদস্তুর সব নিয়ম মানতে হবে। একবস্ত্রে থাকতে হবে, মাটিতে শুতে হবে, হাত দিয়ে খেতে হবে। এককথায় ব্রহ্মচারিণী মেয়েদের ওপরে এদেশে যতরকম বিধিনিষেধ চাপানো হয়, যতদিন তাদের তাৎপর্য আর গুরুত্ব বুঝতে না পারবে ততদিন মার্গারেটকে সেগুলো মানতে হবে। এরপরে স্বামীজী শেখালেন কায়মনোবাক্যে প্রশান্ত

হওয়া যায় কি করে, কেননা অসঙ্গ আর পরিপূর্ণ শুদ্ধতা চিত্তে ঘনিয়ে এলেই আত্মার নির্মাণশক্তির সন্ধান মেলে।'…

(নিবেদিতা—লিজেল রেমঁ—পৃঃ ১২৫-১২৬-মায়াদেবী কর্তৃক অনূদিত)

মার্গারেটকে আলাদাভাবে রেখে স্বামীজী তাকে আপনার মনোমত করে গড়ে তুলতে লাগলেন। ইদানীং একাকিনী থাকতে ইচ্ছে হলো না মার্গারেটের। সে চায় অন্য পাঁচজন তরুণ ব্রহ্মচারীর মত মঠের কাজে যোগ দিতে। তারা কেমন কাজ করছে, চলছে-ফিরছে অথচ সে কেন নিয়ম-শাসনের নাগপাশে বাঁধা রয়েছে? তার অন্তরে এখনো পর্যন্ত কোনরকম উপলব্ধি হচ্ছে না। সুতরাং ভক্তি-বিশ্বাস আসবে কিভাবে? সে মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করে, আর কতদিন আমাকে এভাবে একাকিনী থাকতে হবে—নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হবে? যে ব্রহ্মচারী আসতেন মার্গারেটের কাছে তাকে বাংলা শেখানোর জন্যে তাঁকে অনেকরকমভাবে প্রশ্ন করতো মার্গারেট। ব্রহ্মচারী বলতেন, এখন যা শিখছো তাই নিয়ে থাকো। অন্য চিন্তা কোরো না।

তাঁর কথা শুনে খানিকটা শান্ত হলো মার্গারেট।

একদিন মার্গারেট দেখলে, গঙ্গার তীরে মহা হৈ চৈ আর কীর্তনের শব্দ। তিনখানা নৌকোয় করে সন্ন্যাসীগণ এবং ভক্তরা মহা আনন্দে নৃত্য করছেন। সঙ্গে রয়েছেন স্বামীজী। তিনি খোল বাজাতে বাজাতে ভাবে বিভোর হয়ে নৃত্য করছেন আর গাইছেন, 'দুখিনী ব্রাহ্মণী কোল কে এসেছে আলো করে, কে রে ওরে দিগম্বর এসেছে কুটীরদ্বারে।'

সেদিন ছিল পূর্ণিমা রাত্রি। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য নবগোপালের নামে তার বাড়ীর সামনে এক মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন স্বামীজী। তাঁর ঐ প্রকার ভাব দেখে মার্গারেটের

মনে নানাপ্রকার কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন জাগলো। সে নিজেকে প্রশ্ন করলে, এ কী উদ্দাম আনন্দ! এ কি পাগলামি, না ভক্তের দৈন্য, না ঈশ্বর-প্রেম—কী এ?

এমনি সব জিজ্ঞাসা জাগলো মার্গারেটের মনে। সেই সঙ্গে আকুলতাও বুকের মধ্যে থেকে মাথা তুলে উঠলো। হৃদয়কে মাঝে মাঝে শূন্য বোধ হলো তার। এবার নানারকম পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে মার্গারেট যেন উপলব্ধি করলে, স্বামীজী তাকে তৈরী করে নিচ্ছেন তাঁর মহৎ কর্ম সম্পাদন করার জন্যে। কি যেন পাবার চেষ্টা করছে মার্গারেট। কে যেন তাকে ঠেলে দিচ্ছে আত্মোপলব্ধির পথে অথচ পারছে না। মনে হয়, ব্রহ্মচর্য-ব্রতে দীক্ষা না নিলে তা পাওয়া যাবে না। তার জন্যে প্রয়োজন গুরুকৃপা। কিন্তু সেই কৃপা লাভ করতে হলে প্রয়োজন হয় মনকে আগে প্রস্তুত করা। মন স্থির ও সংশয়মুক্ত হলে তবেই আসবে দীক্ষা দেবার পুণ্য মুহূর্ত। তারপর গুরুকৃপা এবং সাধনার ক্রমবিকাশে শিষ্যের অন্তরে প্রকাশিত হয় ব্রহ্মতেজ। সেই তেজ দেখিয়ে দেয় এবং শক্তি জোগায় শিষ্যের জীবনে আগামী দিনের কর্ম সম্পাদন করতে।

নানাপ্রকার চিন্তা আর সংশয়ের মাঝখানে দোলা খেতে লাগলো মার্গারেটের মন। সেই সঙ্গে স্বামীজীর অভয়বাণী স্মরণ করলে: সামনে তাকাও। ঐ যে আলো! দ্যাখো, কী স্বচ্ছ কী সহজ সব।

ভাবী গুরুদেবের অভয় বাণী শুনে মনেপ্রাণে শক্তি পেলে মার্গারেট। প্রাণভরে প্রার্থনা জানালে, হে স্বামীজী! কবে আমি আপনার কাজের যোগ্য সেবিকা হয়ে উঠবো। আপনি আমাকে কৃপা করুন। আমি যেন দিন দিন নিজেকে দুর্বল ও অসহায় বোধ করছি। আপনি আমাকে শক্তিদান করে সবল করে তুলুন যাতে আমি অন্য পাঁচজন তরুণ ব্রহ্মচারীদের মত আপনার কাজে মন-প্রাণ সমর্পন করতে পারি। আমার যে সেই ইচ্ছা অনেককালের।

মার্গারেটের এ স্বপ্ন সফল হতে বেশী দেরী হলো না। ১৮৯৮ ২৫ শে মার্চ নীলাম্বর মুখার্জীর বাড়ীতে এক সাধারণ ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে মার্গারেটকে ব্রহ্মচর্য মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন স্বামীজী। তার আগে তিনি শাস্ত্রপাঠ করে যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন তাতে করে জানতে পারলেন, হিন্দু বা বিদেশী যেই হোক না কেন তার অধিকার আছে সন্ন্যাসে। সেই সঙ্গে তিনি এও ঘোষণা করলেন যে ব্রাহ্মণদের মত ক্ষত্রিয় ও শূদ্ররাও উপনয়ন নিতে পারে এবং দেবার্চনায় যোগ দিতে পারে। এইরূপ বিপ্লবী চিন্তাধারা অনুযায়ী বাস্তবক্ষেত্রে কাজ করলেন স্বামীজী। তিনি একাধিক শূদ্র ও ক্ষত্রিয়কে উপবীত পরিয়ে দিলেন। প্রচার করলেন, তারা নিম্নবর্ণের মানুষ হলেও তারা তো হীন নয়। তারাও বহুগুণে হতে পারে ব্রাহ্মণের মর্যাদাসম্পন্ন।

মার্গারেট বিদেশিনী হলেও হাজার হোক সে মানুষ। তার মধ্যে রয়েছে শক্তি—দেবত্বও ঘুমিয়ে আছে। স্বামীজী যেদিন দীক্ষা দেন মার্গারেটকে সেদিন মার্গারেট সারাদিন উপবাসে কাটিয়ে দিলে। শুদ্ধাচারে এবং পবিত্র মনে দীক্ষা গ্রহণ করলে সে মহাগুরু স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে। গুরুর নির্দেশমত মার্গারেটকে ভুলতে হলো নিজের জীবনের অতীত ঘটনাবলী। তারপর হোমাগ্নিতে আহুতি দান করে প্রতিজ্ঞা করলে, আজ থেকে আমি মনে-প্রাণে শুদ্ধ ও পবিত্র হলুম। ভারতের সেবায় এক ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি নিজেকে সমর্পণ করলুম।

শপথ বাক্য পাঠ করার পর স্বামীজী মার্গারেটের ললাটে এঁকে দিলেন ভস্মতিলক। তারপর তার নাম দিলেন ভগিনী নিবেদিতা। নামকরণের পর তিনি নিবেদিতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আজ থেকে তুমি তোমার সর্বস্ব ভারতের সেবায় উৎসর্গ করলে। তোমার নবজন্ম হলো আজ। তুমি হলে নিবেদিতা।

মার্গারেট গুরুর চরণে প্রণাম নিবেদন করে তাঁর মুখের পানে

তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। সে যেন বোধ করলে, গুরু তার মধ্যে অজস্রধারায় শক্তি সঞ্চার করেছেন। তার অন্তর হতে সমস্ত অজ্ঞান ও মলিনতা ধুয়ে-মুছে যাচ্ছে। সে হয়ে উঠছে এক নতুন মানুষ। গুরুই তার কাছে এখন একমাত্র লক্ষ্য বস্তু। তাছাড়া আর কিছু নেই নিবেদিতার জীবনে।

দীক্ষার পর নিবেদিতা বেরিয়ে এলো প্রকোষ্ঠ থেকে। মন্দিরে সাধু-সন্ন্যাসীরা ধ্যান করছিলেন। একজন সন্ন্যাসী আবৃত্তি করে চলেছেন ঃ—

'অসতো মা সদ্ গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্।'

নিবেদিতাকে দেখতে গিয়ে সন্ন্যাসীরা তার হাতে তুলে দিলে প্রসাদী ফল আর মিষ্টি। দীক্ষার দিনে ঠাকুরকে বেশী করে ভোগ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেদিন স্বামীজীকে অন্য-ভাবে দেখলে সকলে। তাঁর মনে আনন্দ-উল্লাস আর ধরে না। তিনি আপন মনে নৃত্য শুরু করে দিলেন। এতদিনে তাঁর স্বপ্ন সফল হয়েছে দেখে বোধ হয় এই আনন্দের প্রকাশ। তাঁর মুখে কেবল উমা আর শঙ্করের প্রশস্তি শোনা গেল। তিনি শিবভাবে বিভোর। কখনো বা তানপুরা নিয়ে গান ধরলেন ;

'পর্বত পাথার ব্যোমে জাগো রুদ্র উদ্যত বাজ—
দেবদেব মহাকাল, ধর্মরাজ শংকর শিব তার হর পাপ।'

গান গাওয়া শেষ হলে তিনি সমাগত ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্ম-চারীণীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি শ্রীরামকৃষ্ণের দাস। তাঁর কাজের ভার আমায় তিনি দিয়ে গেছেন। সে কাজ শেষ না করে আমার ছুটি নেই।

এবার স্বামীজী নিবেদিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, নিবেদিতা, ওখানে আমি চাই মেয়েদের একটা মঠ হোক। আকাশে উড়তে দুটো পাখা লাগে পাখির। ভারতবর্ষের চাই শিক্ষিত নারী-পুরুষ দুই-ই।

এই অনুষ্ঠানের চারদিন পরে যে ব্রহ্মচারী নিবেদিতাকে বাংলা শেখাতেন তাঁকে দেওয়া হলো সন্ন্যাস। তাঁর নতুন নাম হলো স্বরূপানন্দ।

নিবেদিতা মনে মনে স্বামীজীর কথা চিন্তা করে আনন্দ পেলে। এতদিনে সে সঠিকভাবে জানতে পারলে, গুরুদেব তাকে ভারতে নারী-শিক্ষা প্রচারের জন্যে উপযুক্তভাবে গড়ে তুলছেন এবং অলক্ষ্য হতে দিব্য-প্রেরণার সঞ্চার করছেন। অন্ধকার হতে তাকে নিয়ে চলেছেন আলোর পথে।

সত্যি অন্ধকার থেকে আলোকের পথে নিয়ে চলেছেন স্বামীজী নিবেদিতাকে। তাঁর আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা এবং ভাবের উজ্জ্বল জ্যোতিতে নিবেদিতার অন্তর হতে সমস্ত প্রকার আকাঙ্খা এবং অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীভূত হতে লাগলো। ক্রমে নিবেদিতা জানতে পারলে তার গুরুদেব তাকে ভারতের সেবার জন্যে তিল তিল করে গড়ে তুলছেন।

আর একটি কথা স্বামীজী ভাবলেন, নিবেদিতা যদি ভারতবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করে তবে তার পক্ষে প্রথম কাজ হবে ভারতবাসীর হৃদয় বোঝা—তাদের স্নেহ-ভালবাসা লাভ করা। এর জন্যে নিবেদিতার সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে বিবেকানন্দ সর্বপ্রকার আয়োজন করলেন। কলকাতায় তখন তাঁর প্রভাব খুব বেশী। তাই কলকাতার জনাকীর্ণ অঞ্চলে ষ্টার থিয়েটারে একদিন এক নাগরিক-সভার আয়োজন করলেন। সেদিনটি ছিল ১১ই মার্চ ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ।

সভায় অগণিত মানুষের ভীড়। নিবেদিতা বসে রইলো মঞ্চের ওপর। তার পাশে বসলেন স্বামীজী।

সভা আরম্ভ হবার পর স্বামীজী জনসাধারণের কাছে নিবেদিতার পরিচয় জানিয়ে দিয়ে বললেন, ভারতে সিস্টার নিবেদিতা ইংল্যাণ্ডেরই আরেকটি দান।

অনেকে নিবেদিতার বেশবাস ও রূপ দেখে ভাবলে, এই বিদেশিনী কে? ইনি হয়তো কোন পাদ্রীর আত্মীয়া হবেন। তাদের মনে অদম্য কৌতূহল। তারা অনেকরকম ভাব নিয়ে তাকিয়ে আছে নিবেদিতার মুখের দিকে।

পরক্ষণে তাদের ভ্রান্ত এবং মিশ্র ধারণা নষ্ট করে দিয়ে নিবেদিতা বললে, 'এদেশে এসে শিশুর মত সবকিছু আমায় শিখতে হবে। আমার পাঠ সবে শুরু হয়েছে। আপনারা আমার সহায় হোন। যখন পথ হবে দুর্গম তখন আপনাদের মমতাভরা দৃষ্টিতে সমাদরের যে-ছবি আজ দেখলুম তা স্মরণ করে বুকে সাহস বাঁধবো আমি।'......

নিবেদিতার কথা শুনে দর্শকরা তার প্রতি সুনজর দিয়ে তাকাতে লাগলো। তাদের মন হতে ভ্রান্ত ধারণা অনেকটা ফিকে হয়ে উঠলো। তাদের মুখচোখের মধ্যে শান্ত ও সহানুভূতি-পূর্ণ ভাব লক্ষ্য করে আনন্দিত হলো নিবেদিতা। সে মনে মনে ভাবলে, হয়তো ভবিষ্যতে ভারতের জনসাধারণের কাছ থেকে সে পূর্ণভাবে সহযোগিতা লাভ করবে। এখন থেকে তার প্রকাশ দেখা যাচ্ছে।

এরপর স্বামীজী মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে দর্শকদের লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, 'পশ্চিম দেশের মানুষেরা নিজেদের ঠিক ঠিক জেনেছে বলেই শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছে। ওরা শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানারকম বড় বড় জিনিস আবিষ্কার করেছে দেশের কল্যাণের জন্যে। ভারতবাসীরাও

ওদের মত পরিশ্রমী হোক। তারাও শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিত্য নতুন বস্তু আবিষ্কার করুক দেশ ও দশের কল্যাণের জন্যে।'

বক্তৃতার শেষে স্বামীজী বললেন, 'তোমরা আত্মবিশ্বাস হারিয়ো না। তাহলেই ভবিষ্যতে লাভ করবে ভগবদ্ বিশ্বাস। অফুরন্ত শ্রদ্ধা হতেই জাগে অন্তহীন অভীপ্সা। আমরা যদি আবার আমাদের মধ্যে শ্রদ্ধা ফিরে পাই তাহলে আমরা আবার ব্যাস-অর্জুনের যুগ ফিরে পাবো। আমাদের মানবতার যা কিছু মহান্ আদর্শ তো ফুটেছিল সেই যুগেই।'

শ্রোতারা স্বামীজীর কথা শুনে উৎফুল্ল হলো। তারা একসঙ্গে স্বামীজী আর নিবেদিতাকে অভিনন্দন জানালে। তাদের কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের ধ্বনি শোনা গেল—জয় সিস্টার নিবেদিতা। জয় সিস্টার নিবেদিতা ॥

এর ক'দিন পরে স্বামীজী ভেবে দেখলেন, নিবেদিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে সারদামণির। তিনি থাকতেন বাগবাজারে। শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসীরা তাঁকে জননী বলে শ্রদ্ধা করতো। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাকে রেখে গেলেন তাঁর অবর্তমানে তাঁর মায়ের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করবার জন্যে। সুতরাং তাঁর সঙ্গে আলাপ হলে তার পক্ষে বিশেষ সুবিধে হবে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সেবা করা। অনেক অল্প বয়সে সারদামণির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর সারদামণি বাপের বাড়িতে থাকতেন। তারপর যৌবনে চলে এলেন দক্ষিণেশ্বরে স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে। শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণিকে সাধারণ স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন নি। তিনি সারদামণির মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন জগন্মাতার এক বিশেষ প্রকাশ। তাই স্ত্রীযোনিকে মাতৃযোনি ভেবে শ্রদ্ধা দেখাতেন সারদামণিকে। সারদামণিও স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে সেবা-পূজা করতেন। তাঁর লীলায় সাহায্য করার জন্যে অহরহ চেষ্টা করতেন। তাঁর মিষ্ট ও সরল স্বভাবের জন্যে তিনি সন্ন্যাসী পুত্রদের কাছে

স্নেহময়ী মাতারূপে শ্রদ্ধালাভ করেছেন। নিজের উদরজাত সন্তান না থাকলেও সন্ন্যাসীপুত্রদের সন্তান বলে ভাবতেন। তারাও শ্রদ্ধাবশত সারদামণিকে নিজের মায়ের মত ভালবাসতো। ঠাকুর দেহত্যাগ করলে সারদামণি নিষ্ঠাবতী ব্রহ্মচারিণীর মত কয়েকদিন জয়রামবাটীতে কাটিয়ে আসেন। তারপর বাগবাজারে এসে উঠলেন। ওখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা হলো নিবেদিতার। (এই লেখকের লেখা 'শ্রীমা সারদামণি' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

একদিন স্বামীজী নিবেদিতা, মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস বুলকে নিয়ে মায়ের কাছে এলেন। সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন গুরুভ্রাতা স্বামী যোগানন্দ। তিনি বিদেশিনীদের স্বাগত জানিয়ে বললেন, আপনারা নীচে জুতো খুলে ওপরে যান। সেখানে মায়ের দর্শন পাবেন।

এই বলে যোগানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে বাইরে এলেন। তিনজন বিদেশিনী ওপরে উঠে গেল।

ওপরে গিয়ে দেখলে, ঘরে বসে রয়েছে জনা দশেক মহিলা। তাদের মাঝখানে বসে রয়েছেন সাদা কাপড়পরা এক বর্ষিয়সী মহিলা। তাঁর মাথায় ঘোমটা। তাঁর মুখ দেখে মুগ্ধ হলো নিবেদিতা। অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো, আঃ কি সুন্দর মুখ! এমনটি তো কখনো নজরে পড়েনি।

এরপর মায়ের জনৈক স্ত্রীভক্ত তিনটি আসন পেতে দিলে তিনজন বিদেশিনীর বসার জন্যে। তার ওপর গিয়ে বসলো নিবেদিতা, মিস্ ম্যাকলাউড ও মিসেস বুল। ওরা হাত তুলে মায়ের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানালে। মাও দু'হাত তুলে প্রতি নমস্কার জানালেন। তারপর মায়ের কাছে বসা জনৈক ইংরেজী-জানা স্ত্রীভক্ত মার্গারেটের সঙ্গে শ্রীমার কথোপকথনের সাহায্য করতে লাগলো। শ্রীমা তাদের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার প্রশ্ন করলেন, তোমরা বাড়ীতে কিভাবে ঠাকুরপুজো করো? কি ধরনের প্রার্থনা

করো তাঁর কাছে ? তোমাদের বাপ-মা কি এখনো বেঁচে আছেন ?

মার্গারেট, ম্যাকলাউড ও বুল পরস্পর উত্তর দিলে মায়ের প্রশ্নগুলির।

শ্রীমার সঙ্গে আলাপ করে খুসী হলো নিবেদিতা। সে ঘরের চারদিকে একবার তাকালে। ভাবলে, এইসময় স্বামীজী গেলেন কোথায় ? তিনি থাকলে ভাল হতো।

একটু পরে স্বামী বিবেকানন্দ মায়ের ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করলেন। শ্রীমা তাঁকে আশীর্বাদ জানালেন।

তারপর স্বামীজী মার্গারেট, ম্যাকলাউড ও বুলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা এবার মায়ের কাছে বিদায় চেয়ে নাও।

মার্গারেট, ম্যাকলাউড ও বুল তখন মায়ের কাছে বিদায় চাইলে। মা তাদের আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন, আমি তোমাদের দেখে ভারী খুসী হয়েছি মা।

মায়ের এই কথা শুনে উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে প্রায় সকলেই অবাক হয়ে গেল। তারা ভাবলে, সারদামণি মেমদের মা বলে সম্বোধন করলেন কেন ?

গোপালের মা কিন্তু মার্গারেটদের সঙ্গে একই গাড়ীতে করে এলেন বেলুড়ে। তিনি ইংরিজী না জানলেও একান্ত মমতার সঙ্গে ঐ তিনজন বিদেশিনীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। এমন কি বেলুড়ে এসে গঙ্গার তীরে বসে মার্গারেটের সঙ্গে ধ্যানে বসলেন তিনি।

১২

প্রথম ভারতপরিক্রমায় নিবেদিতা

লণ্ডনে থাকাকালে একদিন স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে বলেছিলেন, বিদেশে আসবার আগে আমি ভারতকে ভালবাসতুম। আর এখন ভারতের প্রতি ধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র। ভারতের বাতাস আমার কাছে অমৃত।

ভারতকে প্রাণভরে ভালবেসেছিলেন বিবেকানন্দ। ভারতের মাটি ছিল তাঁর রক্তমাংসসদৃশ। তিনি ভারতমাতার রূপকে চিন্ময়ী ভেবে পূজো করতেন। সেই মায়ের দুঃখদুর্দশা দূর করার জন্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। সেই ভারতের প্রকৃত রূপের সঙ্গে তাঁর মানসকন্যা নিবেদিতার সম্যক পরিচয় করিয়ে দিতে মনস্থ করলেন।

একদিন স্বামীজী ঠিক করলেন তিনি ভারতপরিক্রমায় বেরুবেন। সঙ্গে নেবেন তাঁর বিদেশিনী শিষ্যা এবং মঠের সন্ন্যাসী কয়েকজন শিষ্য।

ঐ সময় সেভিয়ার দম্পতি বাস করছিলেন আলমোড়ায়। তাঁরা স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লিখলেন, এটা জুন মাস। কলকাতায় এখন খুব গরম। তাছাড়া প্লেগ দেখা দেবার উপক্রম হয়েছে। এইসব ভেবেচিন্তে আপনারা এখানে কয়েকদিনের জন্যে বেড়িয়ে যেতে পারেন।

সেই চিঠি পাঠ করে স্বামীজী খুসী হলেন। একদিন তিনি সত্যি সত্যি যাত্রা করলেন হিমালয় অভিমুখে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে তিনি যাত্রা করলেন কলকাতা থেকে ট্রেনে করে। সঙ্গে নিলেন তিন জন মহিলা শিষ্যা—মিস্ মার্গারেট, মিস্

ম্যাকলাউড আর মিসেস সারা বুল। তাছাড়া চারজন সন্ন্যাসী শিষ্যও গেলেন। তাঁরা হলেন, তুরীয়ানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, সদানন্দ আর স্বরূপানন্দ।

প্রথমে ওঁরা এলেন নৈনিতালে। সমুদ্রতল হতে দু'হাজার ফুট উঁচুতে এই সহর। ওঁরা এলেন ডাণ্ডিতে করে। এখানে খেতরির মহারাজা ওঁদের অভ্যর্থনা জানালেন তাঁর প্রাসাদে। তিনি বললেন, অতিথি যিনি, তিনি ছাইমাখা সাধুই হোন, রাজার ছেলে বা ভিখারীণীই হোন, গৃহস্বামী তাঁকে মনে করেন ঈশ্বর-দূত।

এরপর রাজার আদেশে নৈনিতাল-অধিষ্ঠাত্রী দেবীর দেউলের দরজা খুলে দেওয়া হলো স্বামীজীর তিনজন বিদেশিনী শিষ্যার কাছে। ওঁরা পুরোহিতের সহায়তায় মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে বিগ্রহ দর্শন করলেন। তারপর মন্দিরের চারদিকে প্রাকৃতিক শোভা দেখে মুগ্ধ হলেন। নৈনিতাল-হ্রদের ঠাণ্ডাজলে হাত দিয়ে নানারূপ কৌতুক-ক্রীড়া উপভোগ করলেন। এইসময় নিবেদিতার নজরে পড়ে গেল দু'টি সুবেশা তরুণী।

তারা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করবার জন্যে চেষ্টা করছে। স্বামী বিবেকানন্দ তখনো ছিলেন মন্দিরে। মেয়ে দু'টির বড় ইচ্ছা, তারা স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে কিছু মোহর উপহার দেবে।

দারোয়ান তো চোখ রাঙিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করলে বাক্যবাণ, এই নষ্টা মেয়ে, ভাগ হিয়াঁসে।

দারোয়ানের কাছ থেকে রূঢ় আচরণ পেয়েও ওরা সেখান হতে সরে গেল না। তারা কৌশলে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করলে। তাঁর পায়ের সামনে কতকগুলি মোহর প্রণামীস্বরূপ রেখে প্রণাম জানালে। পরে বললে, এগুলি আপনি গ্রহণ করুন স্বামীজী। এগুলি হয়তো আপনার কাজে লাগতে পারে।

স্বামীজী তাদের ঘৃণা করলেন না তারা পতিতা বলে। বরং

তাদের স্নেহের দান প্রাণভরে গ্রহণ করলেন। তাদের দুঃখময় জীবনের কথা স্মরণ করে তাঁর অন্তর অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। তিনি ভাবলেন, এরা অসতী হলে কি হবে, এরাও যে জগন্মাতার একরূপ।

পতিতাদের প্রতি স্বামীজীর এইপ্রকার করুণা লক্ষ্য করে মুগ্ধ হলেন নিবেদিতা। ঐদিন দিনের শেষে আর একটি মর্মস্পর্শী দৃশ্য দেখলেন নিবেদিতা। প্রাসাদ-উদ্যানে মহারাজার সামনে বক্তৃতা দিতে লাগলেন স্বামীজী। সেখানে উপস্থিত ছিল হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। স্বামীজী উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে সম্বোধন করে বললেন, 'সময় হয়েছে। এবার আমাদের শক্তির সাধনায় এক হতে হবে। নিদারুণ আলস্যে আমরা জড় হয়ে গেছি। সে আলস্য এবার ঝেড়ে ফেলতে হবে। আজ আমরা শক্তিহীন গোলামের জাত। আমাদের স্বাধীনতা নেই। নেই প্রাণ। বুঝি সেইসব পাওয়ার ইচ্ছাও নেই।'

বক্তৃতা দিতে দিতে স্বামীজী উপলব্ধি করলেন, তিনি যেন সকলের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। ভাবের আবেগে তাঁর দু'নয়ন বেয়ে ঝরছিল ধারা। জনতা তাঁর দিকে অবাক নয়নে তাকিয়ে বললে অনেক কথা: একি! সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বিরহীর মত ভারতের নামে কাঁদছেন কেন? ভারত কি ওঁর সর্বস্ব? শুনেছি, সন্ন্যাসীরা ঈশ্বরের কথা ভাবেন, তাঁর জন্যে কান্নাকাটি করেন, তাঁকে দেখবার জন্যে পাগল হন। আর ইনি দেখছি অন্যরকম।

অনেকে স্বামীজীর মধ্যে এইপ্রকার সুমহান ভাব এবং দেশ-হিতৈষী গুণপনা লক্ষ্য করে মুগ্ধ হয়ে গেল। তারা দলে দলে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলে। একজন যুবক তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলো, 'আমি টাকা যোগাড় করে দেবো। অনেক টাকা। সেই টাকায় এদেশের ভাল ভাল ছেলেকে ইংল্যাণ্ডে পাঠান যাবে। তারা সেখানে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এসে ভারতের সেবা করবে।'

তার কথা শুনে বললেন স্বামীজী, 'এ কোন কথাই নয় ভাই। নিশ্চয় জেনো, এসব লোকের বেশীর ভাগই ভাবে-চিন্তায় বিদেশী হয়ে যাবে ; ওরা হবে দো-আঁশলা। সম্পূর্ণ স্বার্থপর হয়ে উঠবে, নিজের দেশের কথা ভুলে বেশ-ভূষা, খাওয়া দাওয়া, আচার-ব্যবহার সব-কিছুতেই ইউরোপকে নকল করবে কেবল। না, আমরা এদেশের ধাতুতে গড়া একদল শক্ত-সমর্থ লোক চাই। ভারতের আত্মাকে জানবে তারা, জাতীয় আদর্শকে জীবন্ত করে তোলাই হবে তাদের জীবন-ব্রত।

স্বামীজীর কথাগুলি হৃদয় ও মন দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলেন নিবেদিতা। তিনি ভাবলেন, 'ভারত তাহলে কি? দাদু হ্যামিলটন যেমন দরদ দিয়ে শ্রদ্ধা নিয়ে আয়র্ল্যাণ্ডের কথা বলতেন, স্বামীজী ঠিক তেমনি করেই ভারতের কথা বলছেন। ভারত কি আলাদা একটা ন্যাশন? ধর্মের দিক দিয়ে তাই বটে কিন্তু বস্তুতঃ ভারত কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটা অংশ নয়? আমি অনেককিছু এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না।

মহারাজ বসেছিলেন নিবেদিতার পাশে। নিবেদিতা তাঁর মুখপানে তাকিয়ে রইলেন তাঁর কাছ থেকে কিছু শোনবার প্রত্যাশা নিয়ে।

কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হলো না। মহারাজা অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন।

নৈনিতাল ত্যাগ করে আলমোড়া অভিমুখে চললেন স্বামীজী শিষ্য-শিষ্যাদের সঙ্গে নিয়ে। মহারাজা সমস্ত আয়োজন করে দিলেন। মেয়েদের জন্যে এলো ডাণ্ডি আর ছেলেদের জন্যে টাট্টু ঘোড়া। তাদের পিঠে উঠে সকলে যাত্রা আরম্ভ করলেন। নানা-প্রকার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে ওঁরা এগিয়ে চললেন সামনের দিকে। চারদিনের দিন পৌঁছলেন আলমোড়া পর্বত-মালায়। তার অনির্বচনীয় প্রাকৃতিক শোভা দেখে মুগ্ধ হলেন

নিবেদিতা। বন্ধু নেলহ্যামণ্ডকে চিঠি লিখলেন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মে তারিখে, '...জায়গাটা বাইরের জগৎ থেকে খুব কাছে নয়। কিন্তু গোড়া থেকেই বিরাট বাহিনীর সঙ্গে এতখানি পথ আসায় মনে হয়নি যে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। এই দুর্গের মত পাহাড়ঘেরা ছোট্ট বসতিটি যে আসলে কত দূরে আর কতখানি নির্জন তা আমি যেন বুঝতেই পারলুম না।...এখানে আছে এক-রকম পাইন গাছ। তাকে বলে দেওদার। এদের দেখতে অনেকটা লার্চ আর সেডারের মত। এরা বিরাট আর চমৎকার। ওদেশে শরৎকালে কালোজামের যেমন একটা গন্ধ ওঠে তেমনি একটা সুগন্ধ আছে এই গাছগুলোতে। এখানে এতো উঁচুতে আমাদের চারদিকে কেবল দেওদার। সব-কিছুর মত ওরাও যেন এখানকার ভাষাহীন গাম্ভীর্যকে বাড়িয়ে তুলেছে। তুষার-চূড়ারও ঐ কাজ। সামনে গোলাপী-রঙের নীচু পর্বতবলয়। তার ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে দেবতাত্মা হিমালয়ের তুঙ্গ শুভ্র শৃঙ্গরাজি। বিরাটের মহিমা এখানে কোনমতেই ভোলবার নয়।

আলমোড়ায় এসে সেভিয়ার দম্পতির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল স্বামীজীর। তাঁরা স্বামীজীর জন্যে এবং তাঁর তরুণ শিষ্যদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। মেয়েদের জন্যে ভাড়া করা হলো পৃথক বাড়ী। মিস্ ম্যাকলাউড ও মিসেস বুল পুস্তকপাঠ আর চিত্রাঙ্কন নিয়ে ব্যস্ত রইলেন।

আলমোড়ায় নিবেদিতা একাকিনী হয়ে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। বনফুল সংগ্রহ করে আনন্দ পেতেন। স্বামীজী তাঁকে ঐভাবে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকবার অধিকার দিয়েছেন। কেননা হিমালয়ের এই অঞ্চলে কেমন একটা বৈরাগ্যভাব রয়েছে। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে এসে যাতে নিবেদিতার মন পূর্ণতালাভ করতে পারে—তাঁর মন মুক্ত হয়ে দেশ ও দশের সেবায় যাতে আত্মোৎসর্গ করতে পারে এই আশায় স্বামীজী তাঁকে নিয়ে

এসেছেন। নিবেদিতাও দিনের পর দিন নিঃসঙ্গ হয়ে এবং নির্জন পরিবেশের মধ্যে একাকিনী থেকে আত্মোপলব্ধি করার সুযোগ পেলেন। প্রথম প্রথম তাঁর পক্ষে এ কাজে যথেষ্ট কষ্ট পেতে হয়েছিল সত্যি কিন্তু স্বামীজীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তিনি সবকিছু কষ্ট মাথায় তুলে নিলেন। একসময় স্বামীজী এইসব অঞ্চলে এসে কঠোর সাধনভজন করে মনকে বৈরাগ্যময় এবং বজ্রসম কঠোর করে তুলেছিলেন। এখন তিনি নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ অনুভূতি নিয়ে নিবেদিতাকে শিক্ষা দিতে লাগলেন ত্যাগের সুমহান ব্রত—সেবার অত্যুজ্জ্বল আদর্শ। তিনি বললেন,'আমিত্ব' ভুলে নিজের স্বরূপ বিরাটের সঙ্গে—অখণ্ড অদ্বিতীয়ম পরমাত্মার স্বরূপের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। ঈশ্বর সর্বব্যাপক। তিনি যেমন অণুপরমাণুর মধ্যে রয়েছেন তেমনি আছেন মহাব্যোমের বিরাট এবং অসীম পরিধির মাঝে। এ জীবজগৎ তাঁরই মহান সৃষ্টি। তিনি রয়েছেন সকলের অন্তরে। সুতরাং ঈশ্বররূপী চৈতন্যময় জীবকে সেবা করলেই তাঁকে সেবা করা হবে। এই সেবাকর্মের মত মহৎ কর্ম আর নেই। তবে এটি হওয়া চাই নিষ্কাম। তাতে আছে আনন্দ। আমাদের হিন্দুশাস্ত্র গীতায় এই নিষ্কাম যোগের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করেছে। স্বামীজী বললেন, 'দেবতা বিশ্বযজ্ঞে আপনাকে আহুতি দিয়েছেন, মানুষের আত্মদান সে বিরাট আত্মোৎসর্গের তুলনায় তুচ্ছ। উৎসর্গ-ভাবনায় গভীর ধ্যানানন্দে অহন্তা যাবে জীর্ণ হয়ে, আত্মা বিভাসিত হবেন স্বপ্রকাশ মহিমায়। কী করে? কেমন করে? কর্ম করেই অবশ্যই, কিন্তু সে হবে বিশুদ্ধ কর্মযোগ। ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতে তেমন কর্ম যে করতে পারে, সে-ই ধন্য।'

স্বামীজীর কথা মন দিয়ে শুনলেন নিবেদিতা। তাঁর মনে এখনও জেগে রয়েছে সংশয়। পাশ্চাত্যদর্শন ভাল করে পড়েছেন তিনি। সেই দর্শনের গোড়ায় এবং শেষকালে রয়েছে সংশয়ভরা সিদ্ধান্ত। তার ওপর নিবেদিতার মন সরল এবং বিপ্লবী। তাই

তাঁর পক্ষে সবকিছু নির্বিচারে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সব সময়ের জন্যে মনের মধ্যে যুক্তিতর্কের জাল বুনে চলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দও বেশ ভালভাবে জানেন এই রহস্য। তিনি নানাভাবে চেষ্টা করলেন সেই যুক্তিতর্কের জাল ভেদ করতে। চালালেন বেদান্তদর্শনের তৈরী অসি। তাই দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলেন নিবেদিতার মনের যাবতীয় যুক্তিতর্কের জাল—ঘোচাতে লাগলেন সংশয়ের অমানিশা।

কেবল তত্ত্ব ও তথ্য-কথা দিয়ে নিবেদিতার মনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। তাই তিনি স্থির করলেন আচার-অনুষ্ঠান ও যোগ্য পরিবেশ প্রয়োজন। ইতিমধ্যে নিবেদিতা ব্রহ্মচারিণীর যাবতীয় কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও আচার-অনুষ্ঠানে মনসংযোগ করেছেন। এবার স্বামীজী তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন পরিবেশের মধ্যে।

যে কোন মানুষের মনের পরিবর্তন আসে যথেষ্ট সময়ের ব্যবধানে। এই ব্যবধান প্রয়োজন হয় তাকে পরীক্ষার জন্যে। মনকে ভেঙে-চুরে গড়ে-পিঠে তৈরী করতে হয় নানা ঘটনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে। নিবেদিতার জীবনীকার শ্রীমতী লিজেল রেমঁ লিখেছেন নিবেদিতার সংশয়াকুল মনের গতিবিধি প্রসঙ্গেঃ····· মনের মধ্যে অবুঝ বিক্ষোভ চলে। নিজের ওপর নিজেরই বিরক্তি ধরে। নিবেদিতা যা কিছু করছেন যা কিছু বলছেন স্বামীজীর উদ্দেশ্যে, মনে হয় সে যেন তার সম্বন্ধে মোটেই সচেতন নন। একদিন বলে বসলেন, 'মেয়ে যখন বাপের বাড়িতে থাকে তখন তার এমনভাবে চলা উচিত নয় যাতে লোকের মনে হবে বাড়িতে ঝি-চাকরের অভাব আছে।' কথাটায় মন দমে যায়। নিবেদিতা বুঝতে পারেন, দিন দিন মনের মাঝে তিক্ততার ভাব বেড়ে উঠছে। মনের গতিক দেখে তিনি আশ্চর্য হন, কিন্তু তার ওপরে তো তাঁর কোনও কর্তৃত্ব নেই। নিজেকে

যতই তিরস্কার করেন, বাইরে গুরু-শিষ্যার সম্পর্কে ততই টান পড়ে।

'জোর করে যেসব মনোভাবকে দমিয়ে রেখেছিলেন নিবেদিতা, আজ যেন তাদের মধ্যে ঠোকাঠুকি লেগে গেছে। এই মিলিয়ে যায়, পরমুহূর্তে অপ্রত্যাশিত আকারে আবার তারা মাথা তোলে। তাঁর চারপাশে যেন দানবের তাণ্ডব সুরু হয়েছে। তারা বিদ্রোহী, কিছুকে রেয়াত করে না, তাদের কথায় যেন ক্ষীরের মাঝে হীরের ছুরি। কর্মহীন হয়ে, কাউকে ভালবাসতে না পেরে, কেমন করে আপনাকে প্রকাশ করবে নিবেদিতা ভেবে পান না। মনে হয় সবাই তাঁকে ছেড়ে গেছে।'…(নিবেদিতা—শ্রীমতী লিজেল রেমঁ—পৃঃ ১৬৪)

স্বদেশপ্রেমিক এবং বিখ্যাত জাতীয় নেতা সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর 'ভারত-পথিক' গ্রন্থে নিজের মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা প্রসঙ্গে লিখেছেন: '…তবে একটা জিনিস সকলের মধ্যেই দেখা যায়। বড় একটা কিছু করতে গেলে জীবনে বিপ্লবের স্থান অপরিহার্য। এই বিপ্লবের দু'টি দিক। প্রথমে সংশয়, তারপর পুনর্গঠনের চেষ্টা। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে বিপ্লবকে সফল করে তুলতে হলে যে জীবনের মূল সমস্যাগুলির সমাধান করতেই হবে এমন নয়, কারণ এইসব সমস্যাকে আমরা সাধারণত সৃষ্টির মূল রহস্যের অঙ্গীভূত বলেই মনে করি। অতি প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে এবং পাশ্চাত্যে জড়বাদ ও অজ্ঞেয়তাবাদের উপর বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ গড়ে উঠেছে। অবশ্য আমার ক্ষেত্রে ধর্মচর্চাটা ছিল নেহাতই ব্যবহারিক প্রয়োজনে। জীবনের প্রতিপদে যেসব দ্বিধা, যেসব সংশয় মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলতো, সুচিন্তিত একটি জীবনদর্শন ছাড়া আর কিছুতেই তাদের জয় করা সম্ভব ছিল না। বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ আমাকে এই রকম একটি আদর্শের সন্ধান দিলেন। এই আদর্শকে জীবনের মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ

করার ফলে বহু সমস্যা, বহু সংকট আমি সহজেই পার হয়ে এসেছি। অবিশ্যি তাই বলে মনে করবেন না সব সংশয়েরই চিরকালের জন্য অবসান ঘটেছিল। দুঃখের বিষয়, আমার মনকে সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত করা কোনোকালেই সম্ভব হয় নি, হওয়ার কথাও নয়, কারণ সচেতনভাবে বাঁচতে হলেই পদে পদে সংশয় দেখা দেবে। মানুষের কাজই এই সংশয় জয় করা।'……

(ভারত-পথিক—সুভাচন্দ্র বসু—পৃঃ ৬৬-৬৭)

নিজের অন্তরে পূর্বসংস্কার এবং 'আমিত্ব' জ্ঞান ভোলবার জন্যে স্বামীজী নিবেদিতাকে অনেকবার নানারকমভাবে বোঝাতে লাগলেন। সময় সময় এই নিয়ে গুরু-শিষ্যার মধ্যে তুমুল তর্কযুদ্ধ চলতো। একবার স্বামীজী নিবেদিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন আরও উঁচুতে অন্য এক পাহাড়ের চূড়ায়। তাঁর ধারণা, এবার গুরু ছাড়া নিবেদিতা জানতে চেষ্টা করুক, আত্মোপলব্ধি কাকে বলে। ধ্যানের গভীরে নিজের মনকে নিয়ে না গেলে আত্মোপলব্ধি সম্ভব হয় না। তাই একদিন নিবেদিতা স্বামী স্বরূপানন্দের সঙ্গে চলে গেলেন এক নির্জন স্থানে ধ্যান করার ইচ্ছায়। দু'জনে ধ্যানে বসলেন। নিবেদিতা হৃদয়ঙ্গম করলেন ধ্যানের মাহাত্ম্য। এমনিভাবে বেশ কয়েকদিন কাটলো নিবেদিতার ধ্যানধারণার মধ্য দিয়ে।

এই প্রকার কৃচ্ছ্র সাধনার কথা প্রসঙ্গে তিনি লিখলেন: '…এখন আমার কাছে ধ্যানের ভাবটি যে কত সত্য হয়ে উঠেছে তা বলে বোঝাতে পারি না। এ বলে বোঝাবার নয়। মনে হয়, এ প্রত্যক্ষের জিনিস, সাক্ষাৎ অনুভবের বস্তু। এখানে এই পাহাড়ের হাওয়ায়-হাওয়ায় নক্ষত্রের ঝিকিমিকিতে কী যে গভীর রহস্য-ভরা শান্তি নিথর হয়ে আছে, বোঝাব কি করে! ধ্যানের সরল অর্থ হলো একাগ্রতা। একটা কিছুতে চিত্তের পরিপূর্ণ একাগ্রতার নামই ধ্যান!…যে মুহূর্তে সমস্ত শক্তি সংহত করে এক পলকের

জন্যও চিত্ত একাগ্র করতে পারবে তখনই তোমার ধ্যান শুরু হলো, বাকীটা আপনি হবে। এ-অবস্থায় আগে মনে বড়-বড় ভাব জাগে। আর চিত্ত যদি সম্পূর্ণ স্তব্ধ থাকে, সে বড় চমৎকার লাগে। তাই না? মেটার লিঙ্ক একেই বলেছেন, "সিসৃক্ষার বিপুল স্তব্ধতা"?

কিছুদিন পরে গুরুর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হলো নিবেদিতার। স্বামীজী এবার শিষ্যার চোখ মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারলেন, তার অন্তরে দ্রুত পরিবর্তন আসছে। শিষ্যার এই প্রকার ভাব উপলব্ধি করে খুসী হলেন স্বামীজী। ভাবলেন, এবার বৈরাগ্যের প্রতীক হিমালয়ের কোলে আসা সার্থক হয়েছে। হরগৌরীর বৈরাগ্যময় জীবনমহিমার ধীরে ধীরে প্রকাশ ঘটছে নিবেদিতার জীবনে। তার অন্তর হতে আমিত্ব-জ্ঞানের অহমিকা-কুজ্ঝটিকা ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছে। আর কিছুদিন পরে অন্তরাকাশে দেদীপ্যমান হবে সত্যের অম্লান জ্যোতি।

নিবেদিতা ক্রমশ নিজেই বুঝতে পারলেন, তাঁর অন্তরভূমি ধীরে ধীরে নতুন রূপ নিচ্ছে। এসব উপলব্ধির কথা তিনি স্বদেশের বন্ধু-বান্ধবীদের কাছে পত্রমারফত জানাতে লাগলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে বন্ধু নেলকে লেখা এক পত্রে জানালেন নিবেদিতা: 'অনেক কিছুই শিখেছি। মনের একটা বিশেষ অবস্থা আছে, তাকেই বলে আধ্যাত্মিকতা। সেটা পাওয়া দরকার। মানুষের ভালবাসা পাওয়ার জন্যে যেমন মন কাঁদে, ভগবানকে পাওয়ার জন্যেও অন্তরাত্মা তেমনি হাহাকার করে। যাকে আমি মহানুভবতা বা নিঃস্বার্থপরতা মনে করতুম, প্রকৃত অহংশূন্যতার তীব্র জ্যোতির কাছে তা আজ কিছুই নয়। মনে হয় নিতান্ত ঠুনকো, নিতান্ত খেলো। সত্যের এই প্রথম পাঠগুলো আয়ত্ত করতে যে আমার এত সময় লাগলো এ বড় আশ্চর্য না? আপাতত এর বেশি কিছু বুঝতে পারছি না। অতীতে মানুষের জীবন ও মানুষের সম্পর্ক নিয়ে আমার যেসব ধারণা ছিল, সেগুলো এখনও নস্যাৎ করে দিতে পারি

নি। অথচ সাধু মহাপুরুষেরা সেগুলো উড়িয়ে দেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন বুঝতে পারি। তাঁরা কি নিতান্তই ভুল করেন? এখনও আমি যেন সন্ধ্যার আবছা আঁধারে পথ হাতড়াচ্ছি, একে-ওকে জিজ্ঞাসা করছি, প্রমাণ খুঁজছি। কিন্তু কোন-না-কোনদিন সত্যকে প্রত্যক্ষ করবো এ-আশা রাখি। নিশ্চিত প্রত্যয়ে সে-সত্য আর পাঁচজনকেও সেদিন দান করবো।'

স্বামীজীও বজ্রকণ্ঠে নিবেদিতার পাশে থেকে উৎসাহ দিতে লাগলেন: 'তোমার ভাবনা, তোমার প্রয়োজন, তোমার ধারণা, তোমার অভ্যাস সব-কিছুকেই হিন্দু ছাঁচে ঢালতে হবে তোমায়। অন্তরে-বাইরে নিষ্ঠাবতী ব্রহ্মচারিণীর মত জীবন গড়ে তুলতে হবে। কেমন করে তা হবে সেজন্যে ভেবো না। তোমার মনে যদি ইচ্ছার অভাব না থাকে উপায় আপনি খুঁজে পাবে। তোমায় কিন্তু তোমার অতীত ভুলতে হবে, যাতে ভুলে যাও তাই করতে হবে। ওর আবহাওয়া পর্যন্ত ভুলতে হবে।'

নিবেদিতা নাম গ্রহণ করার পর মার্গারেট নিজেকে মনে-প্রাণে ভারতীয় কন্যারূপে ভাববার এবং সেইমত কাজ করবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। আলমোড়ায় থাকার সময় তিনি স্বামীজীর কাছ থেকে কেবল যে বেদান্ত দর্শনের পুঁথিগত শিক্ষা গ্রহণ করতেন এমন নয় সেগুলিকে বাস্তব এবং ব্যবহারিক জীবনে যাচাই করে দেখতেন। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে প্রাণখোলা মেলামেশা করতে লাগলেন। তারাও নিবেদিতার মত একজন বিদেশিনীর মধ্যে মাতৃসুলভ স্নেহ-ভালবাসা দেখে আনন্দিত হতো। এই কারণে তারা নিবেদিতাকে কখনো 'মা' বলে, কখনো বা 'দিদি' বলে সম্বোধন করতে লাগলো। তাদের মনের ঐ প্রকার ভাব ব্যাখ্যা করে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন তারিখে বন্ধু নেল হ্যামণ্ডকে লিখলেন এক পত্র:'...এর ফলে হিন্দুদের এতো আপন হয়েছি আমি। এখন তারা আমায় যে বিশ্বাস করে, তার ধরনটা

আগের চেয়ে একেবারে আলাদা। এর আগে আমরা সবাই ছিলুম 'মা', এখন আমি হয়েছি 'দিদি'। আর শুনতে অদ্ভুত লাগলেও আসলে আগেরটার চাইতে শেষের সম্বোধনটায় বেশী আত্মীয়তা আর অকৃত্রিম প্রীতি প্রকাশ পায়'।

আলমোড়া থেকে স্বামীজী এবার রওনা হলেন কাশ্মীর অভিমুখে। জুনের প্রথম দিকে যাত্রা করে প্রথমে এলেন কাঠগোদামে। পথে পড়লো ভীমতাল হ্রদ। তার তীরে তাঁবু ফেলে একটা রাত কাটিয়ে দিলেন। হ্রদের তীরে বসে দূরে পাহাড় দেখে স্বামীজী শুরু করে দিলেন গল্প বলতে। তিনি বললেন, ঐ পাহাড়ে আগে বাস করতো কিন্নর-কিন্নরীরা। ওরা এখনো নাকি ওখানে আছে। মাঝে মাঝে ওদের দেখা পাওয়া যায়। স্বামীজী একদিন ওরকম জীবকে দেখেছেন জঙ্গলে।

এই ভ্রমণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন নিবেদিতা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়'তে। তিনি লিখেছেন: '১১ই জুন। শনিবার সকালে আমরা আলমোড়া পরিত্যাগ করলুম। কাঠগোদাম পৌঁছতে আমাদের আড়াইদিন লেগেছিল। আহা! কি অপরূপ সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়েই পথটুকু অতিবাহিত হয়েছিল। নিবিড় অরণ্যানী—গ্রীষ্মপ্রধান দেশেরই সব গাছপালা,—দলে দলে বানর, আর চিরবিস্ময়কর ভারতবর্ষ-সুলভ রজনী।

রাস্তার এক জায়গায় এক অদ্ভুত রকমের পুরান পানচাকটীর আর শূন্য কামারশালার কাছে স্বামীজী ধীরা মাতাকে বললেন, লোকে বলে, এই পার্বত্য অংশে এক জাতীয় গন্ধর্বসদৃশ অশরীরী জীবের বাস। আমি একটি সত্য ঘটনা জানি, তাতে এক ব্যক্তি এখানে প্রথমে ঐসব মূর্তির দর্শন পান আর তার বহু পরে এই জনশ্রুতির বিষয় জানতে পারেন।

এখন গোলাপের ঋতু উত্তীর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু অপর এক প্রকার ফুল (কামিনী ফুল) ফুটে রয়েছিল, তা স্পর্শ মাত্রেই ঝরে

পড়ে। ভারতীয় কাব্যজগতের সঙ্গে এর স্মৃতি বিশেষভাবে জড়িত বলে ওটি আমাদেরকে দেখিয়ে দিলেন।'

কাঠগোদাম থেকে ট্রেনে চাপলেন স্বামীজী। সঙ্গে চললো শিষ্য-শিষ্যাগণ। পাঞ্জাবের জনাকীর্ণ সহর লাহোর লুধিয়ানার ওপর দিয়ে ট্রেন ছুটে চললো উত্তরাভিমুখে। শেষ স্টেশন হলো রাওয়ালপিণ্ডি। এটি পাহাড়ের বেশ কিছুটা উঁচুতে। এখান থেকে স্বামীজীর সঙ্গে রইলো মাত্র তিনজন মহিলা—নিবেদিতা, ম্যাকলাউড আর বুল। ওঁরা তিনজন নানাপথ ঘুরে অবশেষে এসে পড় লন কাশ্মীর উপত্যকায়। পরে তিনখানা হাউসবোট ভাড়াকরে কাশ্মীরের মনোরম প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন। সময় সময় স্বামীজী ওঁদের ছেড়ে চলে যেতেন অন্যত্র। সেখানে গভীরভাবে ধ্যানে ডুবে যেতেন।

শ্রীনগর সহরে থাকার সময় স্বামীজীর কাছ থেকে অনেক নিমন্ত্রণ আসতো। তিনি সেগুলি যথাযথভাবে রক্ষা করতে লাগলেন। কাশ্মীরের মহারাজার সঙ্গেও দেখা করলেন।

এখানে থাকার সময় প্রতিদিন সকালে ধর্মচর্চা হতো। নিবেদিতা প্রমুখ শিষ্যারা মন দিয়ে শুনতেন সেসব কথাবার্তা। নিবেদিতার কেবল মনে হতো, স্বামীজী বোধহয় তাঁকে ত্যাগ করে চলে যাবেন। কেন না, সেই সময় তিনি স্বামীজীর মধ্যে এমনভাব লক্ষ্য করেছিলেন যাতে করে তাঁর পক্ষে ওরকম ধারণা করা সম্ভব হয়েছিল।

একদিন স্বামীজী তাঁর দু'জন আমেরিকান শিষ্যাকে নিয়ে যান গুলমার্গে। সেখান থেকে উনি একা যান অমরনাথ অভিমুখে। কিন্তু অত্যধিক বরফ পড়ার জন্যে তিনি যেতে পারলেন না। যাত্রা স্থগিত রাখতে হলো। তবে অমরনাথে যাবার আশা ত্যাগ করলেন না। পরে একবার গিয়ে দর্শন করে আসবেন শিবের বরফস্তূপের

লিঙ্গমূর্তি। মাত্র একদিন স্থায়ী হয়। তাসত্ত্বেও বহু লোক যায় ঐ মূর্তি দর্শন করতে।

কিছুদিন শ্রীনগরে কাটিয়ে ওঁরা নৌকাযোগে যাত্রা করলেন ইসলামাবাদ অভিমুখে। তখন জুলাই মাস। প্রথমে ওঁরা এসে থামলেন পন্ধর নামে এক ভাঙামন্দিরের কাছে। স্থানটি অরণ্য-ঘেরা। তার মধ্যে আছে একটি হ্রদ। তাতে অর্ধনিমগ্ন দেউলে শোভা পাচ্ছেন নিদ্রিত দেবতা, মন্দিরটি চারকোণা। পাথর দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। দেখতে ঠিক পিরামিডের মত, চূড়ো নেই। মন্দিরের একদিকে রয়েছে বুদ্ধমূর্তি অন্যদিকে তাঁর জননী মায়াদেবী। বিগ্রহের পাথরগুলি ভাঙা ভাঙা। স্বামীজী সেই ভাঙা পাথরের ওপর হাত বোলালেন।

এবার ফেরার পালা। আসার আগে স্বামীজী একটি বনফুল তুলে নিয়ে ভগবান তথাগতের শ্রীচরণে অর্পণ করে বললেন, হে মৃত্যুঞ্জয়ী জিন, আমার সহায় হয়ো তুমি।

এরপর এক দৃষ্টিতে বুদ্ধকে দেখতে দেখতে বললেন নিবেদিতাকে, মনে রেখো, অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম যা দিতে চেয়েছিল, পৃথিবী তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। এবার হয়েছে। পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছে, বুদ্ধ তাদের সবার চেয়ে বড়। তাঁর একটি নিঃশ্বাসও নিজের জন্যে পড়তো না। সবচাইতে বড় কথা, কোনও পূজো চাননি তিনি, কোন প্রতিষ্ঠা না। গণিকা অম্বপালীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। জানতেন পরিণামে মৃত্যু হবে তবু পারিয়ার সঙ্গে খেয়েছেন। বুদ্ধি আর হৃদয়ের এমন সমন্বয় আর চোখে পড়ে না। সত্যি, তাঁর মত আর কেউ নেই।

পন্ধরনাম থেকে ওঁরা এলেন অবন্তীপুরের মন্দির দেখতে। তারপর গেলেন বিজবেনারার মন্দির আর মার্তণ্ড মন্দির দেখতে।

একদিন একাদশী তিথি দেখে স্বামীজী নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে চললেন অমরনাথ অভিমুখে। তাঁর একান্ত ইচ্ছা অমরনাথের

শ্রীচরণে নিবেদিতাকে সমর্পণ করে তাঁর কাছ থেকে শক্তি-ভিক্ষা করবেন। শেষ পর্যন্ত তাই হলো। পহলগাম, চন্দনওয়ারি প্রভৃতি জায়গা ঘুরে ওঁরা এসে পৌঁছলেন চিরতুষারাবৃত অমরনাথ তীর্থে। মন্দিরে প্রবেশ করলেন স্বামীজী। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম জানালেন ত্রিগুণাতীত স্বয়ম্ভু অমরনাথকে। তারপর টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন মন্দিরের বাইরে। নিবেদিতা স্বামীজীর ভাব দেখে কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন স্বামীজীর মুখের দিকে। অমরনাথের মাহাত্ম্য জানতে চাইলেও তা জানা হলো না নিবেদিতার। স্বামীজী তাঁর কাছে কিছুই ব্যক্ত করলেন না। তিনি যে শিবভাবে বিভোর। কেবলমাত্র নিবেদিতার হাত ধরে স্বামীজী একটি কথা বললেন, শান্ত হও। নিজেকে উজাড় করে দিতে শেখো তাহলেই পাবে সত্যিকার আনন্দ।

এবার নিজেকে সহজ করতে চেষ্টা করলেন নিবেদিতা। তাঁর অন্তর হতে চলে যেতে লাগলো শতপ্রকার সংশয়ভাব। তবু তাঁর মনে একটা প্রশ্ন জেগে রইলো, কেন স্বামীজী আমাকে কিছু দিলেন না? তিনি অমরনাথকে দর্শন করে যে অপূর্বভাবে বিভোর হয়েছেন সেইভাব কেন তাঁকে দিতে পারলেন না? নিবেদিতা কোন্ দোষে বঞ্চিত হয়েছেন?

মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারলেন না নিবেদিতা তাঁর অন্তরের জিজ্ঞাসা—চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব। তথাপি তাঁর গুরুদেব শিষ্যার অন্তরভাব বুঝতে পেরে বলে উঠলেন: 'মার্গট, তুমি যা চাইছো তা দেবার শক্তি আমার নেই। এখন কিছুই বুঝতে পারছো না। কিন্তু তীর্থকৃত্য শেষ করেছ তুমি, এর কাজ ভেতর ভেতর হবেই। কারণ ঘটলে কাজ দেখা দেবেই। পরে সব বুঝতে পারবে। এর ফল ফলবেই।'

অমরনাথ থেকে স্বামীজী নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন পহলগামে। ওখানে অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে দেখা করে খুসী

হলেন। তারপর ফিরলেন শ্রীনগরে। এখানে এসে বোটের ওপর দু'দিনের মত বিশ্রাম নিলেন স্বামীজী। তিনি শিবভাবে বিভোর। হঠাৎ ভাবের ঘোরে বলে উঠলেন, 'অমরনাথে শিব আমাকে বর দিয়েছেন। স্বেচ্ছায় না মরতে চাইলে আমার মৃত্যু নেই।' তারপর বললেন, 'অষ্টপ্রহর শিব যেন মাথায় চেপে আছেন। নামতে চাইছেন না।'

শিবভাবের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর মনে এলো মাতৃভাব। কালী-মূর্তির প্রকাশ দেখতে পেলেন নৌকার এক মুসলমান মাঝির মেয়ের মধ্যে। শিষ্যাদের মাঝে, চাকর-বাকর বা নদীর তীরে পথচারীদের মাঝেও তিনি দেখলেন কালীমূর্তী। তাঁর করালিনীর রূপ প্রসঙ্গে নিবেদিতা পরবর্তীকালে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'Kali the mother'-এ লিখেছেন, 'দীর্ঘ আলুলায়িত কুন্তল লুটিয়ে পড়েছে তাঁর পিছনে—ধাবমান বায়ুর, কালের বা ঘটনার স্রোতের মত। কিন্তু ত্রিনয়নার দৃষ্টিতে কাল মহাকাল, সেই মহাকালই ঈশ্বর। এক বিপুল ছায়ার মত কৃষ্ণায়িত তাঁর অঙ্গের নীলিমা। জীবন-মৃত্যুর রূঢ় সত্যের প্রতীক তিনি। তাই মা আমার নগ্না দিগ্‌বসনা। কিন্তু এ-আঁধার শিবের কাছে আঁধার নয়। এই ভীষণাদপি ভীষণার হৃদ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে অপলক দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে আছেন। ধ্যানে তাঁর তত্ত্ব জেনে তাঁকে ডাকেন 'মা' বলে। এই তো শক্তি আর শূন্যের সাযুজ্য।'

অতঃপর স্বামীজী কালীভাবে বিভোর হয়ে একটি কবিতা লিখে ফেললেন। কবিতার নাম 'Kali the mother'। কবিতাটি নিম্নরূপ :

'The stars are blotted out,
Clouds are covering clouds,
It is darkness, Vilerant, sonant.
In the roaring whirling wind

Are the souls of a million lunatics,—
But loosed from the prison house,—
Wrenching trees by the roots,
Sweeping all from the path.
The sea has joined the fray,
And swirls up mountain-waves,
To reach the pitchy sky.
Scattering plaguas and sorrows,
Dancing mad with joy,
Come, mother, come !
For terror is thy name,
Death is in thy breath,
And every shaking step.
Destroys a world for e'er.
Thou "Time" the All-Destroyer !
Then come, O mother, come !
Who can misery love,
Dance in destruction's dance,
And hug the form of Death,—
To him the mother comes.'

এবার স্বামীজী বললেন নিবেদিতাকে, নিবেদিতা, তুমি মহা কালীর ধ্যান করো, মাকে তোমার অন্তরমন্দিরে বসাতে চেষ্টা করো। মাতৃশক্তি না জাগলে তুমি পূর্ণ হবে না। তোমার কর্মযোগও পুষ্টিলাভ করবেনা। মহামায়া হচ্ছেন জগতের মহাশক্তি। তিনিই এই জীব-সংসারে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ক্রিয়া করে চলেছেন। ঈশ্বরের অন্যতম শক্তি এই মহাকালী। ইনি ঈশ্বরের বামশক্তি। ইনি কেবল ধ্বংসের দেবী নন, সৃষ্টি ও পালনকর্ত্রী। তুমি এঁর শরণাপন্ন হও।

ইনি তোমাকে কৃপা করলে তুমি হবে শক্তিময়ী। ভারতের কাজ করতে পারবে সুষ্ঠুভাবে।

এভাবে নিবেদিতাকে মহাশক্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ শোনালেন স্বামীজী। তারপর তিনি চলে গেলেন ক্ষীরভবানীর মন্দিরে। সেখানে চাল, বাদাম আর ক্ষীর দিয়ে মাকে অর্চনা করলেন। যাবার সময় তিনি নিবেদিতাকে বলে গেলেন, আমার সঙ্গে কেউ যেন না আসে। সেদিন ছিল ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ।

স্বামীজী চলে গেলেন। ধ্যানে বসলেন নিবেদিতা। কিন্তু তিনি কালীর ধ্যান করতে পারলেন না। তাঁর সামনে ভেসে উঠলো লণ্ডনে কোন এক গির্জার মধ্যে মেরীর মূর্তি। তথাপি প্রাণপণে তিনি মহাশক্তির সামনে নিজেকে উপস্থিত করার আকুতি জানালেন। মেরীর মধ্যে মহাকালীর সত্তা আবিষ্কার করতে ইচ্ছা করলেন। তাঁর মন হতে পূর্বসংস্কার তখনো পর্যন্ত যায় নি। ধীরে ধীরে প্রার্থনার মন্ত্রে আর ধ্যানের অভ্যাসে সেই সংস্কার কাটতে লাগলো। নিবেদিতা ক্রমশ উপলব্ধি করলেন তাঁর হৃদয়ের মধ্যে মহাশক্তির জাগরণ। আনন্দ ও উল্লাসে তাঁর হৃদয় পূর্ণ। নিজেকে আর তিনি দুর্বল বোধ করলেন না। উপলব্ধি করলেন, এই বিশ্বচরাচরে যেখানে যতরকম লীলা চলছে তাঁর অন্তরে যে শক্তিপ্রবাহ ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হচ্ছে তিনিই হচ্ছেন মহাশক্তি। তিনি কখনো মৃদুমন্দ শক্তি সঞ্চার করছেন আবার প্রয়োজনে কখনো বা বজ্ররূপে আঘাত হানছেন। তাঁর ইঙ্গিতে চন্দ্র-সূর্য ঘুরছে, ঘুরছে গ্রহ, উপগ্রহ আর নক্ষত্র-মণ্ডল। অসীম ব্যোমেও তাঁর শক্তি লীলা করছে। ঝঞ্ঝা, সাগরতরঙ্গ হতে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র পিপীলিকার চলার গতির মধ্যে রয়েছে সেই অপরূপা লীলাময়ী মহাকালীর শক্তি। মা হচ্ছেন কল্যাণদায়িনী। সন্তানের দুঃখ-কষ্টে তিনি হন অভিভূতা। তা দূর করতে এগিয়ে আসেন।

আবার সন্তান কুপথগামী হলে তিনি তাকে শাসন করে ফিরিয়ে আনেন স্বপথে। এভাবে বিশ্বময় চলেছে মাতৃলীলা। নিবেদিতা হৃদয়-মন দিয়ে উপলব্ধি করলেন।

পার্বত্য পরিবেশে নির্জন স্থানের মাঝে একাকিনী থেকে মহাকালীর ধ্যান করার সময় তিনি গুরুশক্তিতে বুঝতে পারলেন জগদ্ধাত্রীর অপরূপ লীলাকৌশল। মাঝে মাঝে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে চীৎকার করতে লাগলেন, মা—মা, আনন্দময়ী, আমার মধ্যে প্রকাশ হয়ে আমার প্রাণের তৃষ্ণা মিটিয়ে দে।

এমনিভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। ক্ষীরভবানীর মন্দির হতে ফিরলেন স্বামীজী। তাঁকে আসতে দেখে ভক্তিভরে প্রণাম জানালেন নিবেদিতা। তারপর অশ্রুসিক্ত নয়নে ভক্তিগদগদ কণ্ঠে বলে উঠলেন, এতদিনে চিনেছি আমার মাকে।

মাকে চিনতে দেরী হয় বৈকি! তিনি যে মহামায়া। সন্তানকে ভুলিয়ে রেখেছেন তাঁর বিভিন্ন লীলাচাতুর্যে। তাঁর আসলরূপ লুকিয়েছেন ঐ মায়ার লীলায়। সেই লীলার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে প্রথমে। তারপর জানা যাবে তাঁকে। তাঁর গুরু বিবেকানন্দও মাকে জানতে পেরেছিলেন অনেক পরে। গুরুর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক চেষ্টার পর জানতে পেরেছিলেন মহামায়াকে এবং তাঁর লীলাকৌশল। পরে তিনি আবার তাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের কাছে মাতৃশক্তির পরিচয় দিয়ে যান। (এই লেখকের লেখা 'লীলাময় শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহামায়ার দিব্যশক্তিকে সাধন বলে ধরণীর মাটিতে নামিয়ে এনেছিলেন লোককল্যাণের কাজে লাগাবার জন্যে। তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দকে উজাড় করে দিয়ে গেলেন সেই শক্তি। স্বামীজীও আবার চাইলেন তাঁর মানসকন্যাকে সেই মহামায়ার শক্তি দান করতে। তবে তিনি শিষ্যাকে দিয়েছিলেন

স্বাধীনতা। সে নিজে থেকেই অর্জন করে নিক সেই শক্তি মহামায়ার কাছ থেকে। শ্রীরামকৃষ্ণও শিষ্য বিবেকানন্দকে এমনিভাবে আদেশ করেছিলেন।

একদিন স্বামীজী নিবেদিতাকে বললেন, তোমার শ্রদ্ধা আছে কিন্তু যে জ্বলন্ত উদ্দীপনা তোমার মাঝে থাকা প্রয়োজন তা নেই। তাকে জাগাও, তাকে জাগাও! শিব! শিব!!

গুরুর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা অনেকবার পেয়েছেন নিবেদিতা। শিষ্যার ইচ্ছাও প্রকাশ পেল কাশ্মীরে। ভবিষ্যতে নিবেদিতা চান মেয়েদের শিক্ষার জন্যে কলকাতায় একটি শিক্ষালয় গড়ে তুলবেন। স্বামীজী শিষ্যার এই বাসনা অনুমোদন করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার আলোকে তাকে যাচাই করে দেখে নিবেদিতাকে জানালেন, তাঁর নাম জপতে জপতে আমাদের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু মনে রেখো, সবরকম সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ভাঙ্‌তে পারলেই সার্বভৌম শক্তির বাণী প্রচার করা সম্ভব হয়। আমার নিজের জীবন শ্রীরামকৃষ্ণের বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রেরণায় চালিত হচ্ছে। তিনি আমার দিশারী। কিন্তু আর সকলকে নিজের গরজে বুঝে দেখতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ তাদের পক্ষে কতখানি সত্য। একজন মানুষের কাছ থেকেই সারা জগৎ প্রেরণা পাবে এতো হতে পারে না।

অমরনাথ এবং ক্ষীরভবানী দর্শনের পর স্বামী বিবেকানন্দ প্রায় এক সপ্তাহ ভাবমুখে অবস্থান করতে লাগলেন। তাঁর মাঝে প্রকাশ পেল একটি চার বছরের শিশুর আনন্দঘন মূর্তি। কর্তৃত্বাভিমান একেবারে চলে গেল। কর্মযোগী বিবেকানন্দ চলে গিয়ে ভক্ত বিবেকানন্দ আবির্ভূত হলো।

স্বামীজীর তখনকার অবস্থার কথা প্রকাশ পেয়েছে নিবেদিতার লেখা ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ও ১৩ই অক্টোবরের চিঠিতে: 'স্বামীজীর ইতি হয়েছে, তিনি চলে গেছেন চিরকালের জন্যে। এখন তাঁর মধ্যে

কেবল স্নেহ, কেবল ভালবাসা। যারা অন্যায়কারী কিংবা অত্যাচারী তাদের প্রতিও তিনি একটা কথা বলেন না। কেবল শান্তি, কেবল নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া, কেবল আনন্দে আত্মভোলা। এখন যদি মৌনব্রত নিয়ে চিরদিনের জন্যে লোকালয় ছেড়ে যান আমি আশ্চর্য হবো না। তবে এমনটা যদি করেন সে হবে ওঁর আত্মবিলাস, শক্তির পরিচয় নয়। কাজেই আমার মনে হয়, এ ভার উনি কাটিয়ে উঠবেন। কেবল তাঁর বেপরোয়া চলন, তাঁর যুযুৎসা আর আমোদ-আহ্লাদ করবার খেয়াল চিরদিনের মতই চলে গেছে, তাঁর জীবনে আর ওসব ফিরবে না'...

এই সময় স্বামীজী একাকী হাউসবোটে থাকতেন। বেশীর ভাগ সময় ধ্যানে কাটাতেন। তবু সেই অবস্থার মাঝেই নিবেদিতাকে তিনি উৎসাহ জোগাচ্ছেন : 'তুমি আর আমি, আমরা একই ছন্দের অংশ,—যদিও সে বিরাট ছন্দের সবখানি আমরা জানি না। আমরা যেখানকার উপযুক্ত, ভগবান সেখানকার করেই গড়েছেন আমাদের।'

এই কথা বলার পর গান ধরলেন স্বামীজী :

'শ্যামা মা ওড়াচ্ছ ঘুড়ি.......
ঘুড়ি লক্ষে দুটো—একটা কাটে,
হেসে দাও মা হাতচাপড়ি!'

গ্রীষ্মকালের শেষ দিক। এবার কাশ্মীর ত্যাগের পালা। স্বামীজীর কাছ থেকে আদেশ নিয়ে আমেরিকান মহিলাদ্বয় গেলেন উত্তরভারত পরিক্রমায় আর নিবেদিতা একাকিনী রওনা হলেন কলকাতা অভিমুখে। ১লা নভেম্বর তিনি কাশী হয়ে ফিরলেন কলকাতায়।

১৩

কলকাতায় সারদামণির আশ্রয়ে নিবেদিতা

কাশ্মীর থেকে কলকাতায় ফিরে নিবেদিতা সটান ·চলে এলেন বাগবাজারে সারদামণির কাছে। সারদামণি তখন বাগবাজারে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সঙ্গে থাকতো কয়েকজন বিধবা ব্রাহ্মণী। তারা মায়ের সেবা করতো। সেইসঙ্গে শাস্ত্রপাঠ এবং সাধনভজনে মন দিতো। তাদের মধ্যে অনেকে নিবেদিতাকে ভাল নজরে দেখলে না। তাঁর সম্বন্ধে নানারকম মন্তব্য করলে। নিবেদিতার কানে কিছু প্রবেশ করলো। তিনি সামান্য অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। পরে সারদামণি নিবেদিতাকে আশ্রয় দিলেন তাঁর স্নেহের আঁচলে। মায়ের কাছে নিবেদিতা নিষ্ঠাবতী হিন্দু মেয়ের মত জীবন কাটাতে লাগলেন। প্রতিদিন ধ্যানে বসতেন নিবেদিতা। আলমোড়ায় থাকার সময় স্বামী স্বরূপানন্দের কাছে ধ্যান করার অভ্যাস শেখেন। কলকাতায় এসে সেইরকম ধ্যান করতে লাগলেন কিন্তু ঠিকমত করতে পারলেন না। মাঝে মাঝে ধ্যান ভেঙে যেতো। আবার চেষ্টা করতেন। মাথায় ঘোমটা টেনে ধ্যান করতেন। শ্রীমাও নিবেদিতার সঙ্গে মাঝে মাঝে ধ্যান করতেন। তিনি শক্তি সঞ্চার করতেন ওঁর শরীরে। এই প্রসঙ্গে নিবেদিতা একবার বলেছেন, 'মা যখন সম্পূর্ণ আত্মসমাহিত হয়ে থাকতেন একটা প্রচণ্ড শক্তি স্পন্দন বিচ্ছুরিত হতো তাঁর সর্বাঙ্গ হতে। প্রাণের মর্মমূলে যেন তিনি নাড়া দিতেন।'

এমনিভাবে এক পক্ষকাল কাটলো। একদিন সারদামণি নিবেদিতাকে কাছে ডেকে বসালেন। তাঁর পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'এবার তোমার কাজে নামবার সময় এসেছে।'

তারপর বললেন, তোমার জন্যে একটা বাড়ী ঠিক করা হয়েছে। তুমি সেখানে স্থায়ীভাবে থাকতে পারবে।

মায়ের কথা শুনে আনন্দিত হলেন নিবেদিতা। গোপালের মায়ের সঙ্গে গেলেন নতুন বাসা দেখতে। বোসপাড়া লেনের ষোলো নম্বর বাড়ী। পুরনো বাড়ী স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া। তথাপি সেখানে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার জন্যে রাজী হয়ে গেলেন স্বাধীনচেতা নিবেদিতা। তাঁর পড়ার ঘরটি সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিলেন। ইংরিজী ভাষায় অনূদিত ভারতীয় শাস্ত্র-গ্রন্থ, বাইবেল, বাউডেনের 'বুদ্ধচর্য', 'এপিকটেটাস', রেনাঁর 'চয়নিকা' এমার্সন, থয়ো, জোয়ান্ অব আর্ক্, সেণ্ট লুইস, আলেকজাণ্ডার, পেরিক্লিস আর সালাদিনের জীবনী। একজন অল্পবয়সী চাকরানী রইলো নিবেদিতার সঙ্গে।

মন্দ কাটলো না নিবেদিতার জীবন বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে। মাঝে মাঝে সামান্য অসুবিধার মধ্যে পড়লেও স্বামীজীর শিক্ষা পেয়ে নিবেদিতা নিজেকে ধীরে ধীরে সর্ব অবস্থার মধ্যে সহনশীলা হবার শক্তি অর্জন করতে লাগলেন। নিজের বাসাবাড়ীর বর্ণনা লিখে জানালেন লণ্ডনের বন্ধুদের কাছে, 'আমার বাসাটি আমার চোখে চমৎকার। সেকেলে ধাঁচের হিন্দুবাড়ী যেমন হয়, এ-বাড়ীটি তারই একটা বেয়াড়া নমুনা। বাড়ীর মধ্যে মস্ত উঠোন। দিনে ঠাণ্ডা, রাতে দিব্যি হাওয়া খেলে। দোতলায় বেশী ঘর নেই। ছাদ নেমে এসেছে পাঁচ থেকে—বড় মজার দেখতে। আর অমন-একখানা আঙিনা! এ-বাড়ী পছন্দ না করবে কে? সন্ধ্যায় সকালে জোছনারাতে মনে হয় পৃথিবীর মধ্যে আমি একেবারে একা। গলিটা পরিষ্কার আছে, আর আপন-খুসীতে এঁকে-বেঁকে গেছে, এখানে-ওখানে কেবল মোড় ভেঙেছে, বাঁক নিয়েছে। ছোট্ট এক চৌমাথার মোড়ে একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে, সেখান দিয়ে চলা শক্ত। আশে-পাশে বাড়ীগুলো ঠেসাঠেসি হয়ে মাথা তুলেছে।

নীচু খড়ের চালা ঢালু হয়ে এসেছে রাস্তার ওপরে। সকালের আলোয় ছোট-ছোট বাচ্চারা খুসীর হাসি হাসছে। রোদে মেলে-দেওয়া সন্ত-ধোয়া কাপড় উড়ছে পত পত করে। দু' একটা গরু চরে বেড়াচ্ছে। গরমের দিনে গলিটা যেন গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়, দেয়ালগুলো তেতে আগুন হয়ে ওঠে। চুন-বালি থেকে যে-ভাপ উঠছে, অস্ত-সূর্যের রক্তরশ্মিতে তা শুষে যাচ্ছে। টিকটিকিরা বাসা বাঁধছে মহা আনন্দে।'

অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে আদর্শ ব্রহ্মচারিণীর মত জীবন কাটাতে লাগলেন নিবেদিতা বাগবাজারের বাসাবাড়ীতে। প্রথম প্রথম অনেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতো। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গেও কিছু কিছু পরিচয় হলো নিবেদিতার। তারা তাঁকে শ্রীমার অন্য এক মেয়ে বলে ভাবতে লাগলো। আর নিবেদিতাও মায়ের নির্দেশ এবং স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশমত অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দু মেয়ের মত আদর্শ জীবন যাপনে ব্রতী হলেন। তাঁর বাড়ীতে একজন ব্রহ্মচারীর থাকার ব্যবস্থা হলো। স্বামীজীই ঠিক করে দিলেন। তার নাম সদানন্দ। সে স্বামীজীরই শিষ্য। বাড়ীর বাইরের দিককার ঘরে থাকতো। দিনের কাজ করতো এবং অবসর সময়ে সে নিবেদিতার কাছে বসে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প বলতো। এমন কি হিন্দুদের অনেকরকম আচার-বিচারের কাহিনীও শোনাতো নিবেদিতাকে। বুদ্ধিমতী কন্যা নিবেদিতাও অনেক-প্রকার প্রশ্ন করে জেনে নিতো সেগুলি সদানন্দের কাছ থেকে।

মাঝে মাঝে নিবেদিতা গাড়ীভাড়া করে চিৎপুর অঞ্চলে বেড়িয়ে আসতেন। কলকাতা সহর প্রসঙ্গে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হতে লাগলো তাঁর। সেইসঙ্গে তিনি সুযোগ পেলেন ভারতীয় জনজীবনের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ।

একদিন একটি মেয়ে এসে আর্তস্বরে জানালে নিবেদিতাকে, শিগ্‌গির এসো গো, আমাদের ছোট মেয়েটি মারা যাচ্ছে।

ভারতে এসে মৃত্যুর খবর এই প্রথম শুনলেন নিবেদিতা। ছোট্ট মেয়েটির কথা শুনে তিনি তাড়াতাড়ি গেলেন তার ভাঙা কুটিরে। দেখলেন শিশুটি মৃতপ্রায়। তিনি তাড়াতাড়ি শিশুটিকে নিজের কোলের ওপর তুলে নিলেন। কিন্তু সে বেশীক্ষণ বাঁচলো না। মারা গেল কিছুক্ষণ পরে। তখন তার মা ডুকরে কেঁদে উঠলো।

অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করার পর সে নিজের মাকে জিজ্ঞেস করলে মিনতিভরে, বাছা আমার এখন কোথায় আছে বলো না গো।

তাই শুনে নিবেদিতা তাকে নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, শান্ত হও, তোমার মেয়ে এখন মায়ের কোলে। যিনি আমাদের সবার মা, সেই মা-কালীর বুকে সে। স্থির হও, নইলে তার আরামের ঘুম যাবে ভেঙে। তোমার মেয়ে মায়ের কোলে ঘুমুচ্ছে। তাকে দোল দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও।

এই কথা বলার পর তার অশ্রুসিক্ত বদনের ওপর সস্নেহ হাতের স্পর্শ বুলিয়ে দিতে লাগলেন নিবেদিতা।

এরপর তিনি ধীরে ধীরে গুরুদেব এবং তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নাম করতে লাগলেন।

ঘণ্টা দুই ওভাবে কাটলো। পরে শান্ত হলো অভাগী মাতা। ত্যাগ করলে নিজের পুত্রকে।

পরদিন নিবেদিতা বেলুড়ে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে চললেন। তাঁর কাছে নিবেদন করলেন এই দুঃখী পরিবারের কথা।

স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর বললেন নিবেদিতা, আমরা যে আশ্বাস চাই, এই দীন-দরিদ্রেরাও সেই আশ্বাসটুকুর কাঙাল। কেবল এটুকু তারা জানতে চায় তাদের সন্তান সোয়াস্তিতে আছে কিনা, মায়ের স্নেহদৃষ্টির তলেই আছে কিনা। দুঃখ যে ক্ষণিক

আর আনন্দই যে নিত্য সম্পদ এটুকু তারা বুঝতে চায়। সবাই একসঙ্গে একই দুঃখ ভোগ করছি, তাই একই আশ্বাসে একই নির্ভরতায় আমরা সোয়াস্তি পাই। তবে তো আমাদের মাঝে কোনও তফাত নেই। আদর্শ বা আকাঙ্খারও কোনও প্রভেদ নেই। ভোরের দিকে যখন বেরিয়ে আসি মেয়েটি আমায় কিছু খাবার দিলে।

স্বামীজী মন দিয়ে শুনলেন নিবেদিতার কথা। বললেন, এই জন্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন জগতে। তিনিই জোরগলায় বলে গেছেন, সকলের সঙ্গে অন্তরের ভাষায় কথা কইতে হবে।··· মার্গট, মরণকে ভালবাসতে শেখো। ভয়ঙ্করকে করো অর্চনা। দেবতা যেন বৃত্তের মত। সব আধারেই তাঁর কেন্দ্র, কিন্তু পরিধি নেই কোথাও। মৃত্যু আর কিছুই নয়। কেন্দ্র হতে কেন্দ্রান্তরে স্থিতিমাত্র। জীবনে মরণ আর মরণে জীবনকে দেখতে শেখো। রুদ্রের অর্চনা করো মার্গট।

বেলুড় থেকে নৌকাযোগে গঙ্গা পার হয়ে বাগবাজারে ফিরে এলেন নিবেদিতা। মনের মধ্যে জপ করতে লাগলেন গুরুদেবের দেওয়া অভয় মন্ত্র—'রুদ্রের অর্চনা'।

ইদানীং বেশ শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলেন নিবেদিতা। মনটা হয়ে উঠলো সবল। তিনি জগতের কোন দুর্ঘটনায় কাতর হলেন না।

এর কয়েকদিন পরে স্বামী যোগানন্দ দেহত্যাগ করলেন। নিবেদিতা তাঁর মৃত্যুশয্যাপাশে দাঁড়িয়ে থেকে মায়ের এই প্রিয় সন্তানের শেষ পরিণতি চাক্ষুষ দেখলেন। তাঁর হৃদয়-মন কাতর হয়ে উঠলো। মৃত্যুর বিভীষিকাকে জয় করতে পারলেন না। নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করলেন। শবদেহ নিয়ে যখন রামকৃষ্ণ-মিশনের সন্ন্যাসীরা শ্মশানে যায় নিবেদিতাও তাদের সঙ্গে গেলেন। স্বামী যোগানন্দের পুণ্য দেহ চিতার ওপরে রেখে

অগ্নিসংযোগ করা হলো। সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে তাঁর দু'চোখ জলে ভরে উঠলো।

তারপর চিতা নিভলে সন্ন্যাসীরা যখন ফিরে এলেন মায়ের কাছে নিবেদিতাও ফিরলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের কথা স্মরণ করতে লাগলেন। তিনি তখন বেলুড়ে। হাঁপানী রোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন। তিনি যদি কাছে থাকতেন তাহলে নিবেদিতার মন দুঃখ ও শোকে এতখানি ভেঙে পড়তো না। তাছাড়া তাঁকে নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনাও অনুভব করতে হতো না। মঠের সন্ন্যাসীরা কেমন একসঙ্গে আছে। ওরা স্বতন্ত্রভাবে সাধনভজন করলেও আছে একসঙ্গে। কিন্তু নিবেদিতা রয়েছেন একাকিনী। তিনি সর্বদা নিজের মধ্যে অনুভব করতেন নৈরাশ্য-ভাব। সেটা মাঝে মাঝে ঝেড়ে ফেলতে চাইতেন। কাতর হয়ে বলে উঠতেন, নাঃ, সবরকমেই হেরে যাচ্ছি, আদর্শচ্যুত হচ্ছি।……মুক্তি দিয়ে কি হবে ?

পরক্ষণে আবার ভাবতেন নিবেদিতা,……কিন্তু আমি কে যে আমার ইচ্ছামত সব ঘটবে ?……যদি একটা ঘটনাতেও স্বামীজীর কাছে আমার আনুগত্যের প্রমাণ দিতে পারি তাহলেই আর কিছু চাইবো না।……আমি তাঁর ছায়ায় চলতে চাই, দূরে থাকতে চাই না……

নিবেদিতা এখন নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে লাগলেন। তিনি শোকসন্তপ্ত হৃদয় নিয়ে ছুটে এলেন মায়ের কাছে। মার চোখেও জল। তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করলেন নিবেদিতার দুঃখ। তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। নিজের স্বামী ও গুরু রামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, আমিও তাঁকে প্রাণভরে ভালবেসেছিলুম। একবার তিনি দু' মাসের জন্যে এসেছিলেন গ্রামে। তখন তিনি অসুস্থ। আমার বয়েস তখন চৌদ্দ। প্রাণ ঢেলে তাঁর সেবা করতুম। অভাবের

মধ্যেও তাঁর স্বভাবের আলো ঠিকরে পড়তো। আমার সঙ্গে তিনি অতিশয় মিষ্টি ব্যবহার করতেন। বিকেলবেলায় আমতলায় বসে আমাকে পড়াতেন। এছাড়া সংসারের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় আমাকে শিখিয়েছিলেন। তাঁর মুখ চেয়েই তো আমি এতকাল বেঁচেছিলুম। কিন্তু যখন সময় হলো তিনি আপনি বললেন, 'এখন নিজের পায়ে ভর দিয়ে তোমাকে দাঁড়াতে হবে'…

মায়ের কাছে মহাগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে খানিকটা সান্ত্বনা পেলেন নিবেদিতা। মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে তিনি একবার তাঁর স্নেহময় কোলের ওপর মাথা রাখলেন। মা তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, গুরুকে ভালবাসো। তোমার ভালবাসা অফুরন্ত হোক। সাধুপুরুষকে ভালবাসলে আত্মার নবজন্ম হয়। এরই নাম ভক্ত-ভগবানে ভালবাসা। শুদ্ধ ভালবাসাই আত্মার আলো……

নিবেদিতা যেন কি বলতে যাচ্ছিলেন। শ্রীমা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, চুপ, যা বলি মুখ বুজে শোন…আমার গুরুকে আমি যেমন ভালবেসেছিলুম তুমিও তোমার গুরুকে তেমনিভাবে ভালবাসো……

মায়ের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে সুস্থির হয়ে ফিরে এলেন নিবেদিতা।

১৪

কলকাতায় সেবাপরায়ণা নিবেদিতা

বেলুড়ে নতুন মঠ তৈরী হলো। মঠের নতুন বাড়ীতে দুর্গাপূজো করবেন বলে স্বামীজী কাশ্মীর হতে ফিরলেন কলকাতায়। এখানে এসে তিনি ব্রহ্মচারীদের নিয়ে নানারকম শিক্ষা দিতে লাগলেন। যারা দুর্বলচিত্ত তাদেরকে তিনি নিজের কাছে সর্বদা রেখে কঠোর হতে শিক্ষা দিতেন। অনেকে আবার ধ্যানধারণা করতে ভালবাসতেন। স্বামীজী কিন্তু কর্মশূন্য ধ্যান পছন্দ করতেন না। তিমি সেইসব ব্রহ্মচারীদের আহ্বান জানিয়ে বলতে লাগলেন, যাও, এখনই বেরিয়ে পড়ো। কোনও কাজই ছোট নয়। বলছো যে তোমরা কিছুই জানো না, সুতরাং প্রচার করবে কি! বেশ তো, ঐ কথাই লোককে বল গিয়ে! এও তো একটা বলবার মত কথা। নিজের অভিজ্ঞতাকে অসঙ্কোচে জীবন্ত করে তোল সকলের সামনে।

বেলুড়ে বাড়ীঘর তৈরী শেষ হলে দানপত্র করা হলো। স্বামীজী সন্ন্যাসীদের প্রাত্যহিক কর্মধারার ছক তৈরী করলেন। সেইমত সন্ন্যাসীরা দৈনিক জীবন অতিবাহিত করতে লাগলো। এছাড়া অনেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পরিব্রাজক ব্রত গ্রহণ করে বেড়িয়ে পড়লো। ১৮৯৯ এর মার্চে স্বামী সারদানন্দ আর স্বামী তুরীয়ানন্দ গেলেন গুজরাটে। কালীকৃষ্ণ আর স্বামী প্রেমানন্দ গেলেন ঢাকায়। মঠের ব্রহ্মচারীরা স্বামীজীর কড়ানজরে থাকতো। কেবল তাদের অধ্যাত্মশিক্ষা দিতে লাগলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। এছাড়া নিবেদিতা সপ্তাহে দু'দিন পাঠ দিতেন সন্ন্যাসীদের। তিনি

তাদের শারীরবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা আর শিক্ষাবিজ্ঞানের পাঠ দিতে লাগলেন। এমন কি তাদেরকে সেলাইয়ের কাজেও সাহায্য করতে লাগলেন নিবেদিতা। অহংজ্ঞানরহিত হয়ে এবং কর্তৃত্বাভিমান ভুলে কাজ করার জন্যে সর্বদা আদেশ-উপদেশ দিতেন স্বামীজী নিবেদিতাকে। তিনি বলতেন, নিরাসক্ত, অনায়াস ও নির্দ্বন্দ্ব হয়ে যেন সে সেবা করে যায় সকলকে।

স্বামীজী এই সময় কঠিন হাঁপানী রোগে ভুগছিলেন। তাই মন সবল থাকলেও শরীরে আদৌ বল পাচ্ছিলেন না। বেলুড়ে নিজের ঘরে খাটের ওপর শুয়ে শুয়ে নির্দেশ দিতেন নিবেদিতাকে কাজ করার জন্যে। নিবেদিতা তাঁর নির্দেশমত মঠের অনেকরকম কাজ করতেন। সেই সঙ্গে দেশ-বিদেশের ভক্তদের লেখা চিঠি পড়িয়ে শোনাতেন স্বামীজীকে। মাঝে মাঝে অনেক চিঠির উত্তর লিখে দিতে হতো নিবেদিতাকে।

মিস্ ম্যাকলাউড্ ও মিসেস বুল ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে ভারত ত্যাগ করে যান। তাঁরা চিঠি লিখতেন স্বামীজীকে। নিবেদিতা তার জবাব লিখে দিতেন স্বামীজীর হয়ে।

স্বামীজীর কথামত নিবেদিতা মুখ বুজে সমস্ত কাজ করতেন। সময় নেই বলে বৃথা অজুহাত দেখাতেন না।

একদিন তিনি নিবেদিতাকে স্পষ্ট বললেন, সাধনার জন্যে যথেষ্ট সময় পাচ্ছি না, এ নালিশ মনে আনবে না। তোমার কাজই তোমার সাধনা। তোমার সিদ্ধি। সেই পথেই তোমায় চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ব্যবহারিক বুদ্ধির সঙ্গে আদর্শ নাগরিকের যা-কিছু গুণ, অনাড়ম্বর দীন জীবন যাপনের স্পৃহা, শুচিতা আর পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জন, এই তোমার মাঝে ফুটে উঠুক। নিজেকে এমনি করে গড়ে তুলতে পারলেই তোমার অন্তরের ধর্ম ফুল হয়ে ফুটবে। কায়মনোবাক্যে বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত হও। এভাবে তোমার অসীম

শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করো। যতক্ষণ এ না পারছো শক্তিলাভের জন্যে নিজেকে দর্শন করো। কঠোর তপস্যায় মার্জিত করো নিজেকে। কিন্তু দেরি করলে চলবে না। আমাকে অনুসরণ করো। আমার সঙ্গে তাল রেখে চলো। শ্রীরামকৃষ্ণ বা বেদান্ত কি আর-কিছু প্রচার করা আমার দায় নয়, আমার দায় কেবল এদেশের লোককে মানুষ করে তোলা।

স্বামীজীর কথা শুনে নিবেদিতা বললেন, আমি আপনাকে সাহায্য করবো স্বামীজী।

স্বামীজী বললেন, আমি তা জানি।

স্বামীজীর কথা শুনে নিবেদিতার মনে হাসি ফুটে উঠলো। এতদিন পরে গুরুর কাছ থেকে তাঁর মনের আশা সার্থক হবার সুযোগ জানতে পেরে আনন্দিত হলেন। ভারতে নারীজাতির শিক্ষার জন্যেই তো স্বামীজী নিবেদিতার মত একজন শক্ত-সামর্থ্য নারীর সাহায্য চেয়েছিলেন। এ যে বিধির বিধান। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ এদেশের মানুষদের দুঃখদুর্দশা ঘোচাবার জন্যে তাঁর প্রিয় শিষ্যকে বারংবার বলে গেছেন। সে যেন নিজের মুক্তির কথা চিন্তা না করে। পরের মুক্তির কথা যে ভাববে তার মুক্তি আসবে আপনি। জনসেবাই ভগবৎসেবা। সেবার মাধ্যমে আসে আত্মশোধনের সুযোগ। আত্মার পবিত্রতা লাভ হয় সেবায়। জনসেবার মত পবিত্র ধর্ম আর নেই। বিশেষ করে মূর্খ ও দরিদ্র ভারতবাসীদের সুশিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তোলার ভার নিতে হবে সুশিক্ষিত ভারতবাসীদের। প্রথমে আনতে হবে হৃদয়ে প্রেম। সেই প্রেমে আসবে হৃদয়ের সরলতা। আর সরলতা এলেই আসবে পবিত্রতা। তখন শিক্ষার আলো গ্রহণ করতে সহায়ক হবে। বিধির বিধানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ এসেছিলেন বাংলার পুণ্যভূমিতে দেশের বুক হতে অন্ধকার ঘোচাতে। তারপর এলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি কবির

হৃদয় ও উপলব্ধি দিয়ে বুঝলেন বঙ্গ-জননীর দুঃখ। তাই তাঁর কাব্যের ভাষায় লিখলেন খেদ করে।

'সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী
রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করো নি।'

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি এবং বিখ্যাত দেশসেবী হলেন শ্রীঅরবিন্দ। তিনিও বিধাতার প্রেরিত পুরুষ। বাংলা তথা ভারতের উন্নতির জন্যে তিনি এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এও বিধির বিধান। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার পরিপূরক। তার দেশগঠনের বিরাট কর্মপরিধির মাঝে শ্রীঅরবিন্দ হলেন এক বিরাট মহীরুহ। শ্রীঅরবিন্দ একাধিকবার দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দকে। তাঁর জীবনে 'শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দে'র প্রভাব অত্যধিক ছিল। পরে তা প্রকাশ পেয়েছে শ্রীঅরবিন্দ-সম্পাদিত 'ধর্ম' ও 'কর্মযোগিন' পত্রিকায়। তিনি যখন ব্রিটিশ শাসকদের জেলে বন্দী ছিলেন সেইসময় স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে বেশ কয়েকদিন ধরে বেদান্ত শুনিয়ে যান।

শ্রীনগেন্দ্র গুহ রায় লিখেছেন 'মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ' নামক একটি জীবনী গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থে নগেন্দ্রকুমার শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে মতিলাল রায়ের লেখাও উদ্ধৃতি করেছেন।

প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা চন্দননগরের অন্যতম বিপ্লবী বীর এবং মহাতপস্বী মতিলাল রায় লিখেছেন,—"গ্রে স্ট্রীট হইতে পুলিস কর্তৃক ধৃত হইয়া, একখানা ঠিকা গাড়ী করিয়া তাঁহাকে যখন লালবাজার পুলিস কোর্টে আনা হইতেছিল, তাঁহার সম্মুখে ঠাকুর রামকৃষ্ণ সারাক্ষণ বসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা ভরসা দিয়াছিলেন—তাঁহার মুখেও সকল কথা শুনিয়াছি। আদালত গৃহে বিচারক, উকিল, ব্যারিস্টার, সকলকেই নারায়ণ দর্শন করিয়া তিনি নিজের ভিতর এমন আনন্দ ও উল্লাস অনুভব করিতেন যে তাঁহার বন্ধন-দশা যে দীর্ঘ দিন স্থায়ী হইতে পারে, তাহা তিনি মনের কোণেও

স্থান দিতে পারিতেন না। সে যে কত কথা, আজ তাহা স্মরণ করিয়া বলিতে হইলে মহাভারত রচনা করিতে হয়।' (মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ—নগেন্দ্র কুমার গুহরায় পৃ: ৫৮)

শ্রীঅরবিন্দ বাংলাদেশ থেকে সুদূর পণ্ডিচেরীতে যাবার পথে চন্দননগরে এই মতিলাল রায়ের বাড়ীতেই আশ্রয় নেন এবং সেখানে অজ্ঞাতবাসকালে মতিলালের সঙ্গে গোপনে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে বেশ কিছুদিন আলাপ-আলোচনা করেন। পরে তিনি ওখান থেকে চলে যান পণ্ডিচেরীতে।

ভারতের মুক্তি আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন বলে ইংরাজ শাসক বন্দী করে অরবিন্দকে। তিনি জেলে বেশ কিছুদিন কাটান। সেখানে নির্জন কক্ষে তিনি উপলব্ধি করলেন তাঁর প্রতি ঈশ্বরের আদেশ ও সেইমত দুর্বার কর্মপ্রেরণা। এই প্রসঙ্গে পরে জেল হতে মুক্তিলাভ করে উত্তরপাড়ার বিখ্যাত ভাষণে শ্রীঅরবিন্দ প্রচার করলেন নিজের আত্মিক উপলব্ধির কথা এবং ঈশ্বরের করুণাভরা আদেশ: 'ভগবান আদৌ আছেন কিনা সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলুম না। আমি তাঁর বিদ্যমানতা অনুভব করতুম না। তথাপি কে যেন আমাকে বেদের সত্যের দিকে, গীতার সত্যের দিকে, হিন্দুধর্মের সত্যের দিকে আকর্ষণ করতো। আমি অনুভব করতুম যে এই যোগের মধ্যে, বেদান্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই ধর্মের মধ্যে মহাশক্তিশালী সত্য নিশ্চয়ই আছে। তাই যখন আমি যোগের দিকে ফিরলুম, সঙ্কল্প করলুম যে, যোগসাধনা করবো, দেখবো আমার ধারণা সত্য কিনা, তখন আমি এই ভাব নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলুম, ভগবানকে এই প্রার্থনা জানিয়েছিলুম, "যদি তুমি থাক, তুমি আমার কর্মের কথা জানো। তুমি জানো, আমি মুক্তি চাই না। অপরে যা চায় এমন কোন জিনিসই আমি চাই না। আমি শুধু চাই, এই যে ভারতের লোকসকলকে আমি ভালবাসি, যেন এদের জন্যে জীবনধারণ

করতে পারি, কাজ করতে পারি, যেন এদের জন্যে আমার জীবন উৎসর্গ করতে পারি।" যোগের সিদ্ধির জন্যে আমি অনেকদিন ধরে চেষ্টা করেছিলুম এবং শেষ পর্যন্ত আমি তা কতকটা লাভও করেছিলুম। কিন্তু আমি যেটি সবচেয়ে বেশী চাইতুম মনে হতো তা যেন পাই নি। তারপর জেলের নিঃসঙ্গতার মধ্যে নির্জন সেলের মধ্যে আবার আমি সেইটি চাইলুম। আমি বললুম, "দাও আমাকে তোমার আদেশ। আমি জানিনা কি কাজ আমাকে করতে হবে, কেমন করে করতে হবে। আমাকে একটা বাণী দাও।" যোগসাধনার ভেতর দিয়ে দুটি বাণী এলো। প্রথম বাণীটি হলো, "আমি তোমাকে একটা কাজ দিয়েছি এবং সেটি হচ্ছে এই জাতিটাকে তুলতে সাহায্য করা। শীঘ্রই এমন সময় আসবে যখন তোমাকে জেলের বাইরে যেতে হবে, কারণ আমার এই ইচ্ছে নয় যে, এবার তুমি দোষী সাব্যস্ত হও, অথবা অন্যান্যকে যেরূপ তাদের দেশের জন্যে কষ্টভোগ করে সময় অতিবাহিত করতে হবে তুমিও সেরূপ করো। আমি তোমাকে কাজের জন্যে ডেকেছি, আর তুমি যে আদেশ চেয়েছ তা এই-ই। আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি—যাও, আমার কাজ কর।"

দ্বিতীয় বাণীটি হলো এইরূপ—

"এক বছর নির্জনবাসে তোমাকে কিছু দেখান হয়েছে, এমন কিছু দেখান হয়েছে, এমন কিছু যা সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ ছিল এবং তা হচ্ছে হিন্দুধর্মের সত্যতা। এই ধর্মটিকেই আমি জগতের সামনে তুলে ধরছি, ঋষি, সন্ত, অবতারদের ভেতর দিয়ে এই ধর্মটিকেই আমি সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তুলেছি, আর এখন ইহা যাচ্ছে জগতের জাতি সকলের মধ্যে আমার কাজ সম্পন্ন করতে। আমার বাণী প্রচার করবার জন্যেই আমি এই জাতিটাকে তুলছি। এইটিই সনাতনধর্ম, তুমি এই ধর্মকে আগে বাস্তবিক পক্ষে জানতে না, কিন্তু এখন আমি এটি তোমার কাছে প্রকাশ করেছি।

তোমার মধ্যে যে অবিশ্বাসী ছিল, নাস্তিক ছিল তার উত্তর দেওয়া হয়েছে, কারণ আমি তোমাকে প্রমাণ দিয়েছি, অন্তরে ও বাহিরে স্থূলে ও সূক্ষ্মে প্রমাণ দিয়েছি এবং সে প্রমাণে তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ। যখন তুমি বাইরে যাবে, তোমার জাতিকে সর্বদা এই বাণী শোনাবে যে সনাতন ধর্মের জন্যেই তারা উঠছে, নিজেদের জন্যে নয়, পরন্তু সমস্ত জগতের সেবার জন্যে। অতএব যখন বলা হয় যে ভারত উঠবে, তার অর্থ হলো এই যে, সনাতন ধর্ম উঠবে। যখন বলা হয় যে ভারত মহান হবে, তার অর্থ এই যে, সনাতন ধর্মই মহান হবে। যখন বলা হয় যে ভারত মহান হবে, তার অর্থ এই যে, সনাতন ধর্ম নিজেকে বর্ধিত ও প্রসারিত করবে। এই ধর্মের জন্যে এবং এই ধর্মের দ্বারাই ভারত বেঁচে আছে। ধর্মটিকে বড় করে তোলার অর্থ দেশকেই বড় করে তোলা।

আমি তোমাকে দেখিয়েছি যে আমি সর্বত্র সকল মানুষ, সকল বস্তুতে বিরাজ করছি। দেখিয়েছি যে, এই আন্দোলনের মধ্যেও আমি রয়েছি, আর যারা দেশের জন্যে কাজ করছে কেবল তাদের মধ্যেই যে আমি কাজ করছি তা নয়, যারা তাদের বাধা দিচ্ছে, তাদের পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাদের মধ্যেও আমি কাজ করছি। সকলের মধ্যেই আমি কাজ করছি, আর লোক যাই ভাবুক, যাই করুক না কেন, তারা আমার উদ্দেশ্যকে সাহায্য করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। তারাও আমারই কাজ করছে, তারা আমার শত্রু নয়, তারা আমার যন্ত্র। তোমার সকল কাজের ভেতর দিয়েই তুমি অগ্রসর হচ্ছ, কোনদিকে তা না জেনেই। তুমি এক কাজ করতে চাও কিন্তু করে ফেল অন্য একটা। তুমি যে ফলকে লক্ষ্য করে চেষ্টা করো তার ফল হয় ভিন্ন বা বিপরীত। শক্তি আবির্ভূতা হয়েছে এবং জাতির মধ্যে প্রবেশ করেছে। বহুদিন পূর্ব থেকেই আমি এই অভ্যুত্থানের আয়োজন করছিলুম।

সময় এসেছে, এখন আমিই একে সিদ্ধির দিকে পরিচালিত করবো।"

(Uttarpara speech'-এর সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ)

বাংলা মায়ের স্নেহের দুলাল এবং শক্তি মন্ত্রের পূজারী নেতাজী সুভাষও বুঝেছিলেন রাজনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির মিলন না হলে দেশের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয়। এ যে ভারতের চিরন্তন ঐতিহ্য। আমাদের দেশের এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের পরিচয় পাই আমাদের দুই মহাকাব্যে—রামায়ণ ও মহাভারতে। সুভাষচন্দ্র ভারতীয় ঐতিহ্যের কর্ণধার শ্রীঅরবিন্দের জীবনদর্শন এবং রাজনৈতিক ভাষা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাই তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভারত পথিক-'এ লিখেছেন : '......কলেজে পড়বার সময়ে অরবিন্দর লেখা এবং চিঠিপত্র পড়ে তাঁর প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। সে সময়ে অরবিন্দ 'আর্য' নামে একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকার মধ্যে দিয়েই তিনি তাঁর আদর্শ প্রচার করতেন। বাংলাদেশের বিশিষ্ট কয়েকজন লোকের কাছে তিনি চিঠিপত্রও লিখতেন। এইসব চিঠি ঘুরতো লোকের হাতে হাতে। রাজনীতির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে যাঁরা বিশ্বাস করতেন তাঁদের কাছে চিঠিগুলির বিশেষ মূল্য ছিল। আমাদের হাতেও মাঝে মাঝে এই চিঠি আসতো। সকলকে সেইসব চিঠি পড়ে শোনানো হতো। একটি চিঠিতে অরবিন্দ লিখেছিলেন, "আমাদের প্রত্যেককে আধ্যাত্মিক বিদ্যুৎশক্তির এক একটি ডাইনামো হতে হবে, যাতে আমরা যখন উঠে দাঁড়াব তখন চারপাশে হাজার হাজার লোকের মধ্যে আলো ছড়িয়ে পড়ে—তারা স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করে।" চিঠি পড়ে আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম দেশের সেবা করতে হলে আধ্যাত্মিক শক্তির একান্ত প্রয়োজন।'......

(ভারত পথিক—সুভাষচন্দ্র বসু—পৃঃ ৭৭-৭৮)

দেশ ও জাতির সামগ্রিক কল্যাণকর্মের অন্তরালে থাকে ঈশ্বরের অভীপ্সা ও শক্তি। যুগে যুগে মানুষ অত্যাচার ও অনাচারে যখন দিগ্‌ভ্রান্ত হয়—হারায় সত্য ও ধর্মকে ঠিক সেই সংকটময় মুহূর্তে আবির্ভূত হন ঈশ্বরপ্রেরিত দূত। তাঁরা পৃথিবীর মাটিতে মহামানব নামে পরিচিত। উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা দেখতে পাই যে ভারত-মানসের অগ্রদূত বাংলামানসের ওপর যেন ঈশ্বরের আশীষধারা নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারই ফলশ্রুতি আমরা পেয়েছি রাজা রামমোহন রায় হতে আরম্ভ করে নেতাজী সুভাষ পর্যন্ত। এঁরা দেশকে ধর্ম ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যে নব আন্দোলন আরম্ভ এবং পরিচালনা করেন তাই এই জাতিকে দিয়েছে আশা, গৌরব এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীঅরবিন্দ এমনি সব মহামানব। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য বিবেকানন্দ যে সত্য উপলব্ধি করে গিয়েছেন সেই সত্য তিনি প্রতিষ্ঠিত করে যান তাঁর অন্যতমা শ্রেষ্ঠ শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার অন্তরে ভারতের সেবার সুকৌশল পন্থার মধ্যে দিয়ে। স্বামীজীর শক্তি, তাঁর স্বপ্ন ও সাধনার মর্ম বোঝার ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে এলো নিবেদিতার অন্তরে। গুরুশক্তিতে তিনি একাজে সমর্থ হন।

একদিন স্বামীজী বললেন নিবেদিতাকে, আমার দেশবাসীকে আর সবার চাইতে তুমিই বোধহয় ভাল বুঝবে। আইরিশ আর বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের ধাঁচটা একই রকম। এদের কেবল কথা আর কথা,—বড়-বড় কথা বলে বাক্‌চাতুরী দেখাবে। এ-দু'জাতই বাক্‌পটুত্বে সবাইকে হার মানায়। কিন্তু আসল কাজের বেলায় কিছুই করতে পারে না। তাছাড়া এ ওর পিছনে ঘেউ-ঘেউ করে আর পরস্পরের মুণ্ডপাত করেই এরা সমস্তটা সময় নষ্ট করে। ইংরেজরা আমাদের ঠিকই সমালোচনা করে। আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ত্রুটি, দেশজোড়া অজ্ঞতা নোংরামি আর স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অভাব—এ অক্ষমতাগুলো অস্বীকার করবার নয়। কি

করে ইংরেজরা এত সহজে ভারত জয় করলে? কারণ, তারা একটা ন্যাশন, কিন্তু আমরা এখনও তা হইনি। একজন মহামানব দেহত্যাগ করলে শতাব্দীর পর শতাব্দী আমরা প্রতীক্ষায় থাকি, কখন আরেকজন আবির্ভূত হবেন। কিন্তু যে চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে তার স্থান পূরণ করবার শক্তি আছে ইংরেজদের। আমাদের দেশে মানুষের মত মানুষ নেই। কেন? তার কারণ, যে-সম্প্রদায় থেকে মানুষের মত মানুষ সৃষ্টি হবে পশ্চিমের চেয়ে এদেশে তার গণ্ডী অনেক ছোট। এই ত্রিশ কোটি অধিবাসীর মধ্যে যে-কটি আদর্শ-পুরুষ আছেন, তিনচার ছ'কোটি লোকসংখ্যা যাদের সেসব জাতের মধ্যে তার চাইতে ঢের বেশী মানুষ দেখা যায়। কেননা তাদের মধ্যে শিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত অনেক বেশী।...... জনসাধারণের আদর্শের মান উন্নয়নের জন্যে তাদের শিক্ষার ভার নিতে হবে আমাদের। শুধু এই করেই একটা জাতি গড়ে তোলা যায়। আমাদের কাজ হচ্ছে প্রাথমিক উপকরণগুলো সংগ্রহ করা। তারপর বিধাতার নিয়মে আপনিই তা সংহত হয়ে দানা বাঁধবে। লোকের মাথায় এইসব ধারণা আমাদের ঢুকিয়ে দিতে হবে। বাকীটা তারা নিজেরা করবে। গণশিক্ষার ব্যবস্থা করা সহজ নয়। দারিদ্র্য-পীড়িত রাজশক্তি সামান্যই করতে পারে, সেদিক থেকে আমাদের কোনও আশা নেই। আমাদের নিজেদের খাটতে হবে। সাহস চাই, সাহস! মুষ্টিমেয় শক্তিমান লোক দুনিয়া তোলপাড় করে ফেলতে পারে।

মেয়েদের মধ্যে তুমি যে কাজ করবে সেও একটা কাজের মত কাজ। তাদের উদ্বুদ্ধ করো। ইউরোপীয় নারী কাপুরুষকে ঘৃণা করে। তারাই ওদেশের পৌরুষকে জাগিয়ে রেখেছে। বাঙালী মেয়েরা কবে তাদের মত পুরুষের দুর্বলতাকে নির্মম বিদ্রূপে লাঞ্ছিত করবে?

এইসব কথা বলতে বলতে স্বামীজী সম্পূর্ণ ভুলে যেতেন নিজের

শরীরে ব্যাধির কথা। তারপর যখন থামতেন তখন আবার হাঁপানীর শ্বাসকষ্ট ভোগ করতেন।

দিন দিন তাঁর শরীর খারাপ হতে লাগলো। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে আমেরিকায় যাবার জন্যে মিস্ ম্যাকলাউড আমন্ত্রণ জানালেন। নিবেদিতাও বললেন স্বামীজীকে, আপনি ঘুরে আসুন আমেরিকা হতে।

রাজী হলেন স্বামীজী। সব ঠিকঠাক। এমনসময় ঘটে গেল এক অনর্থ। কলকাতায় দেখা দিল প্লেগের উৎপাত। বহু নাগরিক ওর কবলে পড়ে মৃত্যু বরণ করলে।

আর স্থির থাকতে পারলেন না স্বামীজী। কয়েকজন সন্ন্যাসীকে প্রস্তুত হতে বললেন রোগীর সেবার জন্যে। নিজেও প্রস্তুত হলেন। বাগবাজারের জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে লাগলেন। তারা তাঁকে বিশ্বাস করতো। তাই স্বামীজীর ডাকে সাড়া দিলে। স্বামীজী নিবেদিতা এবং দু'জন সন্ন্যাসীকে ভার দিলেন চাঁদা আদায় করতে। নিবেদিতাকে বললেন, পাড়াটা আমরা বাঁচাবই। সে-ভার তোমার ওপর রইলো। অনেক ঝাড়ুদার দরকার। সেজন্যে প্রয়োজন মানুষের। টাউন হলে বিশেষ সভার বন্দোবস্ত করছি। লোকের এই গা-ছেড়ে-দেওয়া ভাবটা বাড়িয়ে দিতে হবে। আমি সভাপতি হবো, তুমি বলবে। আমি চাই কলকাতার ছাত্রেরা একজোট হয়ে নিজের হাতে বাগবাজার অঞ্চল পরিষ্কার করুক। আমি বলি কি ওদের মরণের বাতিক ধরুক। সেটা কি তা জানো তো? কাল সারাদিন আমার ছেলেদের সঙ্গে এই নিয়ে কথা হয়েছে। তারা ঠিক হন্যে কুকুরের মত হয়ে আছে।......

রোগের প্রকোপ দেখে নগরীর মাঝে দেখা গেল আতঙ্ক। প্রতিদিন প্রায় শ-খানেক করে মানুষ প্রাণ হারাতে লাগলো। সদানন্দের নেতৃত্বে একদল স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে নিবেদিতা বাড়ীতে

বাড়ীতে গিয়ে রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে সরকারের স্বাস্থ্য-অধিকর্তা ছুটে এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তাকে দেখে নিবেদিতা বলে উঠলেন, বাগবাজারটা আমরা ঠিকই বাঁচাব। সাধারণের জন্যে সাধারণই এখানে খাটছে। একটা রাস্তা থেকে প্রথম দফাতেই দু'শ পঁয়ত্রিশ টাকা চাঁদা আদায় হয়েছে। আমার সহকারীরা সন্ন্যাসী। তাঁরা রাস্তার জঞ্জাল পরিষ্কার করছেন, মেথর খাটছেন। দিনে আঠারো ঘণ্টা তাঁরা খাটেন—কাজকে মনে করেন দেবসেবা।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল ক্লাসিক থিয়েটারে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক আহুত এক সভায় বক্তৃতা দিলেন নিবেদিতা। স্বামীজী ছিলেন সেই সভার সভাপতি। 'দেশ ও ছাত্রদের কর্তব্য' প্রসঙ্গে ভাষণ দিলেন নিবেদিতা।

নিবেদিতার ডাক শুনে ছাত্রেরা গড়ে তুললে দল। তারা পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে প্লেগের জীবাণু ধ্বংসের কাজে লেগে গেল। ঝাড়ু নিয়ে পথের ময়লা পরিষ্কার করে তাই এক জায়গায় স্তূপাকার করে আগুন ধরিয়ে দিতে লাগলো।

তাদের উৎসাহ দিয়ে বললেন নিবেদিতা, ঝাড়ুদারও যদি একটা আদর্শের প্রেরণায় কাজ করে তাহলেই বৃহত্তর আদর্শের জন্যে তার প্রস্তুতি হয়ে গেল। সে-আদর্শ কি ? সেটা ঠিক করে নেওয়া তোমাদের দায়। বাগবাজারকে রক্ষা করে আমরা নতুন প্রাণ দিয়ে ভারতের ইতিহাস রচনা করলুম। এ-ইতিহাস আগে কখনও লেখা হয় নি। এ আমাদের রামায়ণ।

আপ্রাণ চেষ্টা করে নিবেদিতা বাগবাজার অঞ্চলে সেবাকাজ চালালেন দীর্ঘ একমাস যাবৎ। অনেক মেয়েকেও নিয়োগ করলেন রাস্তা পরিষ্কারের কাজে। প্রথম প্রথম তারা লোকলজ্জার ভয়ে একাজে এগুলো না। পরে এলো।

কাজ হয়ে গেলে নিবেদিতা ফিরে এলেন গুরুর কাছে। তাঁকে

সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। সব শুনে গুরুদেব খুসী হয়ে তাঁকে জানালেন শুভাশীষ। তারপর বললেন, তোমার উচিত এমনি নিষ্কাম কর্মে আত্মনিয়োগ করা। তোমার ভালবাসা তোমার কর্মকেও যেন ছাপিয়ে যায়।

গুরুর আশীর্বাদ শিরোধার্য করে খানিকক্ষণ নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন নিবেদিতা। তারপর ধীর কণ্ঠে বললেন, স্বামীজী, আমি শেষের ব্রতদীক্ষা নিতে চাই।

স্বামীজী বললেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তোমার প্রতীক্ষায় আছেন। গুরুদেবের কথা বড় ভাল লাগলো নিবেদিতার। তিনি মনে মনে শ্রীরামকৃষ্ণকে স্মরণ করে তাঁর উদ্দেশ্যে অন্তরের প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

এরপর নিবেদিতা এইসব অভিজ্ঞতার কথা পত্র মারফত লিখে জানালেন তাঁর এক বন্ধুকে। হাতে-কলমে ভারতবাসীদের সেবা করতে পারার আনন্দ সেদিন প্রথম উপলব্ধি করলেন নিবেদিতা।

আত্মসমর্পণের দীক্ষায় নিবেদিতা

প্রথম পর্বে সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষার পর এক বছর কেটে গেল নিবেদিতার জীবনে। ইতিমধ্যে নিবেদিতা নিজেকে বেশ ভালভাবে প্রস্তুত করেছেন তাঁর গুরুনির্দেশিত ত্যাগ ও সংযমের ওপর প্রতিষ্ঠিত দৈনন্দিন কয়েকটি নিয়মের মধ্যে দিয়ে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীর মত প্রতিদিনের জীবনকে এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যে মানসিক আর শারীরিক স্বাস্থ্যের সুস্থতা এবং পূর্ণতা এসেছে বর্তমানে। এখন তাঁর মন চায় কেবল শিবজ্ঞানে জীবসেবা করতে। সর্বজীবের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে দিব্যানু-

ভূতি লাভ করার আনন্দ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। সন্ন্যাস জীবনের পক্ষে অপরিহার্য যে 'শৈক্ষ্য' ও 'বৈরাগ্য'—এই দু'টি বৃত্তির মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। তাই গুরু এখন তাঁকে পুরোপুরি সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত করে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একজন নিষ্ঠাবতী কর্মী করে নিতে মনস্থ করলেন।

এক শুভদিনে স্বামীজী নিবেদিতাকে শেষ দীক্ষা দিলেন। শিব ও বুদ্ধের পূজো করলেন ফুল আর নানারকম সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে। তারপর হোমের অনুষ্ঠান হলো। তাতে নিবেদিতা ঘি, ফুল, ফল, দুধ, বেলপাতা, যব ইত্যাদি আহুতি দেওয়ার পর নিজের সর্বস্ব আহুতি দিলেন। আহুতি দেবার সময় সন্ন্যাসীরা একসঙ্গে মন্ত্র পাঠ করলেন। নিবেদিতার জন্যে মন্ত্র পাঠ করলেন: 'যিনি সমস্ত কামনা-বাসনা ত্যাগ করেছেন, যিনি বীতকোষ; অদ্বেষ্টা, সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শী, দান, শৌচ, সত্য আর অহিংসাই যাঁর জীবনব্রত তিনিই ধন্য। তিনি ঈশ্বরে লগ্ন চিত্ত। তাঁর সমস্তই ভগবানে অর্পিত।

এবার গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন নিবেদিতা। গুরু তাঁর ললাটে ভস্মতিলক পরিয়ে দিলেন। সেইসঙ্গে অন্যান্য সন্ন্যাসীদের ললাটেও ভস্মতিলক পরালেন।

একজন সাধু গেয়ে উঠলেন, হে অগ্নি, হে পাবক, হে অমৃত, হে বনস্পতি, হে প্রাণ, নৈঃশব্দের সাক্ষী হে দ্যুলোক, হে গুরু, এই দেখ আমার পার্থিব যা-কিছু এই অগ্নিতে আহুতি দিলুম, আহুতি দিলুম আমার অহংকে। হে অগ্নি, আমায় গ্রাস করো, আমার কিছুই যেন আর অবশেষ না থাকে। হরি ওম্ তৎসৎ, হরি ওম্ তৎসৎ।

সেদিন দুপুরে মঠেই রইলেন নিবেদিতা। খাওয়ার পর স্বামীজী তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর কাছে গেলেন নিবেদিতা। পরণে সাদা পোশাক, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা।

স্বামীজীর কাছে যেতেই তিনি বুঝতে পারলেন নিবেদিতার মনের ভাব। গুরুর প্রতি পুরোপুরি নিষ্ঠা এবং ভালবাসা এসেছে। গুরুই ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর। গুরুই ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। গুরুতে একবার নিষ্ঠা এবং অনুরাগ জাগলেই সব হয়ে গেল। তার আর কিছু বাকী থাকে না। সে জীবনের ইষ্টকে লাভ করে ধন্য ও পবিত্র হয়। এমনি ভালবাসা এসেছে বর্তমানে নিবেদিতার অন্তরে। তিনি তাঁকে তার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন, মার্গট, মনে রেখো, আধ ডজন লোকও যদি এরকম ভালবাসতে শেখে তাহলেই একটা নতুন ধর্মের উদ্ভব হয়, তার আগে হয় না। আমার সবসময় মনে পড়ে সেই মেয়েটির কথা। ভোরবেলা মহাসমাধির দুয়ারপথে এসে দাঁড়িয়েছে। এমন সময় সে শুনতে পেলে একজনের কণ্ঠস্বর। ভাবলে সেই কণ্ঠস্বর বুঝি কোন মালীর।

খানিক পরে দেখলে, যীশু এসে তাকে স্পর্শ করলেন। তাঁকে দেখে মেয়েটি চীৎকার করে আর্তস্বরে বলে উঠলো, ঠাকুর। আমার ঠাকুর!

এ ছাড়া আর কিছুই সে আমাকে বলতে পারলে না। তিনি তখন চলে গেছেন।

একটু থেমে স্বামীজী বললেন, অমন গোটা ছয়েক শিষ্য আমাকে দাও। আমি জগৎ জয় করবো।

স্বামীজীর কথা শুনে নিবেদিতা অন্তরে শক্তি ও আনন্দ পেলেন। মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন, হে ঈশ্বর, স্বামীজীর স্বপ্ন যেন সার্থক হয়ে ওঠে।

এরপর নিবেদিতা ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ মিস ম্যাক্লাউডের কাছে পত্র লিখে জানালেন নিজের মনোভাবের কথা: 'মনে হয় দু'টি কারণে উনি আমায় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী করলেন। প্রথমত প্রাচীন প্রথাটা আবার চালু করতে চান। দ্বিতীয়ত তাঁর

দৃষ্টিতে এর তুলনায় বড় আর কিছু পাওয়ার জন্যে প্রস্তুত নই আমি। এটা সত্যি কথা। কখনো যদি এর পরের স্তরে যেতে হয় তার জন্যে সকলভাবে নিজেকে তৈরী করেই তাঁর কাছে আসবো।'……

এরপর শেষ দীক্ষার অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানটির বর্ণনা লিখে রাখলেন নিবেদিতা ঃ

'…কাল, প্রথম দীক্ষার ঠিক একবছর পরে আমি হলুম নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী।'

'আটটার সময় মঠে পোঁছে গেলুম মন্দিরে। সেখানে পূজোর ফুল না আসা পর্যন্ত মেঝেতে বসে রইলুম সকলে। রাজা আমায় শোনাতে লাগলেন বুদ্ধের কথা। খুব সময়োপযোগী এবং সুন্দর আলোচনা, না? জীবনের নিষ্ঠাপূত চিরন্তন আদর্শের কথা বললেন বার-বার ঃ মুক্তিই নয়, ত্যাগ—আত্মোপলব্ধিই নয়, আত্মবিসর্জন।'

'তারপর সব উপকরণ এসেগেলে আমায় শিখিয়ে দিলেন পূজো করতে। এতদিনে আমার চিরসাধের শিবপূজো করার শিক্ষা পেলুম তাঁর কাছে। দু'জনে মিলে পূজো করলুম। মা যেমন আদর করে ছেলেকে শেখায়, সারাক্ষণ তেমনি মিষ্টি সুরে মন্ত্রপাঠ করে আমায় সব শেখালেন। দশাবতার-স্তোত্র পাঠ করে অর্চনা শেষ হলো।'

'যখন ফুল দিয়ে বেদি সাজিয়ে দিয়েছি, রাজা বললেন, "এবার আমার বুদ্ধকে কিছু ফুল দাও। আমি ছাড়া এখানে আর কেউ তাঁকে পছন্দ করে না।" যারা তাঁর কাছে পথের দিশা খুঁজতে আসবে আজ যেন আমার মাঝে তাদের সবাইকে সম্বোধন করে আশীর্বাদ দিয়ে বললেন, "যাও, যিনি বুদ্ধত্বলাভের আগে পাঁচশো বার পরের জন্যে জীবন দান করেছেন তাঁকে অনুসরণ করে চলো!"

'পূজো শেষ হলে হোম করার জন্যে নেমে এলুম নীচে।'

১৬

বাগবাজারে নিবেদিতাকর্তৃক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

সারদামণি নিবেদিতাকে কাজ করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। নিবেদিতাও বোস পাড়া লেনের বাড়ীতে বসে তাঁর ভাবী কাজ নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁর কাজ হচ্ছে মেয়েদের জন্যে একটা স্কুল খোলা। সে স্কুলটি হবে সম্পূর্ণ ভারতীয় কায়দায়। মিশনারী স্কুলের মত হবে না। এই নিয়ে মিসেস বুলের সঙ্গে মতভেদ হলো নিবেদিতার। মিসেস বুল চেয়েছিলেন, নিবেদিতার স্কুলটি যদি লণ্ডনের কোন মিশনারীদের মত গড়ে তোলা হয় তাহলে তিনি অর্থসাহায্য দিতে প্রস্তুত।

তাঁর শর্তে রাজী হলেন না নিবেদিতা। বুলকে জানিয়ে দিলেন, আমি টাকা চাই না। মা আছেন। তাঁর কৃপা হলে টাকা আপনি আসবে।

মিস্ ম্যাকলাউড সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। তবে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য নেবার আগে নিবেদিতা তাঁর স্কুলের জন্যে প্রথমে অর্থসাহায্য নিলেন কাশ্মীরের মহারাজার কাছ থেকে। তিনি দিলেন আটশো টাকা। তাই দিয়ে জনা তিনেক মেয়ে নিয়ে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর কালীপূজোর দিন স্কুল খুললেন। অর্থাৎ নিবেদিতা স্বামীজীর কাছ থেকে শেষ দীক্ষা নেবার ঠিক চার মাসের মাথায় স্কুলের দ্বারোৎঘাটন করা হলো। নাম দিলেন বালিকা বিদ্যালয়। শ্রীমা সারদামণির উপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করা হলো। পরে ধীরে ধীরে ছাত্রীসংখ্যা বাড়তে লাগলো। প্রথম প্রথম স্কুলে ছাত্রীরা আসতে চাইতো না। পরে নিবেদিতা এবং

সদানন্দ গিয়ে অভিভাবকদের অনেক করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে আসতেন।

অনেক গোঁড়া অভিভাবক প্রথমে আপত্তি জানাতে লাগলেন। বললেন, স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে কি হবে? আমার মেয়ে বিয়ের পর শশুরবাড়ী যাবে। লেখাপড়া শিখে কি ধুয়ে ধুয়ে খাবে?

কিন্তু নিবেদিতা অনেক যুক্তিতর্ক দিয়ে তাদের মনের পরিবর্তন আনতে লাগলেন।

যাইহোক স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে নিবেদিতা বেশ মাথা ঘামাতে লাগলেন। তাঁর মনে অহরহ চিন্তা আশ্রয় করতো কিভাবে তিনি স্কুলটি ভালভাবে গড়ে তুলবেন। এ সম্বন্ধে স্বামীজীর কাছে একটা পরিকল্পনা নেবারও ইচ্ছে করলেন।

একদিন নিবেদিতা স্বামীজীর কাছে এসে তাঁর স্কুল সম্বন্ধে মত চাইলেন।

সব শুনে স্বামীজী বললেন, তোমার কাজ তুমিই করো। শ্রীরামকৃষ্ণ যে-পদ্ধতি দেখিয়ে গেছেন তা তো ভালই। এখন তাকে হাতে-কলমে খাটানোটাই আসল কথা। তিনি খ্রীষ্টান-মুসলমান এমন কি পারিয়ারের সঙ্গে খেয়েছেন, তাদের পোশাক পরেছেন, তাদের আচার পালন করেছেন। উদ্দেশ্য, যেন তাদের আত্মার আত্মীয় হতে পারেন। ছাত্রীদের কাছ থেকেই সবকিছু শিখতে পারবে। এর পরে—অনেকদিন পরে—পরস্পর মেলামেশা করতে করতে তোমার কাজ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। হিন্দুর পারিবারিক জীবনের হাজার খুঁটিনাটি হতে উপাদান সংগ্রহ করে বিদ্যাদানের সার্থক পথটি খুঁজে পাবে।

বাগবাজারের আশপাশ হতে ছোট ছোট বালিকারা আসতে লাগলো নিবেদিতার বিদ্যালয়ে। তারা সঙ্গে করে নিয়ে আসতো খেলবার জিনিস। সেগুলি স্কুলে এনে খেলতো। নিবেদিতা তাদের খেলায় বাধা দিতেন না। বরং খেলার মধ্যে দিয়ে

সময় এসেছে, এখন আমিই একে সিদ্ধির দিকে পরিচালিত করবো।"

(Uttarpara speech'-এর সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ)

বাংলা মায়ের স্নেহের দুলাল এবং শক্তি মন্ত্রের পূজারী নেতাজী সুভাষও বুঝেছিলেন রাজনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির মিলন না হলে দেশের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয়। এ যে ভারতের চিরন্তন ঐতিহ্য। আমাদের দেশের এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের পরিচয় পাই আমাদের দুই মহাকাব্যে—রামায়ণ ও মহাভারতে। সুভাষচন্দ্র ভারতীয় ঐতিহ্যের কর্ণধার শ্রীঅরবিন্দের জীবনদর্শন এবং রাজনৈতিক ভাষা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাই তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভারত পথিক-'এ লিখেছেন: '......কলেজে পড়বার সময়ে অরবিন্দর লেখা এবং চিঠিপত্র পড়ে তাঁর প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। সে সময়ে অরবিন্দ 'আর্য' নামে একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকার মধ্যে দিয়েই তিনি তাঁর আদর্শ প্রচার করতেন। বাংলাদেশের বিশিষ্ট কয়েকজন লোকের কাছে তিনি চিঠিপত্রও লিখতেন। এইসব চিঠি ঘুরতো লোকের হাতে হাতে। রাজনীতির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে যাঁরা বিশ্বাস করতেন তাঁদের কাছে চিঠিগুলির বিশেষ মূল্য ছিল। আমাদের হাতেও মাঝে মাঝে এই চিঠি আসতো। সকলকে সেইসব চিঠি পড়ে শোনানো হতো। একটি চিঠিতে অরবিন্দ লিখেছিলেন, "আমাদের প্রত্যেককে আধ্যাত্মিক বিদ্যুৎশক্তির এক একটি ডাইনামো হতে হবে, যাতে আমরা যখন উঠে দাঁড়াব তখন চারপাশে হাজার হাজার লোকের মধ্যে আলো ছড়িয়ে পড়ে—তারা স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করে।" চিঠি পড়ে আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম দেশের সেবা করতে হলে আধ্যাত্মিক শক্তির একান্ত প্রয়োজন।'......

(ভারত পথিক—সুভাষচন্দ্র বসু—পৃঃ ৭৭-৭৮)

দেশ ও জাতির সামগ্রিক কল্যাণকর্মের অন্তরালে থাকে ঈশ্বরের অভীপ্সা ও শক্তি। যুগে যুগে মানুষ অত্যাচার ও অনাচারে যখন দিগ্‌ভ্রান্ত হয়—হারায় সত্য ও ধর্মকে ঠিক সেই সংকটময় মুহূর্তে আবির্ভূত হন ঈশ্বরপ্রেরিত দূত। তাঁরা পৃথিবীর মাটিতে মহামানব নামে পরিচিত। উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা দেখতে পাই যে ভারত-মানসের অগ্রদূত বাংলামানসের ওপর যেন ঈশ্বরের আশীষধারা নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারই ফলশ্রুতি আমরা পেয়েছি রাজা রামমোহন রায় হতে আরম্ভ করে নেতাজী সুভাষ পর্যন্ত। এঁরা দেশকে ধর্ম ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যে নব আন্দোলন আরম্ভ এবং পরিচালনা করেন তাই এই জাতিকে দিয়েছে আশা, গৌরব এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীঅরবিন্দ এমনি সব মহামানব। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য বিবেকানন্দ যে সত্য উপলব্ধি করে গিয়েছেন সেই সত্য তিনি প্রতিষ্ঠিত করে যান তাঁর অন্যতমা শ্রেষ্ঠ শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার অন্তরে ভারতের সেবার সুকৌশল পন্থার মধ্যে দিয়ে। স্বামীজীর শক্তি, তাঁর স্বপ্ন ও সাধনার মর্ম বোঝার ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে এলো নিবেদিতার অন্তরে। গুরুশক্তিতে তিনি একাজে সমর্থ হন।

একদিন স্বামীজী বললেন নিবেদিতাকে, আমার দেশবাসীকে আর সবার চাইতে তুমিই বোধহয় ভাল বুঝবে। আইরিশ আর বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের ধাঁচটা একই রকম। এদের কেবল কথা আর কথা,—বড়-বড় কথা বলে বাক্‌চাতুরী দেখাবে। এ-দু'জাতই বাক্‌পটুত্বে সবাইকে হার মানায়। কিন্তু আসল কাজের বেলায় কিছুই করতে পারে না। তাছাড়া এ ওর পিছনে ঘেউ-ঘেউ করে আর পরস্পরের মুণ্ডপাত করেই এরা সমস্তটা সময় নষ্ট করে। ইংরেজরা আমাদের ঠিকই সমালোচনা করে। আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ত্রুটি, দেশজোড়া অজ্ঞতা নোংরামি আর স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অভাব—এ অক্ষমতাগুলো অস্বীকার করবার নয়। কি

করে ইংরেজরা এত সহজে ভারত জয় করলে? কারণ, তারা একটা ন্যাশন, কিন্তু আমরা এখনও তা হইনি। একজন মহামানব দেহত্যাগ করলে শতাব্দীর পর শতাব্দী আমরা প্রতীক্ষায় থাকি, কখন আরেকজন আবির্ভূত হবেন। কিন্তু যে চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে তার স্থান পূরণ করবার শক্তি আছে ইংরেজদের। আমাদের দেশে মানুষের মত মানুষ নেই। কেন? তার কারণ, যে-সম্প্রদায় থেকে মানুষের মত মানুষ সৃষ্টি হবে পশ্চিমের চেয়ে এদেশে তার গণ্ডী অনেক ছোট। এই ত্রিশ কোটি অধিবাসীর মধ্যে যে-কটি আদর্শ-পুরুষ আছেন, তিনচার ছ'কোটি লোকসংখ্যা যাদের সেসব জাতের মধ্যে তার চাইতে ঢের বেশী মানুষ দেখা যায়। কেননা তাদের মধ্যে শিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত অনেক বেশী।...... জনসাধারণের আদর্শের মান উন্নয়নের জন্যে তাদের শিক্ষার ভার নিতে হবে আমাদের। শুধু এই করেই একটা জাতি গড়ে তোলা যায়। আমাদের কাজ হচ্ছে প্রাথমিক উপকরণগুলো সংগ্রহ করা। তারপর বিধাতার নিয়মে আপনিই তা সংহত হয়ে দানা বাঁধবে। লোকের মাথায় এইসব ধারণা আমাদের ঢুকিয়ে দিতে হবে। বাকীটা তারা নিজেরা করবে। গণশিক্ষার ব্যবস্থা করা সহজ নয়। দারিদ্র্য-পীড়িত রাজশক্তি সামান্যই করতে পারে, সেদিক থেকে আমাদের কোনও আশা নেই। আমাদের নিজেদের খাটতে হবে। সাহস চাই, সাহস! মুষ্টিমেয় শক্তিমান লোক দুনিয়া তোলপাড় করে ফেলতে পারে।

মেয়েদের মধ্যে তুমি যে কাজ করবে সেও একটা কাজের মত কাজ। তাদের উদ্বুদ্ধ করো। ইউরোপীয় নারী কাপুরুষকে ঘৃণা করে। তারাই ওদেশের পৌরুষকে জাগিয়ে রেখেছে। বাঙালী মেয়েরা কবে তাদের মত পুরুষের দুর্বলতাকে নির্মম বিদ্রূপে লাঞ্ছিত করবে?

এইসব কথা বলতে বলতে স্বামীজী সম্পূর্ণ ভুলে যেতেন নিজের

শরীরে ব্যাধির কথা। তারপর যখন থামতেন তখন আবার হাঁপানীর শ্বাসকষ্ট ভোগ করতেন।

দিন দিন তাঁর শরীর খারাপ হতে লাগলো। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে আমেরিকায় যাবার জন্যে মিস্ ম্যাকলাউড আমন্ত্রণ জানালেন। নিবেদিতাও বললেন স্বামীজীকে, আপনি ঘুরে আসুন আমেরিকা হতে।

রাজী হলেন স্বামীজী। সব ঠিকঠাক। এমনসময় ঘটে গেল এক অনর্থ। কলকাতায় দেখা দিল প্লেগের উৎপাত। বহু নাগরিক ওর কবলে পড়ে মৃত্যু বরণ করলে।

আর স্থির থাকতে পারলেন না স্বামীজী। কয়েকজন সন্ন্যাসীকে প্রস্তুত হতে বললেন রোগীর সেবার জন্যে। নিজেও প্রস্তুত হলেন। বাগবাজারের জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে লাগলেন। তারা তাঁকে বিশ্বাস করতো। তাই স্বামীজীর ডাকে সাড়া দিলে। স্বামীজী নিবেদিতা এবং দু'জন সন্ন্যাসীকে ভার দিলেন চাঁদা আদায় করতে। নিবেদিতাকে বললেন, পাড়াটা আমরা বাঁচাবই। সে-ভার তোমার ওপর রইলো। অনেক ঝাড়ুদার দরকার। সেজন্যে প্রয়োজন মানুষের। টাউন হলে বিশেষ সভার বন্দোবস্ত করছি। লোকের এই গা-ছেড়ে-দেওয়া ভাবটা বাড়িয়ে দিতে হবে। আমি সভাপতি হবো, তুমি বলবে। আমি চাই কলকাতার ছাত্রেরা একজোট হয়ে নিজের হাতে বাগবাজার অঞ্চল পরিষ্কার করুক। আমি বলি কি ওদের মরণের বাতিক ধরুক। সেটা কি তা জানো তো? কাল সারাদিন আমার ছেলেদের সঙ্গে এই নিয়ে কথা হয়েছে। তারা ঠিক হন্যে কুকুরের মত হয়ে আছে।......

রোগের প্রকোপ দেখে নগরীর মাঝে দেখা গেল আতঙ্ক। প্রতিদিন প্রায় শ-খানেক করে মানুষ প্রাণ হারাতে লাগলো। সদানন্দের নেতৃত্বে একদল স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে নিবেদিতা বাড়ীতে

বাড়ীতে গিয়ে রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে সরকারের স্বাস্থ্য-অধিকর্তা ছুটে এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তাকে দেখে নিবেদিতা বলে উঠলেন, বাগবাজারটা আমরা ঠিকই বাঁচাব। সাধারণের জন্যে সাধারণই এখানে খাটছে। একটা রাস্তা থেকে প্রথম দফাতেই দু'শ পঁয়ত্রিশ টাকা চাঁদা আদায় হয়েছে। আমার সহকারীরা সন্ন্যাসী। তাঁরা রাস্তার জঞ্জাল পরিষ্কার করছেন, মেথর খাটছেন। দিনে আঠারো ঘণ্টা তাঁরা খাটেন—কাজকে মনে করেন দেবসেবা।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল ক্লাসিক থিয়েটারে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক আহুত এক সভায় বক্তৃতা দিলেন নিবেদিতা। স্বামীজী ছিলেন সেই সভার সভাপতি। 'দেশ ও ছাত্রদের কর্তব্য' প্রসঙ্গে ভাষণ দিলেন নিবেদিতা।

নিবেদিতার ডাক শুনে ছাত্রেরা গড়ে তুললে দল। তারা পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে প্লেগের জীবাণু ধ্বংসের কাজে লেগে গেল। ঝাড়ু নিয়ে পথের ময়লা পরিষ্কার করে তাই এক জায়গায় স্তূপাকার করে আগুন ধরিয়ে দিতে লাগলো।

তাদের উৎসাহ দিয়ে বললেন নিবেদিতা, ঝাড়ুদারও যদি একটা আদর্শের প্রেরণায় কাজ করে তাহলেই বৃহত্তর আদর্শের জন্যে তার প্রস্তুতি হয়ে গেল। সে-আদর্শ কি? সেটা ঠিক করে নেওয়া তোমাদের দায়। বাগবাজারকে রক্ষা করে আমরা নতুন প্রাণ দিয়ে ভারতের ইতিহাস রচনা করলুম। এ-ইতিহাস আগে কখনও লেখা হয় নি। এ আমাদের রামায়ণ।

আপ্রাণ চেষ্টা করে নিবেদিতা বাগবাজার অঞ্চলে সেবাকাজ চালালেন দীর্ঘ একমাস যাবৎ। অনেক মেয়েকেও নিয়োগ করলেন রাস্তা পরিষ্কারের কাজে। প্রথম প্রথম তারা লোকলজ্জার ভয়ে একাজে এগুলো না। পরে এলো।

কাজ হয়ে গেলে নিবেদিতা ফিরে এলেন গুরুর কাছে। তাঁকে

সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। সব শুনে গুরুদেব খুসী হয়ে তাঁকে জানালেন শুভাশীষ। তারপর বললেন, তোমার উচিত এমনি নিষ্কাম কর্মে আত্মনিয়োগ করা। তোমার ভালবাসা তোমার কর্মকেও যেন ছাপিয়ে যায়।

গুরুর আশীর্বাদ শিরোধার্য করে খানিকক্ষণ নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন নিবেদিতা। তারপর ধীর কণ্ঠে বললেন, স্বামীজী, আমি শেষের ব্রতদীক্ষা নিতে চাই।

স্বামীজী বললেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তোমার প্রতীক্ষায় আছেন। গুরুদেবের কথা বড় ভাল লাগলো নিবেদিতার। তিনি মনে মনে শ্রীরামকৃষ্ণকে স্মরণ করে তাঁর উদ্দেশ্যে অন্তরের প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

এরপর নিবেদিতা এইসব অভিজ্ঞতার কথা পত্র মারফত লিখে জানালেন তাঁর এক বন্ধুকে। হাতে-কলমে ভারতবাসীদের সেবা করতে পারার আনন্দ সেদিন প্রথম উপলব্ধি করলেন নিবেদিতা।

আত্মসমর্পণের দীক্ষায় নিবেদিতা

প্রথম পর্বে সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষার পর এক বছর কেটে গেল নিবেদিতার জীবনে। ইতিমধ্যে নিবেদিতা নিজেকে বেশ ভালভাবে প্রস্তুত করেছেন তাঁর গুরুনির্দেশিত ত্যাগ ও সংযমের ওপর প্রতিষ্ঠিত দৈনন্দিন কয়েকটি নিয়মের মধ্যে দিয়ে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীর মত প্রতিদিনের জীবনকে এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যে মানসিক আর শারীরিক স্বাস্থ্যের সুস্থতা এবং পূর্ণতা এসেছে বর্তমানে। এখন তাঁর মন চায় কেবল শিবজ্ঞানে জীবসেবা করতে। সর্বজীবের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে দিব্যানু-

ভূতি লাভ করার আনন্দ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। সন্ন্যাস জীবনের পক্ষে অপরিহার্য যে 'শৈক্ষ্য' ও 'বৈরাগ্য'—এই দু'টি বৃত্তির মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। তাই গুরু এখন তাঁকে পুরোপুরি সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত করে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একজন নিষ্ঠাবতী কর্মী করে নিতে মনস্থ করলেন।

এক শুভদিনে স্বামীজী নিবেদিতাকে শেষ দীক্ষা দিলেন। শিব ও বুদ্ধের পুজো করলেন ফুল আর নানারকম সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে। তারপর হোমের অনুষ্ঠান হলো। তাতে নিবেদিতা ঘি, ফুল, ফল, দুধ, বেলপাতা, যব ইত্যাদি আহুতি দেওয়ার পর নিজের সর্বস্ব আহুতি দিলেন। আহুতি দেবার সময় সন্ন্যাসীরা একসঙ্গে মন্ত্র পাঠ করলেন। নিবেদিতার জন্যে মন্ত্র পাঠ করলেন ঃ 'যিনি সমস্ত কামনা-বাসনা ত্যাগ করেছেন, যিনি বীতক্রোধ ; অদ্বেষ্টা, সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শী, দান, শৌচ, সত্য আর অহিংসাই যাঁর জীবনব্রত তিনিই ধন্য। তিনি ঈশ্বরে লগ্ন চিত্ত। তাঁর সমস্তই ভগবানে অর্পিত।

এবার গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন নিবেদিতা। গুরু তাঁর ললাটে ভস্মতিলক পরিয়ে দিলেন। সেইসঙ্গে অন্যান্য সন্ন্যাসীদের ললাটেও ভস্মতিলক পরালেন।

একজন সাধু গেয়ে উঠলেন, হে অগ্নি, হে পাবক, হে অমৃত, হে বনস্পতি, হে প্রাণ, নৈঃশব্দের সাক্ষী হে দ্যুলোক, হে গুরু, এই দেখ আমার পার্থিব যা-কিছু এই অগ্নিতে আহুতি দিলুম, আহুতি দিলুম আমার অহংকে। হে অগ্নি, আমায় গ্রাস করো, আমার কিছুই যেন আর অবশেষ না থাকে। হরি ওম্ তৎসৎ, হরি ওম্ তৎসৎ।

সেদিন দুপুরে মঠেই রইলেন নিবেদিতা। খাওয়ার পর স্বামীজী তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর কাছে গেলেন নিবেদিতা। পরণে সাদা পোশাক, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা।

স্বামীজীর কাছে যেতেই তিনি বুঝতে পারলেন নিবেদিতার মনের ভাব। গুরুর প্রতি পুরোপুরি নিষ্ঠা এবং ভালবাসা এসেছে। গুরুই ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর। গুরুই ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। গুরুতে একবার নিষ্ঠা এবং অনুরাগ জাগলেই সব হয়ে গেল। তার আর কিছু বাকী থাকে না। সে জীবনের ইষ্টকে লাভ করে ধন্য ও পবিত্র হয়। এমনি ভালবাসা এসেছে বর্তমানে নিবেদিতার অন্তরে। তিনি তাঁকে তার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন, মার্গট, মনে রেখো, আধ ডজন লোকও যদি এরকম ভালবাসতে শেখে তাহলেই একটা নতুন ধর্মের উদ্ভব হয়, তার আগে হয় না। আমার সবসময় মনে পড়ে সেই মেয়েটির কথা। ভোরবেলা মহাসমাধির দুয়ারপথে এসে দাঁড়িয়েছে। এমন সময় সে শুনতে পেলে একজনের কণ্ঠস্বর। ভাবলে সেই কণ্ঠস্বর বুঝি কোন মালীর।

খানিক পরে দেখলে, যীশু এসে তাকে স্পর্শ করলেন। তাঁকে দেখে মেয়েটি চীৎকার করে আর্তস্বরে বলে উঠলো, ঠাকুর। আমার ঠাকুর!

এ ছাড়া আর কিছুই সে আমাকে বলতে পারলে না। তিনি তখন চলে গেছেন।

একটু থেমে স্বামীজী বললেন, অমন গোটা ছয়েক শিষ্য আমাকে দাও। আমি জগৎ জয় করবো।

স্বামীজীর কথা শুনে নিবেদিতা অন্তরে শক্তি ও আনন্দ পেলেন। মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন, হে ঈশ্বর, স্বামীজীর স্বপ্ন যেন সার্থক হয়ে ওঠে।

এরপর নিবেদিতা ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ মিস ম্যাক্লাউডের কাছে পত্র লিখে জানালেন নিজের মনোভাবের কথা: 'মনে হয় দু'টি কারণে উনি আমায় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী করলেন। প্রথমত প্রাচীন প্রথাটা আবার চালু করতে চান। দ্বিতীয়ত তাঁর

দৃষ্টিতে এর তুলনায় বড় আর কিছু পাওয়ার জন্যে প্রস্তুত নই আমি। এটা সত্যি কথা। কখনো যদি এর পরের স্তরে যেতে হয় তার জন্যে সকলভাবে নিজেকে তৈরী করেই তাঁর কাছে আসবো।'……

এরপর শেষ দীক্ষার অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানটির বর্ণনা লিখে রাখলেন নিবেদিতা ঃ

'…কাল, প্রথম দীক্ষার ঠিক একবছর পরে আমি হলুম নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী।'

'আটটার সময় মঠে পৌঁছে গেলুম মন্দিরে। সেখানে পূজোর ফুল না আসা পর্যন্ত মেঝেতে বসে রইলুম সকলে। রাজা আমায় শোনাতে লাগলেন বুদ্ধের কথা। খুব সময়োপযোগী এবং সুন্দর আলোচনা, না? জীবনের নিষ্ঠাপূত চিরন্তন আদর্শের কথা বললেন বার-বার ঃ মুক্তিই নয়, ত্যাগ—আত্মোপলব্ধিই নয়, আত্মবিসর্জন।'

'তারপর সব উপকরণ এসেগেলে আমায় শিখিয়ে দিলেন পূজো করতে। এতদিনে আমার চিরসাধের শিবপূজো করার শিক্ষা পেলুম তাঁর কাছে। দু'জনে মিলে পূজো করলুম। মা যেমন আদর করে ছেলেকে শেখায়, সারাক্ষণ তেমনি মিষ্টি সুরে মন্ত্রপাঠ করে আমায় সব শেখালেন। দশাবতার-স্তোত্র পাঠ করে অর্চনা শেষ হলো।'

'যখন ফুল দিয়ে বেদি সাজিয়ে দিয়েছি, রাজা বললেন, "এবার আমার বুদ্ধকে কিছু ফুল দাও। আমি ছাড়া এখানে আর কেউ তাঁকে পছন্দ করে না।" যারা তাঁর কাছে পথের দিশা খুঁজতে আসবে আজ যেন আমার মাঝে তাদের সবাইকে সম্বোধন করে আশীর্বাদ দিয়ে বললেন, "যাও, যিনি বুদ্ধত্বলাভের আগে পাঁচশো বার পরের জন্যে জীবন দান করেছেন তাঁকে অনুসরণ করে চলো!"

'পূজো শেষ হলে হোম করার জন্যে নেমে এলুম নীচে।'

১৬

বাগবাজারে নিবেদিতাকর্তৃক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

সারদামণি নিবেদিতাকে কাজ করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। নিবেদিতাও বোস পাড়া লেনের বাড়ীতে বসে তাঁর ভাবী কাজ নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁর কাজ হচ্ছে মেয়েদের জন্যে একটা স্কুল খোলা। সে স্কুলটি হবে সম্পূর্ণ ভারতীয় কায়দায়। মিশনারী স্কুলের মত হবে না। এই নিয়ে মিসেস বুলের সঙ্গে মতভেদ হলো নিবেদিতার। মিসেস বুল চেয়েছিলেন, নিবেদিতার স্কুলটি যদি লণ্ডনের কোন মিশনারীদের মত গড়ে তোলা হয় তাহলে তিনি অর্থসাহায্য দিতে প্রস্তুত।

তাঁর শর্তে রাজী হলেন না নিবেদিতা। বুলকে জানিয়ে দিলেন, আমি টাকা চাই না। মা আছেন। তাঁর কৃপা হলে টাকা আপনি আসবে।

মিস্ ম্যাকলাউড সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। তবে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য নেবার আগে নিবেদিতা তাঁর স্কুলের জন্যে প্রথমে অর্থসাহায্য নিলেন কাশ্মীরের মহারাজার কাছ থেকে। তিনি দিলেন আটশো টাকা। তাই দিয়ে জনা তিনেক মেয়ে নিয়ে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর কালীপূজোর দিন স্কুল খুললেন। অর্থাৎ নিবেদিতা স্বামীজীর কাছ থেকে শেষ দীক্ষা নেবার ঠিক চার মাসের মাথায় স্কুলের দ্বারোৎঘাটন করা হলো। নাম দিলেন বালিকা বিদ্যালয়। শ্রীমা সারদামণির উপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করা হলো। পরে ধীরে ধীরে ছাত্রীসংখ্যা বাড়তে লাগলো। প্রথম প্রথম স্কুলে ছাত্রীরা আসতে চাইতো না। পরে নিবেদিতা এবং

সদানন্দ গিয়ে অভিভাবকদের অনেক করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে আসতেন।

অনেক গোঁড়া অভিভাবক প্রথমে আপত্তি জানাতে লাগলেন। বললেন, স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে কি হবে? আমার মেয়ে বিয়ের পর শশুরবাড়ী যাবে। লেখাপড়া শিখে কি ধুয়ে ধুয়ে খাবে?

কিন্তু নিবেদিতা অনেক যুক্তিতর্ক দিয়ে তাদের মনের পরিবর্তন আনতে লাগলেন।

যাইহোক স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে নিবেদিতা বেশ মাথা ঘামাতে লাগলেন। তাঁর মনে অহরহ চিন্তা আশ্রয় করতো কিভাবে তিনি স্কুলটি ভালভাবে গড়ে তুলবেন। এ সম্বন্ধে স্বামীজীর কাছে একটা পরিকল্পনা নেবারও ইচ্ছে করলেন।

একদিন নিবেদিতা স্বামীজীর কাছে এসে তাঁর স্কুল সম্বন্ধে মত চাইলেন।

সব শুনে স্বামীজী বললেন, তোমার কাজ তুমিই করো। শ্রীরামকৃষ্ণ যে-পদ্ধতি দেখিয়ে গেছেন তা তো ভালই। এখন তাকে হাতে-কলমে খাটানোটাই আসল কথা। তিনি খ্রীষ্টান-মুসলমান এমন কি পারিয়ারের সঙ্গে খেয়েছেন, তাদের পোশাক পরেছেন, তাদের আচার পালন করেছেন। উদ্দেশ্য, যেন তাদের আত্মার আত্মীয় হতে পারেন। ছাত্রীদের কাছ থেকেই সবকিছু শিখতে পারবে। এর পরে—অনেকদিন পরে—পরস্পর মেলামেশা করতে করতে তোমার কাজ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। হিন্দুর পারিবারিক জীবনের হাজার খুঁটিনাটি হতে উপাদান সংগ্রহ করে বিদ্যাদানের সার্থক পথটি খুঁজে পাবে।

বাগবাজারের আশপাশ হতে ছোট ছোট বালিকারা আসতে লাগলো নিবেদিতার বিদ্যালয়ে। তারা সঙ্গে করে নিয়ে আসতো খেলবার জিনিস। সেগুলি স্কুলে এনে খেলতো। নিবেদিতা তাদের খেলায় বাধা দিতেন না। বরং খেলার মধ্যে দিয়ে

সদানন্দ গিয়ে অভিভাবকদের অনেক করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে আসতেন।

অনেক গোঁড়া অভিভাবক প্রথমে আপত্তি জানাতে লাগলেন। বললেন, স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে কি হবে? আমার মেয়ে বিয়ের পর শশুরবাড়ী যাবে। লেখাপড়া শিখে কি ধুয়ে ধুয়ে খাবে?

কিন্তু নিবেদিতা অনেক যুক্তিতর্ক দিয়ে তাদের মনের পরিবর্তন আনতে লাগলেন।

যাইহোক স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে নিবেদিতা বেশ মাথা ঘামাতে লাগলেন। তাঁর মনে অহরহ চিন্তা আশ্রয় করতো কিভাবে তিনি স্কুলটি ভালভাবে গড়ে তুলবেন। এ সম্বন্ধে স্বামীজীর কাছে একটা পরিকল্পনা নেবারও ইচ্ছে করলেন।

একদিন নিবেদিতা স্বামীজীর কাছে এসে তাঁর স্কুল সম্বন্ধে মত চাইলেন।

সব শুনে স্বামীজী বললেন, তোমার কাজ তুমিই করো। শ্রীরামকৃষ্ণ যে-পদ্ধতি দেখিয়ে গেছেন তা তো ভালই। এখন তাকে হাতে-কলমে খাটানোটাই আসল কথা। তিনি খ্রীষ্টান-মুসলমান এমন কি পারিয়ারের সঙ্গে খেয়েছেন, তাদের পোশাক পরেছেন, তাদের আচার পালন করেছেন। উদ্দেশ্য, যেন তাদের আত্মার আত্মীয় হতে পারেন। ছাত্রীদের কাছ থেকেই সবকিছু শিখতে পারবে। এর পরে—অনেকদিন পরে—পরস্পর মেলামেশা করতে করতে তোমার কাজ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। হিন্দুর পারিবারিক জীবনের হাজার খুঁটিনাটি হতে উপাদান সংগ্রহ করে বিদ্যাদানের সার্থক পথটি খুঁজে পাবে।

বাগবাজারের আশপাশ হতে ছোট ছোট বালিকারা আসতে লাগলো নিবেদিতার বিদ্যালয়ে। তারা সঙ্গে করে নিয়ে আসতো খেলবার জিনিস। সেগুলি স্কুলে এনে খেলতো। নিবেদিতা তাদের খেলায় বাধা দিতেন না। বরং খেলার মধ্যে দিয়ে

ছাত্রীদের মগজে পড়া ও লেখার নেশা প্রবেশ করাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন, আমি আগে শিশুদের শিক্ষামূলক খেলাধূলো নিয়ে যে গবেষণা করেছি তা এবার হাতে-কলমে প্রয়োগ করে দেখা উচিত।

যেমন ভাবলেন অমনি কাজ হলো। তিনি খেলার মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীকার শ্রীমতী লিজেল রেমঁ তাঁর 'নিবেদিতা' গ্রন্থে লিখেছেন '……মেয়েরা বড় ঘরে বসে কাজ করে। একেক জনকে একেকটা কাজ দেওয়া হয়েছে। পড়া, লেখা আর কিছুটা অঙ্ক এই হলো মোটামুটি,—এই নিয়েই ওরা খেলে। শিখতে ওদের উৎসাহের সীমা নেই, কেননা তোতার মত তুর্বোধ্য কতকগুলো কথা ওদের আওড়াতে হয় না, ওরা নিজেরাই এখানে একেকটা জিনিস আবিষ্কার করে চলে। কথা আর তার অর্থ, প্রকৃতির বর্ণনার সঙ্গে ওদের ভাবনার মিল এইগুলো ওরা আস্তে-আস্তে বুঝে নেয়, এক তুই করে সংখ্যা গুণতে-গুণতে শতকিয়ার কোঠায় পৌঁছায়।

'খেলা দিয়েই সমবেত পাঠ দেওয়া হয়। মেঝেতে এক ঝুড়ি তেঁতুলের বিচি ফেলে গণিত শেখানো হয়। যে-ক'টা গুণতে পারে সে-ক'টা বিচি ওরা তুলে নেয়, তাই দিয়ে বেচা-কেনা চলে। এক ভিখারিণী দরজায় আসে রোজ, তাকেও তার পাওনা দিতে ওরা ভোলে না। তারপর একতাল কাদামাটি দেওয়া হয়, ওরা মহানন্দে মূর্তি গড়ে। মন থেকে কত কি তৈরী করে, জলের মাছ থেকে আকাশের তারা কিছুই বাদ যায় না।' (নিবেদিতা—লিজেল রেমঁ—পৃঃ ২৫১—মায়াদেবী কর্তৃক অনূদিত)

কেবল পুঁথিগত শিক্ষা নয় গেরস্থালীর অনেক কিছু বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে উপদেশ দিলেন, পিতৃপূজাকে বীরপূজায় রূপান্তরিত করো। তারপর মেয়েদের ভগবান সম্বন্ধে যার যেমন কল্পনা সেইমত মূর্তি

গড়তে বা ছবি আঁকতে বলো, ওদের পূজার্চনা করবার জন্যে একটা-না-একটা কল্পমূর্তি তো তোমায় বাৎলাতেই হবে। শিক্ষার আদর্শ হবে উদার। সকলের শাস্ত্রই শ্রদ্ধেয়,—শুধু হিন্দুর নয়, খ্রীষ্টান মুসলমান সবারই। কিন্তু পূজানুষ্ঠানে বৈদিক আচারই মানতে হবে—বেদির নীচে থাকবে পূর্ণকুম্ভ আর ধূপদীপের উপচার। গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, পাখি সবরকম জন্তু জানোয়ার যোগাড় করো, ওদের পরিচর্যা করতে শেখাও। পুরাতন কলা বা সূচীশিল্প ফিরিয়ে আনতে হবে,—ছুঁচে ফুল তোলা বা জরির কাজ এইসব। সব-কিছুর উদ্দেশ্য হলো এই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা: মানুষের সেবা করো, ভিখারী রুগ্ন বা নিরন্নের পরিচর্যা করো, তাদের খেতে দাও, রোগে করো শুশ্রূষা। হৃদয় আর কর্মক্ষমতা একসঙ্গে উৎকর্ষিত হবে এমনি করে হাতে-কলমে সবধরনের শিক্ষা পেলে।

সারদাদেবী প্রায়ই দেখতে আসতেন নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়। ছোট ছোট মেয়েদের জন্যে উনি আনতেন মিষ্টি। মেয়েদের কাছে বসিয়ে কত আদর করতেন, মিষ্টি কথা শোনাতেন।

নিবেদিতাও মেয়েদের সঙ্গে নানাপ্রকার কথাবার্তা ও গল্প করতেন। কালীর গল্প শুনতে মেয়েরা খুব ভালবাসতো। মা কালী কিরকম, তাঁর ধ্যান করতে হয় কেমনভাবে ; তাঁকে কেমন করে পূজো করতে হয় এসব শোনাতেন ছোট ছোট মেয়েদের। তারাও নিবেদিতার কথা শুনে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতো তাঁর মুখের দিকে।

এছাড়া নিবেদিতা নিজের মায়ের কথা বলতেন। সময় সময় স্কুলের মেয়েদের কাছে মায়ের প্রসঙ্গ নিয়েও গল্প বলতেন :

'...আচ্ছা খুকু-সোনা, ছোটবেলায় সবার আগে কি দেখেছিলে মনে পড়ে? তুমি মায়ের কোলে শুয়ে, তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে হাসছ—এই না? মায়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছ? মা চোখ

বুঝলেন,—ওমা! খুকী গেল কোথায়? চোখ মেলে দেখেন, এই-যে খুকী!......আবার খুকী চোখ বুজল......মা নেই! নেই! আবার চোখ মেলতেই......এই-যে!......'

এই গল্পের মধ্যে সত্য-মিথ্যা অনেক বিষয় থাকতোই। ছোট মেয়েদের নিয়ে অনেক ঝক্কি-ঝামেলা পোয়াতে হতো নিবেদিতাকে। তাঁকে সাহায্য করতেন স্বামী সদানন্দ আর একটি মেয়ে। মেয়েটির নাম সন্তোষিণী। তার বেশী বয়েস নয়। বছর বারো হবে। ঐ বয়সেই সে বড়দের মত কাজ করতো।

১৭

কলকাতায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয়

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। এই মাসে মিস্ ম্যাকলাউড ও মিসেস বুল উত্তরভারত হতে প্রত্যাবর্তন করলেন কলকাতায়। আমেরিকান কনসালের পত্নীর সহযোগিতায় এই দুই মার্কিন মহিলার কলকাতার বিশিষ্ট কয়েকজন নরনারীর সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নাট্যকার গিরিশ ঘোষ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ।

বেলুড়মঠের কাজে মিস্ ম্যাকলাউড স্বামীজীকে যথেষ্ট সাহায্য করতে লাগলেন। নিবেদিতা নিজের বিদ্যালয় নিয়ে বেশীর ভাগ সময় ব্যস্ত থাকতেন। তিনি মনের মত করে বিদ্যালয়টি গড়তে চেয়েছিলেন এবং তা যতদিন না পূর্ণ হচ্ছিল ততদিন তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

এইসময় ভারতীয় সভ্যতা, চিত্রকলা ও কৃষ্টি প্রসঙ্গে নিবেদিতা

দেশবিদেশের পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন। হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গেও অনেক ভাল প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেম-ভক্তির রহস্য ব্যাখ্যা করে নতুন ধরনের মন্তব্য করলেন। তাঁর মন্তব্য পাঠ করে অনেকে খুসী হলেন আবার অনেকে গররাজী হলেন। যাঁরা গররাজী হলেন তাঁরা মিলিতভাবে প্রতিবাদ জানালেন। বললেন, রামকৃষ্ণের শিক্ষায় রয়েছে অন্ধবিশ্বাস। ওতে আসে দুর্বলতা এবং পরাধীনতা।

নিবেদিতা বললেন, না ওটা ঠিক কথা নয়। বিশ্বাসই হচ্ছে সবকিছু। তিনি আছেন সাকারে আবার নিরাকারে। সুতরাং তাঁকে যেভাবেই বিশ্বাস করবে তিনি সেভাবেই প্রকাশিত হবেন আমাদের মাঝে।

নিবেদিতা এই সঙ্গে সমর্থন করলেন হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রচলিত পৌত্তলিকতা। এই প্রসঙ্গে তিনি নানা পত্রিকায় জোরালো ভাষায় প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করে একশ্রেণীর গোঁড়া ব্রাহ্মণ বিরোধিতা করলে। তারা বললে, ঈশ্বর নিরাকার। আমরা সেই নিরাকারের ধ্যান করি—করি উপাসনা। এতে করে আমাদের মনে জাগে আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে আসে কর্মের প্রেরণা। আর তোমার ঐ পুতুল-পূজোর মধ্যে কিছু নেই। আছে কেবল ধর্মকে ছোট ও হেয় করার কারসাজি। কেবল ফাঁকি আর ছেলেখেলা। এতে করে জাতি গোল্লায় যেতে বসেছে। তার মেরুদণ্ড হতে বসেছে শক্তিহীন। ভগ্নোন্মুখ।

গোঁড়া ব্রাহ্মণ সমালোচকদের কথা শুনে নিবেদিতা বললেন, তোমাদের এ ধারণা একান্তই ভ্রমাত্মক। কেননা, তিনি আছেন যেমন নিরাকারে তেমনি আছেন সাকারে। তিনি একমেবা-দ্বিতীয়ম্। তিনি এক। তিনি বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যপে আছেন। সুতরাং আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের কি সাধ্য আছে তাঁকে দেখবার বা তাঁর করুণা পাবার? সেই কারণে আমরা তাঁর রূপ মনে মনে

কল্পনা করে তাঁকে অর্চনা করতে আরম্ভ করেছি। এতে করে তাঁর অদ্বিতীয়ত্ব ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে না। বরং তাঁর মাহাত্ম্য এতে করে আরও বেড়ে যাবে।

জ্ঞানী নিবেদিতার যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি ব্রাহ্মণ ভক্তদের কাছে উত্তম বলে বোধ হলো। তারা তখন রাগ-দ্বেষ ও ধর্মকে কেন্দ্র করে কলহ কিচকিচি ভুলে গেল। তারা আবার নিবেদিতা ও স্বামীজীর সঙ্গে এসে মিশলে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে আসবার আগে স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়ই ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতেন। তাই তাঁর পরিচিত অনেক পুরোনো ব্রাহ্মভক্তদের সঙ্গে পুনর্মিলন হওয়ার জন্যে খুসী হলেন স্বামীজী।

এরপর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে পরিচয় হলো নিবেদিতার। কবিগুরুর কাছে তিনি প্রায়ই যেতেন। কবিগুরুও আসতেন বাগবাজারে তাঁর বাসায়। দু'জনে বেশ আলাপ জমে উঠতো। ধর্ম ও সাহিত্য নিয়ে অনেক কথাবার্তা হতো। এইসময় কবিগুরু তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'গোরা' লেখেন। উপন্যাসের নায়কের চরিত্র নিবেদিতার চরিত্রের সঙ্গে মিল ছিল। কবি নিবেদিতার গুণাবলীর প্রশংসা করতেন। তিনি ছিলেন কোমল-প্রাণ এবং প্রেমিক মানুষ। নিবেদিতার অন্তরও প্রেমপূর্ণ ছিল তবু তাঁর অন্তরে একটা অদ্ভুত কর্মোদ্যম এবং বেপরোয়া ভাব ছিল। সেই ভাব সর্বদা তাঁকে সচেতন করে রাখতো জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যে বিরাট কর্মযজ্ঞে যোগ দেবার অজুহাতে। তাই মাঝে মাঝে নিবেদিতা কর্মযজ্ঞে নিজেকে আহুতি দেবার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠতেন। সেইসময় তাঁকে নিভৃত আলাপ-আলোচনা মুলতবী রাখতে হতো। একসময় কবিবরের সঙ্গে এমনি আলাপ করতে করতে ডাক এলো স্বামীজীর নিকট হতে। তখন তিনি বিদায় নিলেন কবিবরের নিকট।

সরলা ঘোষাল নামে ঠাকুরবাড়ীর এক মহিলার সঙ্গে নিবেদিতার

হৃদ্যতা হলো। তাঁর চেষ্টায় নিবেদিতা বিদ্যালয় একটি পাঠচক্র গড়ে তোলেন। এছাড়াও নিবেদিতা ব্রাহ্ম ভক্তদের নিয়ে অনেক জায়গায় সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা করতে লাগলেন। তাই দেখে স্বামীজী অত্যন্ত সুখী হলেন। তিনি যে এই রকমটি চেয়েছিলেন। ব্রাহ্ম ভক্তদের চেষ্টায় নিবেদিতা তখনকার কলকাতার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হলেন। অনেক নবাব ও রাজারা নিবেদিতার সঙ্গে আলাপ করে খুসী হলো।

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের মানুষ। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো নিবেদিতার। তিনি নিবেদিতার সঙ্গে দেশীয় চাষীদের কথা এবং তাদের চাষবাসের সমস্যা নিয়ে আলাপ করলেন।

একদিন সুরেন্দ্রনাথ বললেন নিবেদিতাকে, আপনার কাজ করবার মত বয়েস আমার হয় নি। আমি এখনও ছেলেমানুষ। কিন্তু কি করবো আপনার জন্যে বলুন না।

নিবেদিতা বললেন, যে সব চাষী তোমার জিম্মায় আছে তাদের ভার নাও। তাদের যন্ত্রপাতি জোগাও, ভাল বাড়ি-ঘর করে দাও। জমির খাজনা কমাও। তাদের ছেলেপিলেদের লেখাপড়া শেখাও। বুড়োদের দেখাশোনা করো। একটা জীবনের পক্ষে এই কাজই তো ঢের।

নিবেদিতার কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে তরুণ সুরেন্দ্রনাথ জমি-বিলির উন্নততর বন্দোবস্ত করা সম্বন্ধে নতুন পরিকল্পনা তৈরী করতে লেগে গেলেন।

একদিন নিবেদিতা বললেন, পরের জন্যে কাজ করাটা যে রীতিমত একটা তপস্যা এটা বোঝো তো?

নিবেদিতার কথা ঠিক বুঝতে পারলেন না সুরেন্দ্রনাথ। তিনি বেশ অসন্তুষ্ট হলেন। তাই অন্যভাবে মন্তব্য করলেন, জানি, নিজের অজানতে আপনি আমায় হিন্দু করে তুলতে চান। তাই আপনার সঙ্গে চণ্ডী পড়তে বলেন।

নিবেদিতা বললেন, ঠিকই বলেছ বোধ হয়। আমার কাজ করতে চাও না? ওতেও আমারই কাজ করা হয়......

নিবেদিতার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের মন কষাকষি হলেও পরক্ষণে তা দূর হয়ে যেতো অন্য আলোচনার সূত্রপাত করে।

এরপর সুরেন্দ্রনাথকে ধরে এবং স্বামীজীর কথামত নিবেদিতা দেখা করলেন কবিগুরুর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। তিনি তখন থাকতেন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে।

স্বামীজীর যখন অল্প বয়স তখন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হলো তাঁর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে। তখন দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গার ওপর বোটের মধ্যে অবস্থান করছিলেন।

যুবক নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরসন্ধানে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করার পর মনোমত কাউকে না পেয়ে শেষকালে এলো ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ এই আচার্যের কাছে। তাঁকে প্রশ্ন করলে, আচার্য, আপনি ভগবানকে দেখেছেন? আমিও দেখবো। তাঁর দেখা চাই-ই চাই!

একটু থেমে নরেন্দ্রনাথ পুনরায় বললে, আমায় অদ্বৈতবাদ বুঝিয়ে দিতে পারেন?

মহর্ষি বললেন, ঈশ্বর আমায় এ-পর্যন্ত কেবল দ্বৈতলীলাই দেখিয়েছেন।

মহর্ষির কথা শুনে দমে গেল নরেন। মহর্ষি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হতাশ হয়ো না বাবা। তোমার চোখ যোগীর মত। ভগবানের দৃষ্টি আছে তোমার ওপর......

নিবেদিতাকে দেখে আনন্দিত হলেন মহর্ষি। তিনি বললেন, আমি তোমার গুরুদেবকে আর একবার দেখতে চাই। তিনি প্রথম জীবনে একবার এসেছিলেন আমার কাছে। তারপর আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি।

নিবেদিতা বললেন, আচ্ছা আমি আপনার কথা জানাবো স্বামীজীর কাছে।

এরপর নিবেদিতা স্বামীজীর কাছে এসে তাঁকে জানালেন মহর্ষির কথা। সব শুনে তিনি বললেন, সত্যি একথা বলেছেন? নিশ্চয়ই যাবো আমি, তুমিও এসো না। শিগ্‌গির একটা দিন স্থির করো।

এর ক'দিন পরে স্বামীজীকে নিয়ে নিবেদিতা গেলেন মহর্ষির কাছে। সেদিনের কথা নিবেদিতা এভাবে লিখেছেন: 'আমাদের তখনই মহর্ষির কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। বাড়ীর দু'একজন সঙ্গে চললেন। স্বামীজী এগিয়ে গিয়ে বললেন, "প্রণাম", আমি দুটি গোলাপ ফুল দিয়ে প্রণাম করলুম। মহর্ষি আমাকে আশীর্বাদ করে স্বামীজীকে বসতে বললেন। তারপর মিনিট দশেক বাংলায় কথা চললো। স্বামীজী যে সব বাণী প্রচার করেছেন, মহর্ষি একে-একে তার উল্লেখ করতে লাগলেন। বললেন, আগাগোড়া তিনি স্বামীজীর কার্যকলাপের ওপর নজর রেখেছেন, গভীর আনন্দ ও গৌরববোধ নিয়ে তাঁর ভাষণ শুনে গেছেন। একথাতে ঠাকুরবাড়ীর সকলে আশ্চর্য হচ্ছিলেন। কিন্তু স্বামীজীকে কেমন যেন আড়ষ্ট লাগছিল, কেন জানি না মনে হচ্ছিল ওসব কথা যেন তাঁর কানেই যাচ্ছে না। এটা তাঁর সলজ্জতা। তারপর বৃদ্ধ চুপ করলেন। স্বামীজী তখন খুব বিনীতভাবে তাঁর আশিস ভিক্ষা করলেন। মহর্ষি আশীর্বাদ করলে পর আগের মতই প্রণাম করে আমরা নীচে চলে এলুম।'

মহর্ষির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বামীজী আর নিবেদিতা চলে আসছিলেন বাইরে এমন সময় ঠাকুর বাড়ীর লোকজন তাঁদের যেতে দিলেন না। কয়েকজন পুরুষমানুষ তাঁদের নিয়ে নানারকম আলাপ আলোচনা করতে লাগলেন। একজন জিজ্ঞেস করলেন স্বামীজীকে, আপনি রাজা রামমোহনকে কি বলতে চান?

উত্তরে স্বামীজী বললেন, তিনি হচ্ছেন নবীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

স্বামীজীর কথা শুনে খুশী হলেন ঠাকুরবাড়ীর লোকজন।

এরপর তাঁরা অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। কালীর উপাসনা আর ব্রাহ্মসমাজের প্রতীক-উপাসনা নিয়ে আলোচনা হলো। একদল কালীর উপাসনাকে ভাল নজরে দেখলেন না। আবার একদল প্রতীক-উপাসনারও সমালোচনা করলেন। স্বামীজী উভয়ের মতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুন্দরভাবে মন্তব্য করলেন, আপনাদের মতটাই শাস্ত্রসম্মত, তা ঠিক। কিন্তু অন্য মতটাও আপনাদের মেনে নেওয়া উচিত। অন্ততঃ অদ্বৈতবাদের সঙ্গে প্রতীক-উপাসনার যে একটা সম্পর্ক আছে এটা স্বীকার করাই ভাল।

স্বামীজী আর নিবেদিতা বিদায় নিলেন। যাবার সময় তিনি ঠাকুরবাড়ীর লোকজনদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এলেন বেলুড়ে আসবার জন্যে।

স্বামীজীর আমন্ত্রণ রক্ষার জন্যে একদিন সরলা ও সুরেন্দ্রনাথ এলেন বেলুড়ে। স্বামীজী সরলাকে নিয়ে বেলুড়মঠ দেখালেন। সঙ্গে ছিল ব্রহ্মানন্দ। ওদিকে সুরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে নিবেদিতা বেলুড়মঠের চারদিক ঘুরে দেখাতে লাগলেন। নিবেদিতাকে সাহায্য করতে লাগলেন অন্য আর এক সাধু।

বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরে এসে বিগ্রহকে প্রণাম জানালেন না সরলা ও সুরেন্দ্রনাথ। তাই দেশে দুঃখ প্রকাশ করলেন নিবেদিতা।

বিকেলের দিকে স্বামীজী নৌকায় করে অতিথিদের নিয়ে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। সেখানে তাঁরা বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হলেন। স্বামীজী গঙ্গাবক্ষে নৌকার ওপর বসে রইলেন। অতিথিরা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেলেন। তখন ভবতারিণীর মন্দির

বন্ধ ছিল। সরলা আর সুরেন্দ্রনাথ মায়ের মন্দির আর উদ্যান ঘুরেফিরে দেখে নিলেন। মন্দিরের বাইরেকার স্থাপত্যশিল্প লক্ষ্য করে মুগ্ধ হলেন তাঁরা। পরে তাঁরা বেলুড়ে ফিরে এলেন। সরলার সঙ্গে দু'একটা কথা হলো স্বামীজীর। তিনি সুখী হলেন সরলার অন্তরের ভাব ও ভাষা উপলব্ধি করে। পরে নিবেদিতার কাছে মন্তব্য করলেন, সরলা একটি রত্ন। ও অনেক কাজ করবে।

সরলা ও সুরেন্দ্রনাথ স্বামীজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলেন জোড়াসাঁকোয়। দু'দিন পরে সরলা এক পত্র লিখলেন স্বামীজীকে, আপনারা ব্রাহ্মসমাজের পূর্ণ সহানুভূতি লাভ করতে পারবেন যদি আপনারা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তিপূজো ত্যাগ করেন।

পত্রপাঠ করে স্বামীজী দুঃখ প্রকাশ করলেন। নিবেদিতা শুনলেন পত্রের বিষয়বস্তু। তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন এই ধরনের লেখা পড়ে। ভাবলেন, তিনি কত চেষ্টা করেছেন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে রামকৃষ্ণসঙ্ঘের মিলন ঘটাতে। কিন্তু তা সার্থক হলো না। স্বামীজী তো নিরাকার সাধনাকেও সত্য বলে মানেন। মায়াবতী আশ্রমের সন্ন্যাসীদের তিনি নিরাকারের ধ্যান করতে উপদেশ দিয়েছেন। বাগবাজারের বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের কোন পথ নেই। তাই দেখে সুখী হয়েছেন ঠাকুরবাড়ীর লোকজন। অথচ ব্রাহ্মসমাজের গোঁড়া লোকজন তাঁদের জিদ্ আঁকড়ে আছেন। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তিপূজো করবেন না।

এইসব চিন্তা করে নিবেদিতা এলেন স্বামীজীর কাছে। তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

স্বামীজী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, যদি নিশ্চিত জানতুম, মূর্তিপূজো তুলে দিলেই মানুষের কল্যাণ হবে, বিনা দ্বিধায় ওটা উঠিয়ে দিতুম। কিন্তু গভীর দীনতার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী স্মরণ করি, ঈশ্বর সাকার-নিরাকার দুই ই। আবার তা ছাড়াও কিছু। তিনিই কেবল বলতে পারেন আরও কত কি তিনি।

ছাখো মার্গট, যারা একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে জগতে আসে, তাদের কখনও এমন প্রত্যাশা রাখতে নেই যে মানুষ তাদের কথা শুনবে। আবার এ-ও জেনো, যারা মনে করে তারা স্বতন্ত্র, তোমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই তাদের অন্তরে-অন্তরে তারাই আবার সবচাইতে তোমার পা-চাটা। যারা সাকার-পূজো উড়িয়ে দেবার জন্যে বাড়াবাড়ি করে, তারা নিজেদের মন জানে না। যে-ভাবের বিরুদ্ধে নিজেরা মনে-মনে লড়াই করছে, অন্যের মধ্যে তার প্রকাশ দেখে তারা জ্বলে ওঠে। যদি নিজের মন বুঝতো তারা।

স্বামীজীর কথা গভীরভাবে চিন্তা করলেন নিবেদিতা। মনে মনে ভাবলেন, এই সংসারে বিচিত্রভাবের মানুষের কথা। যত দেখি, যত মিশি তত শিখি।

এই সময়ে নিবেদিতার সঙ্গে আলাপ হলো পদার্থবিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে। তিনি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। বয়েস প্রায় চল্লিশ। রাতদিন পঠন-পাঠন আর গবেষণা নিয়ে থাকেন।

প্রথম আলাপেই নিবেদিতা তাঁর সঙ্গে অদ্বৈততত্ত্ব নিয়ে আলাপ করলেন।

জগদীশচন্দ্র হেসে বললেন, অদ্বৈতজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বিজ্ঞানের প্রমাণ চান?

নিবেদিতা বললেন, ঠিক তাই।

জগদীশচন্দ্র প্রশ্ন করলেন, জ্ঞান আর বিজ্ঞানের অনুভব যে এক জিনিস, এ আপনি বিশ্বাস করেন?

নিবেদিতা বললেন, উপনিষদগুলো যে তাই বলে।

এভাবে প্রথম দর্শনেই নিবেদিতার সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো।

জগদীশচন্দ্রের মনে একান্ত ইচ্ছা তিনি পদার্থ এবং উদ্ভিদ বিদ্যা নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাবেন। ওর মধ্যে প্রকৃত সত্যকে খুঁজে

বের করবেন। ইংরাজ সরকার তাঁর কাজে বিশেষ সাহায্য ও সহযোগিতা না করলেও তিনি নিজেই সামান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে নিজের গবেষণাকাজ চালাতে লাগলেন। দীর্ঘ তিন বছর পর তাঁর পরিশ্রমের ফল ফললো। দেশ-বিদেশের বিদগ্ধমহল তাঁর কাজের প্রশংসা করলেন।

নিবেদিতাও জগদীশচন্দ্রের কাজে সাহায্য করলেন। তিনি অনেক দেশীবিদেশী পণ্ডিতজনদের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন জগদীশচন্দ্রের, যাতে তাঁর গবেষণার কাজ সুফলপ্রযুক্ত হয় এবং জীবনের একাকীত্ব-ভাব নষ্ট হয়ে যায়।

জগদীশচন্দ্র ছিলেন সত্যের পূজারী। অনুসন্ধানী মন নিয়ে তিনি সবকিছু বিচার করে দেখতেন। তাঁর কৌতূহলী মন সর্বত্র বিচরণ করে বেড়াতো। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এক চেতনাময় সত্তার অংশ বলে অনুমান করতেন এবং তার প্রমাণও করেছিলেন খানিকটা উদ্ভিদের মধ্যে সাধারণ জীবের লক্ষণ ও প্রতিক্রিয়ার অস্তিত্ব আবিষ্কার করে। পরে তিনি চেয়েছিলেন জড়ের মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে। এই প্রসঙ্গে তিনি একবার নিবেদিতাকে বললেন, জড়ের মাঝেও প্রাণ আছে, আমি দেখেছি। কোনও ভুল নেই। জড়ও চৈতন্যময়। প্রাণ সর্বত্র। এমন কি ধাতুও প্রাণবন্ত। একদিন তার প্রাণকে পাকড়াও করবোই। প্রথমে গাছপালায়, তারপর পাথরেও যে প্রাণ আছে, তা প্রমাণ করবো। আছে, আমি জানি।

জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে মিসেস্ বুলের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে নিবেদিতা বুলকে একটি পত্র লেখেন: 'মহৎ হৃদয়কে কি করে বৃহৎ কর্মে উদ্দীপিত করতে হয় তা তুমি জানো। বসুর কথা ভেবে ছাখো। হৃদয়টি ওর করুণ কোমল, চরিত্র নিখুঁত। ওকে বড় করে তুলতে পারলে তুমি আরও বড় হবে। তুমি ওকে আশ্রয় দাও। স্বামীজীর মত ওকেও তোমার আরেকটি সন্তান বলে মনে

কোরো। জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ বসু। তবু অবিশ্রাম খেটে চলবার আগ্রহ আছে তার সত্যি। শুধু এইটুকু দেশের লোকের কাছে প্রমাণ করতে চায়, যে কোন ইউরোপীয়ানের মত, তারাও ফলিত-বিজ্ঞানে অমিত সাফল্য লাভ করতে পারে।'

এমনিভাবে প্রতিটি মুহূর্তে নিবেদিতা আচার্য বসুর জীবনস্বপ্নকে সফল করে তুলতে ইচ্ছা করলেন। অনেকসময় তিনি বসুর বাড়ীতে ছোট পরীক্ষাগারে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন নানাপ্রকার আলাপ-আলোচনায়। তার মধ্যে মুখ্য আলোচনা ছিল জড়-বিজ্ঞানের সঙ্গে অধ্যাত্মজ্ঞানের মীমাংসাসূত্র আবিষ্কার করা। নিবেদিতা অনুবীক্ষণযন্ত্রের মাধ্যমে খুঁজে বের করতে চাইতেন অণুর মধ্যেও রয়েছে মহাশক্তির ব্যাপ্তি। তিনি 'অনোরনীয়ান্ আবার তিনিই মহতো মহীয়ান'। তিনি সর্বত্র রয়েছেন। তিনি যেমন আছেন জড়ের মধ্যে, তেমনি আছেন চৈতন্যের মধ্যে।

একদিন নিবেদিতা বললেন আচার্য বসুকে, আমায় যা বলছো তা তোমার লিখে ফেলা উচিত। এসব কাজের কথা লিখে রাখা প্রয়োজন।

জগদীশচন্দ্র অনিচ্ছা প্রকাশ করে বললেন, এসব কথা আমার মনের আকাশে বিজলীর চমকের মত। একে আমি রূপ দেবো কেমন করে? আর একে রূপ দিয়েই বা কি হবে? এযে শুধু মরীচিকা।

নিবেদিতা শুনলেন না আচার্যের যুক্তি। তিনি সরল ভাষায় বললেন, আমি তো আছি। আমার কলম অনুগত ভৃত্যের মত তোমার কাজ করবে। মনে করো এ লেখা তোমারই।

এইভাবে নিবেদিতা আচার্য বসুর জীবনস্বপ্নকে সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে অনেকখানি সাহায্য করেছিলেন। কেবল তিনি নিজে সাহায্য করেন নি। তাঁর সঙ্গে আরও দু'দশজন বিদেশিনীকে

এনেছিলেন ডেকে আচার্য বসুর পাশে। তাদের মধ্যে প্রধানা ছিলেন মিসেস বুল অর্থাৎ ধীরামাতা। এই ধীরামাতার সম্বন্ধে নিবেদিতা আচার্য বসুকে বলেছিলেন, তুমি ওকে তোমার মায়ের আসনে বসিও।

আচার্য বসুকে সাহায্য করার জন্যে মিসেস বুলকে চিঠি লেখেন নিবেদিতা, '...আমার মন যেমন জানি তেমনি তোমার মনও জানি। তুমি, আমি আর য়ুম—আমরা বসুদের চারপাশে প্রীতির একটা আতপ্ত পরিবেশ গড়ে তুলবো।'.........

আচার্য বসুর জীবনে নিবেদিতা অনেকখানি ভূমিকা নিয়ে ছিলেন। পরবর্তী জীবনে শ্রীবসু স্বীকার করেছেন, 'শ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে আমি নিবেদিতার অঞ্চলে আশ্রয় নিতুম।'

১৮

মা কালীর সাধনায় নিবেদিতা

অনেকদিন পরে অনেক আত্মবিশ্লেষণ করে নিবেদিতা এবার জানলেন কালীকে। তিনি ছিলেন প্রোটেস্টান্ট ধর্মের মানুষ। তাঁর বিদ্রোহী মন মূর্তিপূজোকে সহজে গ্রাহ্য করে নি। যে নিরাকার, যাঁর মূর্তি এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে রয়েছে, তিনি কিভাবে মূর্তির মধ্যে ক্ষুদ্ররূপে প্রকাশ হবেন? অথচ পরে গুরুর কৃপায় নিবেদিতা কালীর স্বরূপ এবং তাঁর পূজার মাহাত্ম্য বুঝতে পারলেন। তিনি নিজের হৃদয়ে উপলব্ধি করলেন কালীর মূর্তি।

একদিন সুরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন নিবেদিতাকে, মূর্তিপূজোই যদি করতে হয়, এই বীভৎস কালীমূর্তির পূজো করব কেন?

নিবেদিতা বললেন, আমি মূর্তিপূজো করি না। কালী যেমন

আমার বুকে আছেন, তেমনি তোমার বুকেও আছেন। এ-কথা অস্বীকার করা চলে না। এতে এতো আপত্তির কি দেখছো?

এতদিনে নিবেদিতার কাছে এমনি ধরনের কথা শোনবার জন্যে উৎসুক ছিলেন স্বামীজী। এবার তাঁর মনোমত কথা শুনতে পেয়ে খুশীই হলেন। একজন বিদেশিনী নারীর মুখে শক্তির উপাসিকা বাঙালী-কন্যার মত কথা শুনে কোন্ বাঙালী গুরুর প্রাণে আনন্দ না জাগে! অমরনাথ থেকে ঘুরে আসার পর নিবেদিতার মনে দারুণ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল মহাশক্তির বিদ্যমানতা নিয়ে। পরে গুরুর কৃপায় এবং পুনঃপুনঃ মায়ের নাম উচ্চারণ করার ফলে মাতৃশক্তি উপলব্ধি করলেন হৃদয়ের মধ্যে।

একদিন স্বামীজী বললেন নিবেদিতাকে, মার্গট, তোমাকে কালীপূজো সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে সভায়। বাংলার জনসাধারণ তোমার মুখে শক্তি-পূজো সম্বন্ধে কিছু শুনতে চায়।

গুরুর কথা শুনে অবাক হয়ে যান নিবেদিতা। তিনি ভাবলেন, আমার কি শক্তি আছে কালীর সম্বন্ধে কিছু বলার? তবে মা যদি কৃপা করেন তো হবে। এই ভেবে তিনি গুরুর কাছে নিজের ভাব ব্যক্ত করলেন, আমার কি ক্ষমতা আছে গুরুদেব? মা যদি দয়া করেন তবেই হবে।

স্বামীজী বললেন, মা ঠিকই দয়া করবেন। মার নামে দু'হাত ছেড়ে ঝাঁপ দাও না। দেখবে মা তোমাকে ঠিক হাত ধরে গঙ্গা পার করে দিয়েছেন।

গুরুর কাছ থেকে ভরসা পেয়ে নিবেদিতা লিখতে বসলেন 'কালীপূজা' নামে প্রবন্ধ।

তারপর এক শুভদিনে অ্যালবার্ট-হলে কলকাতার নাগরিকদের কাছে নিবেদিতা সেই প্রবন্ধ পাঠ করলেন। হলের মধ্যে তিল-ধারণের জায়গা ছিল না। সকলেই নীরব হয়ে একজন বিদেশিনীর মুখে মা-কালীর মাহাত্ম্য শুনে বিমোহিত হলো। তারা ভাবলে,

স্বামীজীর কৃপা আছে বলেই নিবেদিতার পক্ষে এরকম সম্ভব হয়েছে বক্তৃতা দেওয়া। নিবেদিতা যা বললেন তার সারমর্ম এই যে, বিশ্বসৃষ্টির অন্তর-রহস্যের মূলে রয়েছে শক্তি। সেই শক্তিই হচ্ছে কালী। তিনি সাক্ষাৎ কালরূপিণী। চালাচ্ছেন কালকে। তিনি কল্যাণী—আনন্দময়ী। সন্তানদের সুখ-দুঃখ নিয়ে তিনি লীলা করছেন। তিনি মায়া, আবার মায়াতীত। তিনি সংহারমূর্তি ধরে ধ্বংস করেন, আবার পালিকার মূর্তি ধরে সংসার পালন করেন।

এভাবে বিশ্ব-শক্তি এবং বিশ্ব-প্রকৃতির সার স্বরূপ কালীর পূজো-প্রসঙ্গে বললেন নিবেদিতা।

তাঁর বক্তৃতা শুনে সকলে খুশী হলো। ব্রাহ্ম বন্ধুরাও খুশী হয়ে বললে, তোমার ভাষণটি চমৎকার হয়েছে। ওতে আমাদের বুদ্ধি তৃপ্ত হয়েছে। আবার কেবল প্রাণের সংস্কারবশেই সাড়া দেয় যে সাধারণ শ্রোতা তারাও খুশী হয়েছে। কিন্তু বাস্তব জীবনে তোমার কালীর স্বরূপ কি বলতে পারো?

ঠিক উত্তর দিতে পারলেন না নিবেদিতা। তবে তিনি মনে মনে ভাবলেন, বাস্তবজীবনে কালী-প্রসঙ্গে আর কী-ই বা বলার আছে! কেবল উপলব্ধি করতে হয় তাঁর শক্তি নিজের অন্তরে। এছাড়া আর কোন গতি নেই। এ জিনিস বলা যায় না। কেবল উপলব্ধি করতে হয়। এমন কি যাঁরা উপলব্ধি করেছেন তাঁরাও বলতে পারেন না।

ব্রাহ্ম ভক্তদের ওভাবে বোঝাতে লাগলেন তিনি। তারা কতক বুঝলো আবার কতক বুঝলো না।

এইসময় নিবেদিতার জীবনে এসে উপস্থিত হলো আর এক মহালগ্ন। কালীঘাট মন্দিরের প্রধান পুরোহিত এলেন তাঁর কাছে। এসে বললেন, আমরা ২৮শে মে তারিখে মায়ের মন্দিরে এক সভার আয়োজন করেছি। আপনাকে সেখানে মা-কালী প্রসঙ্গে কিছু বলতে হবে।

প্রথমে কিছু বলতে পারলেন না নিবেদিতা। পরে ধীরে ধীরে বললেন, আমি মায়ের সম্বন্ধে কিবা জানি যে বলবো!

প্রধান পুরোহিত বললেন, যেটুকু জানেন তাই বলবেন আমাদের কাছে।

বিদায় নিয়ে চলে গেলেন পুরোহিত। যাবার সময় নিবেদিতার কাছ থেকে আশ্বাস নিয়ে গেলেন যে, তিনি যাবেন কালীমন্দিরে ২৮শে মে তারিখে।

অসহ্য গরম। নিবেদিতা ঠাণ্ডাদেশের মানুষ। তাই গরমে বেশ কষ্টভোগ করতে লাগলেন। ওদিকে মনের মধ্যে দুশ্চিন্তাও কম ছিল না। তিনি কী-বা বলবেন কালীমন্দিরে গিয়ে। ভাবলেন, এই সময় স্বামীজী যদি কাছে থাকতেন তো বেশ ভাল হতো। তিনি দিতেন আশা ও উৎসাহ।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মে তারিখে নিবেদিতা এমনি ভাবে ভেবে চলেছেন। মনে তাঁর শান্তি নেই। ২৮শে মে এলো। এইদিন সকালে স্বামীজী এলেন নিবেদিতার কাছে। তাঁকে দেখে খুবই খুশী হলেন নিবেদিতা। ভাবলেন, এতদিনে বুঝি কুল পাওয়া গেল।

স্বামীজী নিজের কথা বলতে লাগলেন নিবেদিতার কাছে। তিনিও প্রথম প্রথম শক্তিকে মানতেন না। পরে মেনেছেন। সেই কথাই বেশ ভালভাবে বুঝিয়ে বললেন পরে নিবেদিতাকে, 'এই কালী আর তাঁর যত কাণ্ডকারখানাকে কী অশ্রদ্ধাই না করতুম। আমি তাঁকে স্বীকার করি নি, ছ'টি বছর লড়াই করেছি। পরমহংসদেব আমায় উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর শ্রীচরণে। তবুও এতদিনে বুঝেছি। জানো তো মানুষটাকে সত্যিই ভালবাসতুম। তাতেই জোর পেয়েছি। জানতুম এমন খাঁটি লোক আর কখনও দেখিনি বা দেখবো না। আর জানতুম, তিনি আমায় যেমন ভালবাসেন আমার বাপ-মারও তেমন ভালবাসার সাধ্য নেই।

কিন্তু তিনি যে কত বিরাট, তখনো তা বুঝতে পারি নি। বুঝেছি পরে। যখন আত্মসমর্পণ করলুম তখন……'

নিবেদিতা বললেন, আপনি কিভাবে বিরুদ্ধভাব দূর করলেন?

স্বামীজী বললেন, থাক, সেকথা আমার সঙ্গেই ছাই হয়ে যাবে।…ভয়ানক দূরবস্থায় পড়েছিলুম এই সময়টাতে। মা দেখলেন এই সুযোগে আমায় গোলাম বানাতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক এই তাঁর মুখের কথা, 'তোমাকে গোলাম বানাবো'। ঠাকুর, আমায় সঁপে দিলেন তাঁর শ্রীচরণে।…আশ্চর্য, এর পরে তিনি আর মোটে দু'বছর বেঁচে ছিলেন, আর তার বেশীর ভাগই অসুখে ভুগেছেন। মাত্র ছ'মাস তাঁর শরীরটা ভাল ছিল।……গুরু নানকও এমনি ছিলেন, জানো? তিনিও তাঁর শক্তিসঞ্চয়ের জন্যে একটি শিষ্য খুঁজে বেড়াতেন……তাকে পেলে তবে তিনি দেহ ছাড়তে পারবেন……।

একটু থেমে পুনরায় বললেন স্বামীজী, কোন সন্দেহ নেই, মা শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ আশ্রয় করে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করেছেন। ছাখো মার্গট, ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও এমন এক বিরাট শক্তি আছেন যিনি আপনাকে 'নারী' ভাবনা করেন, তিনিই কালী। এ আমি বিশ্বাস না করে পারি না। আবার ব্রহ্মকেও বিশ্বাস করি। ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নেই। অসংখ্য কোষে মিলে দেহ গড়ে ওঠে, তৈরী হয় একটা মানুষ। অগণ্য মস্তিষ্ক-কেন্দ্রে উৎপন্ন হয় এক চেতনা। সর্বত্রই বহুর মাঝে এক। ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্। আবার তিনিই বহু দেবতা। একেক সময় কী যন্ত্রণাই যে দেন মা! তখন তাঁর কাছে গিয়ে বলি, কাল যদি আমায় এই-এই না দাও, আমি তোমায় দূর করে দিয়ে কেবল ব্রহ্মের কথা বলে বেড়াব।…সেসব জিনিস কিন্তু ঠিক-ঠিক পেয়ে যাই……।

এবার স্বামীজী নিবেদিতার কাছে কালিমায়ের প্রসঙ্গ তুললেন। বললেন, কালীঘাটের পুরোহিতরা তোমার ভাষণের সময় আমায় সভাপতি করতে চেয়েছে। আমি কিন্তু যাবো না। সামলাতে

পারবো না আবেগ। আমাদের পরিবারে বহুপুরুষ ধরে আমরা শাক্ত। কালীঘাটের প্রতিটি ধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র। ও-মাটিতে যে বলির রক্ত তাও পুণ্যময়।···তোমার ভাষণ সম্বন্ধে কতকগুলো কড়া নিয়ম করে দিয়েছি। আসরে কোনও চেয়ার থাকবে না। প্রত্যেককে তোমার পায়ের তলায় মাটিতে বসতে হবে। জুতো বা টুপি ছেড়ে থাকতে হবে। জনাকয়েক নিমন্ত্রিত অতিথির সঙ্গে তুমি সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে।

একটু থেমে স্বামীজী আশীর্বাদ করে বললেন নিবেদিতাকে, মায়ের কথা যে বলে সেই ধন্য। তুমি তাঁর নিত্যদাসী হও মার্গারেট।

নিবেদিতাকে আশীর্বাদ জানিয়ে চলে গেলেন স্বামীজী। ঐ দিনই বিকেলবেলায় এলেন কালীঘাটের প্রধান পুরোহিত। নিবেদিতা তাঁর সঙ্গে খালিপায়ে গেলেন মন্দিরে। মায়ের মন্দিরে সবার উঁচু সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মাতৃপূজা-প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন তিনি : 'আজ বিকেলে আমরা যেখানে মিলেছি, মায়ের যত মন্দির আছে তার মধ্যে এটি সবচেয়ে পবিত্র। বহু যুগ ধরে পুণ্যাত্মারা অন্তরের পিপাসা নিয়ে এসেছেন এখানে। নিবেদন করেছেন তাঁদের আর্তি, তাঁদের কৃতজ্ঞতা। শেষকালে স্মরণ করেছেন মাকে। আমরা এখানে এসেছি মায়ের অর্চনা করতে। এ কথাটি যেন ভুলে না যাই।···যতদিন আমরা অশক্ত, ততদিন মায়ের নামে সব জ্বালা জুড়োয়, হৃদয়ক্ষতে স্নিগ্ধ প্রলেপ পড়ে। এ-অধ্যায় যখন শেষ হয় তখন আত্মাহুতিতে ধন্য হয়েছে বলে গোটা জীবনটাই যেন ছন্দোময় উল্লাসে ভরে ওঠে।······মনে হয় আধ্যাত্মিকতা আর আভিজাত্যের গর্বের মধ্যে একটা বিরোধ আছে। ধর্মের আসন জনসাধারণেরই হৃদয়গুহায়। ধর্মকে মার্জিত রূপ দেওয়া মানেই তাকে বীর্যহীন করা। প্রত্যেকে তার মনের খোরাক পাবে ধর্মে, তবে না। সুতরাং দেবতার উপাসনার রহস্যের মানে যদি

আকাশচারীও হয়, তার প্রতিষ্ঠা কিন্তু হওয়া উচিত এই মাটির বুকেই। সেদিন থাকবে না দ্বৈতবাদ, ভগবানের ভগবত্তাও নয়। সেই দূর ভবিষ্যতে হয়তো এর অন্যথা ঘটতে পারে, কিন্তু আজ নয়। শবরূপী দেবতার বুকেই আনন্দময়ী মায়ের চিণ্ময় নৃত্য-বিলাস···।'

নিবেদিতার বক্তৃতা শুনে সভায় সমবেত মাতৃভক্তগণ আনন্দ প্রকাশ করলে। তারা উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় জয়ধ্বনি করলে নিবেদিতার। মন্তব্য করলে, সাগরপারের একজন শ্বেতাঙ্গিনীর মনে মায়ের সম্বন্ধে এরকম ধারণা হলো কেমন করে? কেউ কেউ আবার বললে, তা হবে না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সান্নিধ্য পেয়ে ও মেয়ে ধন্য হয়েছে। তাইতো ওর এমন শক্তি। তা না হলে কি ওর পক্ষে মায়ের বাড়ীতে আসা সম্ভব হতো, না মায়ের মাহাত্ম্য নিয়ে এমন বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব হতো!

সকলে সমবেতকণ্ঠে বলে উঠলো, জয় মা-কালী কী জয়! জয় ভগিনী নিবেদিতা কী জয়!!

জনসাধারণের কাছ থেকে অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা ও সমাদর পেয়ে অন্তরে খুশী হলেন নিবেদিতা। মনে মনে তিনি মা-কালীকে এবং তাঁর গুরুদেবকে স্মরণ করতে লাগলেন।

এরপর তিনি ফিরে এলেন বাগবাজারে। দিনকয়েক পরে জনৈক বন্ধুকে বললেন, কালী সম্বন্ধে একটা নতুন ভাব জেগেছে মনে। মায়ের পায়ের তলায় শায়িত শিবের ঢুলুঢুলু চোখ দুটি মায়ের দৃষ্টির সঙ্গে মিলেছে কি করে তাই দেখছিলুম। কালী ঐ সদাশিবের দৃষ্টির সৃষ্টি। নিজেকে আড়ালে রেখে সাক্ষীরূপে তিনি দেখছেন দেবাত্মশক্তিকে। শিবই কালী, কালীই শিব। মানুষের মনে বিপুল শক্তির আলোড়ন চলছে। তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে দেবতার এই রূপে—এই কি সত্যি? অর্থাৎ মানুষই দেবতাকে সৃষ্টি করে? তাই ভাবি। বিশ্বের রহস্য কোন্ লাস্যময়ীর লীলাচাতুরির হাল্‌কা ওড়নায় ঢাকা।

১৯

অর্থসংগ্রহে স্বামীজীর সঙ্গে নিবেদিতার বিদেশযাত্রা

লোকে বলে অর্থই অনর্থের মূল। আবার তাদের মুখেই শোনা যায়, অর্থ না হলে কিছু হবার যো নেই। কোন কাজ করতে হলে অর্থের প্রয়োজন। বিশেষ করে জনস্বার্থের খাতিরে কোন বড় কাজে হাত দিলে তো কথাই নেই। এ তো গেল সংসারীদের কথা। যাঁরা সন্ন্যাসী এবং ত্যাগী তাঁরাও যদি জনসেবার কাজে নামেন, তাহলে অর্থের প্রয়োজন হয়। সে অর্থ দেবে জনসাধারণ সাহায্য হিসেবে দানের মাধ্যমে।

স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড়মঠে যে সন্ন্যাসীদল গঠন করলেন দেশের দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের সেবার জন্যে তার জন্যে বেশ কিছু অর্থের দরকার। প্রথম দিকে তিনি এই অর্থের মোটা অংশ পান আমেরিকার শিষ্যের কাছ থেকে। তারপর পান ভারতের রাজা-মহারাজা এবং জনসাধারণের কাছ থেকে। সেই অর্থ দিয়ে মঠের প্রাথমিক কাজ কিছুটা চললো। কিছুদিন পরে সেই স্বল্পসঞ্চিত অর্থও নিঃশেষিত হয়ে গেল। তখন স্বামীজী মহা ভাবনায় পড়লেন। অনেক নবাগত ব্রহ্মচারীদের আদেশ করলেন বাড়ী ফিরে যেতে। এমন কি তাঁর মানসকন্যা নিবেদিতাকে পর্যন্ত বললেন মঠ ছেড়ে চলে যেতে।

কিন্তু শক্তিময়ী নিবেদিতা স্বামীজীর কথা শুনে ঘাবড়ালেন না। তাঁর কাছে সামান্য অর্থ সঞ্চিত ছিল, তাই দিলেন স্বামীজীর হাতে তুলে মঠের কাজে সাহায্য করতে। একদিন তিনি সাহস করে বললেন স্বামীজীকে, ‘স্বামীজী, আমার ছশো কুড়ি টাকা জমানো আছে। ওটা আমি ছুঁইনি। মনে হয়, কাজ করার যথেষ্ট

সামর্থ্য আমাদের আছে। না হয়, একসঙ্গে সবাই ডুববো। আপনি যে ভাবেন মাথা উঁচু রেখে বাঁচতে হবে এ তো লোক-দেখানো ব্যাপার। আমাদের লোককে দেখাবার কিছু নেই…।

'আমার কি করে চলবে তা মোটেই ভাববেন না স্বামীজী। আমার যা আছে তাতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমায় চালাতে দিন। এমনভাবে কাজ করে যাবো যেন ক্ষয়-ক্ষতির কোনও সম্ভাবনাই নেই। কেন জানিনা, মনে হয় যা করছি ঠিকই করছি। শাশ্বত কালের জন্যে কাজ করে যাচ্ছি……।'

এরপর মিস্ ম্যাকলাউডকে স্বামীজীর কথা জানিয়ে চিঠি লিখলেন নিবেদিতা, 'আমি স্বামীজীর একটা বোঝা হয়ে উঠেছি। টাকার চেষ্টায় বার হবো ঠিক করেছি। বছরে একশো পাউণ্ড হলেই পাঁচটি ছেলে-মেয়ের একটা বিদ্যালয় চলতে পারে। আমার সংকল্প স্থির। জীবনে এই প্রথম সাফল্যের একটা সুযোগ সত্যি সত্যি পেয়ে গেছি……।'

চিঠিটা ডাকযোগে পাঠালেন মার্গারেট।

পত্রটি পাঠ করার পর সবকিছু জানতে পারলেন মিস্ ম্যাকলাউড। তিনি আমেরিকা হতে লিখলেন, স্বামীজীকে নিয়ে এখনই চলে এসো এখানে। অর্থের জন্যে কোন ভাবনা নেই।

চিঠি পড়ে নিবেদিতার মন খুশিতে মেতে উঠলো। তিনি হাসিমুখে চলে এলেন স্বামীজীর কাছে। দেখালেন মিস্ ম্যাকলাউডের পত্রটি।

স্বামীজী এবার তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। অবশেষে তিনি সমুদ্রপাড়ি দিয়ে পশ্চিমদেশে যাবার বাসনা করলেন। কারণ তাঁর এখন অর্থের প্রয়োজন। যেমন করে হোক রামকৃষ্ণমঠকে টিকিয়ে রাখতে হবে।

গুরুর নাম স্মরণ করে স্বামীজী নিবেদিতাকে নিয়ে ১৮৯৯

২০শে জুন জাহাজযোগে রওনা হলেন পাশ্চাত্য দেশের দিকে। তাঁদের সঙ্গে রইলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ।

জাহাজে বসে স্বামীজী ও নিবেদিতা অনেক কাজ করলেন। স্বামীজী লিখলেন কয়েকটি প্রবন্ধ আর নিবেদিতা লিখতে লাগলেন গতদিনের কাশ্মীর-ভ্রমণের স্মৃতিচিত্র।

এরপর ভারতবর্ষের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হলো নিবেদিতার সঙ্গে স্বামীজীর। স্বামীজী বললেন, ভাবাবেগকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় না দিয়ে নিজেকে জানবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করো। এই হলো আসল রহস্য। আরেকটা মস্ত কথা হলো, কারও নকল করো না, মাথা ঘামাতে যেও না। কারও সঙ্গে পাল্লা দেবারও দরকার নেই। পরকেও স্বাধীনতা দিতে পারো এমন মানুষ হয়ে ওঠো।

স্বামীজীর কথা শুনে খুশী হলেন নিবেদিতা। এমনি অনেক উৎসাহব্যঞ্জক উপদেশ-নির্দেশ তিনি আগেও পেয়েছেন স্বামীজীর কাছ থেকে। তিনি নিজেকে অতিশয় শক্তিমান বোধ করতে লাগলেন। বান্ধবী মিস্ ম্যাকলাউডকে লিখলেন চিঠি, যে-কাজে হাত দিয়েছি তার জন্যে বাঁদীর মত খাটবো। একটা অসীম শক্তি অনুভব করছি নিজের মধ্যে।

৩১শে জুলাই ওদের নিয়ে জাহাজ টিলবেরী ডকে এসে ভিড়লো। নিবেদিতার মা মেরি নোবল স্বাগত জানালেন স্বামীজীকে।

অতঃপর বিবেকানন্দ স্বামী তুরীয়ানন্দ আর নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে মেরি নোবলের বাড়ীতে এসে উঠলেন। কিন্তু ক্ষুদ্র বাড়ীতে স্থানাভাব হওয়ার দরুন মেরি নোবলের বাড়ীর কাছেই একটা ঘর ভাড়া করা হলো। ঘরটি ভাড়া নিলে মে। সেখানে রইলেন স্বামীজী আর তুরীয়ানন্দ। এইসময় স্বামীজী বড় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে সেবা করার জন্যে তাঁর দু'জন আমেরিকান

শিষ্যা মিসেস্ ফ্রাঙ্ক আর ক্রিষ্টিন্ গ্রিনষ্টিডেল এলেন লণ্ডনে। তাঁরা মেরি নোবলের বাসার কাছেই একটা বাসা ভাড়া করে রইলেন।

লণ্ডনের পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে পুনরায় দেখাসাক্ষাৎ হলো নিবেদিতার। ওদের মনে ও জীবনে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন নিবেদিতা। মিঃ স্টার্ডি বিয়ে করেছেন।

মা, ভাই ও বোনের সঙ্গে আলাপ করলেন নিবেদিতা। বোন বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। তাই নিবেদিতাকে ততোদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো।

নিবেদিতার ভাই ও বোন স্বামীজীর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ করলে। ওরা স্বামীজীর মুখে গল্প শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল। নিবেদিতাও ভাই ও বোনের কাছে ভারতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন।

একদিন রিচমণ্ড স্বামীজীকে বললে, আপনার সঙ্গে আলাপ করে শান্তি পেলুম। কিন্তু আমার মনে একটা দুঃখু দানা বেঁধে উঠেছে।

স্বামীজী বললেন, কিসের দুঃখু ?

রিচমণ্ড বললে, দিদি এমন রীতিনীতি চালু করেছে যে আমাদের বাড়ীতে মাংস আসা বন্ধ হয়ে গেছে।

রিচমণ্ডের কথা শুনে খানিকটা হাসলেন স্বামীজী। বললেন, নিবেদিতা পরিবারের মধ্যে এ নিয়ম চালিয়েছে বুঝি ?

এই কথা বলে স্বামীজী সেইদিনই রিচমণ্ডকে নিয়ে গেলেন রেস্তোরাঁয়। তারপর একটা সিককাবাব আনিয়ে বললেন, খাও বাবা, এ তোমার জন্যেই আনিয়েছি। নিবেদিতা তোমার যে অধিকার হরণ করেছে, তা আমি আবার ফিরিয়ে দিলুম।

স্বামীজীর কাছ থেকে এরকম ভালবাসা পেয়ে অবাক হয়ে গেল রিচমণ্ড। ভাবলে, স্বামীজী হচ্ছেন যীশুর অবতার। এমন মানুষ তিনি আর কখনো দেখেন নি।

লণ্ডনে বেশীদিন রইলেন না স্বামীজী। দু'জন আমেরিকান শিষ্যের সঙ্গে ১৭ই আগস্ট লণ্ডন ত্যাগ করলেন। রওনা হলেন আমেরিকা অভিমুখে। আসবার সময় নিবেদিতাকে বললেন, মার্গট, আমি চললুম। তুমি বোনের বিয়ে দিয়ে পরে যেও আমেরিকায়।

এই বলে আমেরিকায় পাড়ি জমালেন স্বামীজী। নিবেদিতা লণ্ডনে রয়ে গেলেন বোনের বিয়ের অপেক্ষায়।

ক্রমে সেপ্টেম্বর মাস এলো। ধুমধাম করে মের বিয়ে হয়ে গেল। এই বিয়েতে সাদা আলপাকার পোশাক পরে নিত্‌-কনে সাজলেন নিবেদিতা।

বোনের বিয়ের পর নিবেদিতা লণ্ডন থেকে ট্রেনে করে চলে এলেন স্কটল্যাণ্ডে। ওখান থেকে জাহাজ ধরলেন আমেরিকা যাবার উদ্দেশ্যে।

বাড়ী থেকে যাত্রা করবার সময় নিবেদিতা দেখলেন, মেরি নোবলের দু'চোখ অশ্রুপূর্ণ। তিনি বুঝলেন মায়ের অন্তর-ব্যথা। তখন তিনি ধীর পদক্ষেপে মায়ের কাছে এসে বললেন, আমি আর তো ঘরে আসতে পারি না। আমাকে এখন বেরুতে হবে বিশ্বমায়ের কাজ নিয়ে।

মেরি নোবল বুঝলেন তাঁর বীরাঙ্গনা কন্যার জীবনব্রত। গর্বে তাঁর বক্ষস্থল স্ফীত হয়ে উঠলো। তিনি কন্যাকে আশীর্বাদ জানালেন ভাবী শুভ ও মঙ্গলময় জীবনের জন্যে।

নিউ ইয়র্ক বন্দরে নামলেন নিবেদিতা। বন্ধুরা তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন। পরে তাঁকে স্টোনরীজের গাড়ীতে তুলে দিলেন। ওখানে স্বামী বিবেকানন্দ মিস্ ম্যাকলাউডের বড় বোন মিসেস্ লেগেটের বাড়ীতে রয়েছেন। ২০শে সেপ্টেম্বর নিবেদিতা এলেন 'রিজলী-ম্যানর'-এ।

মিসেস্ লেগেটের বাড়ীর নাম রিজলী-ম্যানর। সেকেলে ধাঁচের বিরাট অট্টালিকা। বাড়ির কাছে হাডসন নদী।

চারদিকের প্রাকৃতিক পরিবেশ অতিশয় মনোরম। মিসেস্ লেগেটের আর এক নাম 'লেডি বেটি'। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে এই নামেই ডাকতেন। তিনি খুব মিশুকে রমণী ছিলেন। তাঁর বাড়ীতে অধিকাংশ সময় বিশিষ্ট গুণী-জ্ঞানী অতিথি-অভ্যাগতদের সমাবেশ হতো। মাঝে মাঝে মজলিস বেশ জোরদার হতো।

লেডি বেটি স্বামীজী, মিসেস বুল আর নিবেদিতাকে কাছে পেয়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলেন। তাঁর মেয়েরাও স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ করলে। ঐসময় ক্রিস্টিন গ্রীনস্ট্রিডেল ও লেডি বেটির কয়েকজন বন্ধুও এলেন লেডি বেটির সঙ্গে দেখা করতে। সকলে মিলে সেই সময়টা বেশ আনন্দের মধ্যে কাটতে লাগলো। স্বামীজী তখন বহুমূত্ররোগে ভুগছিলেন। তবু তিনি সকলের সঙ্গে প্রাণখোলা আলাপ শুরু করে দেন। এইসময় শিকাগো আর বোস্টনের কয়েকজন অনুরাগীর কাছ থেকে চিঠি পেলেন স্বামীজী। তারা জানতে চেয়েছে নিবেদিতার কথা। স্বামীজীও তাদের উত্তর লিখে জানালেন, নিবেদিতা ভারতের কাজের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

স্বামীজী নিবেদিতার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে লাগলেন। নিবেদিতা যে কাজ আরম্ভ করেছে তা যাতে নির্বিঘ্নে শেষ করতে পারে তার জন্যে তিনি দিনরাত তাঁকে আশীর্বাদ জানাতেন। নিবেদিতাও গুরুর আশীর্বাদ মাথায় করে নিয়ে নিজের ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যে তৎপর হতেন।

ইদানীং স্বামীজীর শরীর আর মন অন্যরকম হয়ে যেতে লাগলো। বিশেষ করে এমনি উদাসীন হয়ে পড়লো যে নিবেদিতা ভাবতে লাগলেন, এবার বুঝি তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করবেন। তিনি আগে শুনেছেন বেলুড়মঠের সন্ন্যাসীদের কাছে স্বামীজীর কোষ্ঠীর কথা। তিনি নাকি আর মাত্র তিন বছর বেঁচে থাকবেন।

সুতরাং এইপ্রকার চিন্তা তাঁর চিত্তকে অধীর করে তুললো। তাঁর

মনও উদাসীন হয়ে গেল। গুরু বুঝতে পারলেন তাঁর মনের খবর। তিনি একদিন বললেন, তোমার মনটা যেন কেমন কেমন লাগছে।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন নিবেদিতা, ঠাকুর, একটা গভীর শান্তিতে সব তলিয়ে যেতে চাইছে। কি পাবো জানিনা কিন্তু আমার বিশ্বাস টুটবে না। এবার সময় হয়েছে আমার ব্রতের কাজে এগিয়ে যাবার। আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছি তা সিদ্ধি হবেই। আপনি কেবল আমাকে আশীর্বাদ করুন।

এই কথা বলে নিবেদিতা হেঁটমুখে দাঁড়িয়ে থাকলেন স্বামীজীর সামনে।

স্বামীজী অশ্রুপূর্ণ লোচনে কেবল বললেন, শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। আমার শান্তি তোমার মাঝে। তাকে সার্থক করে তোলার দায়িত্ব তোমার।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় নিবেদিতা বেড়াতে বেরুলেন মিস্ ম্যাকলাউডের সঙ্গে। ফিরে আসতেই স্বামীজী তাঁর হাতে তুলে দিলেন একটি কাগজ। তাতে লেখা রয়েছে দু'টি লাইন গদ্য আর একটি কবিতা ঃ

'এই শান্তি, এই তোমায় দিলুম। আমার দিনও কাটলো এই শান্তির মাধুরীতে। এই নাও আমার আশীর্বাদ।'

তারপরই শুরু হলো নিম্নলিখিত কবিতাটি ঃ

'ঐ দেখ, প্রমত্ত বেগে আসছে সে।
সে শক্তি, তবুও সে শক্তি নয়······
আঁধারের বুকে সে আলো ;
আবার চোখ-ধাঁধানো আলোতে কালের ছায়া।
সে যেন নির্বাক সুখ,
বোধের অতীত গভীর দুঃখ যেন সে······
প্রাণের চাঞ্চল্যহীন অমৃত জীবন সে,
সে যেন শাশ্বত অশোক মরণ।

সে সুখ নয়, দুঃখ নয় ;—
অথচ দুয়ের মাঝখানে ;
সে রাতের আঁধার নয়, ভোরের আলোও নয়,—
অথচ দুয়ের সেতু।
সঙ্গতের সুরেলা বিরাম সে
দেবশিল্পীর তুলির টানে যতির ছন্দ···
কোলাহল আর বাসনার প্রমত্ততার মাঝে
সে গভীর মৌন, হৃদয়ের নীরব প্রশান্তি।
মাধুরী সে, কিন্তু কেউ তাকে ভালোবাসেনি ;
সে প্রেম, কিন্তু চলার পথে সঙ্গহীন।
সে যেন না-গাওয়া গান একখানি,
যেন সকল জানার বাইরে জানা।
'দুটি জীবনের মাঝখানে সে মরণ যেন,
দুটি নির্ঝরের ছন্দ দোলায় বিরতি······
সে যেন পরম শূন্যতা, যার হৃদয় হতে সৃষ্টির উদয়,
আবার যার হৃদয়েই তার লয়।
এক ফোঁটা চোখের জল চলেছে তারই সন্ধানে,
একটুখানি হাসির আভা বিছিয়ে দেবে বলে···
এইতো জীবনের শেষ বন্দর,
এই শান্তিই তো তার আপন ঘর।'

রিজলী-ম্যানরে গুরুগম্ভীর পরিবেশে বেশ কয়েকদিন ধরে স্বামীজী নিবেদিতাকে উপদেশ-নির্দেশ দিতে লাগলেন। আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হবার প্রেরণা জুগিয়ে স্বামীজী বললেন, কী মিষ্টি, কী সুন্দর! এসব বাঁধাবাঁধি গৎ চলবে না, আর অনবরত এই বাইরের দিকে নজর। ভাবুকতা ছেড়ে নিজেকে জানো। নিজেকে যখন জানতে পারবে তখন আকাশ হতে বজ্রের মত ভেঙে পড়বে দুনিয়ার ওপর। যারা বলে 'আমার কথা কি কেউ শুনবে' তাদের

ওপর আমার কোনও আস্থা নেই। কিছু বলবার মত পুঁজি যার আছে তার কথা না শুনে ফিরিয়ে দিতে দুনিয়া এ পর্যন্ত পারেনি। নিজের শক্তিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। এ করতে পারবে? পারবে তুমি? যদি না পারো তো হিমালয়ের শিখরে গিয়ে শিখে এসো।' ..

স্বামীজীর কথা শুনে মনে মনে শক্তি পেলেন নিবেদিতা। নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে একা একা পথ চলবার ইচ্ছা জাগলো তাঁর।

এইসময় তিনি চলে এলেন শিকার কুঠিতে। সেখানে কয়েকদিন নির্জনে থেকে Kali the mother রচনাটি লিখতে লাগলেন। মহাকালীর কাছ থেকে শক্তি ভিক্ষা করে তাঁর সম্বন্ধে লিখলেন।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বড়দিনের সময় মা-কালীর সম্বন্ধে একটি গল্প রচনা করেন নিবেদিতা। তার নাম The Story of Kali বা মা-কালীর কাহিনী। এটি Kali the mother নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। মিসেস্ লেগেটের শিশুকন্যার উদ্দেশ্যে এই গল্পটি রচিত হয়। গল্পটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি:

'খুকুমণি, ছেলেবেলার সবচেয়ে আগেকার কোন্ কথাটি তোমার মনে পড়ে বলত? মায়ের কোলে শুয়ে, তাঁর মুখের দিকে চেয়ে হাসতে—সেই কথাটি নয় কি?

'মায়ের সঙ্গে খুকুর লুকোচুরি খেলা। মা যেই চোখ বন্ধ করেন, খুকু তাঁর চোখের আড়ালে; আবার তিনি যখন চোখ খোলেন, অমনি দেখতে পান তাঁর খুকুকে।......ঈশ্বর এই জননীর মত। তিনিই মা, মহামায়া। তিনি এত বিরাট যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর ক্ষুদ্র সন্তান। জগন্মাতা চোখ বন্ধ রেখে তাঁর সন্তানের সঙ্গে খেলা করেন। আর সারাজীবন ধরে আমরা এই বিশ্বজননীর চোখ খুলে দেবার চেষ্টা করি। যদি কেউ তাঁর চোখ দিয়ে ক্ষণকালের জন্যে তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মেলাতে পারে, তবে সেই মুহূর্তে সে

সকল রহস্য অবগত হয়, শক্তি, জ্ঞান ও প্রেমে তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়।

'...এই বিশ্বজননীর চোখ যখন বন্ধ থাকে, তখনই আমরা তাঁকে বলি মা-কালী।

'কিন্তু সত্যিই মায়ের চোখ বন্ধ থাকে না। আমাদের চারদিকে নিবিড় অন্ধকার। তাই মনে হয় তিনি চোখ ঢেকে আছেন। কিন্তু যে মুহূর্তে তুমি কেঁদে উঠবে, মা তখনই তাঁর সুন্দর, করুণা-ভরা দৃষ্টি তোমার দিকে মেলে ধরবেন। আর সেই মুহূর্তে তুমি যদি খেলা বন্ধ করে 'কালী' 'কালী' 'কালী' বলে তাঁর বুকে তোমার ছোট হাতখানা ঢেকে রাখতে পার তবে তাঁর হৃদয়ের স্পন্দন শুনতে পাবে।

'তুমি কি ক্ষণেকের জন্যে খেলা বন্ধ করে ছোট হাত দু'খানি জুড়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে বলবে না—'মা-কালী, একবার আমার দিকে তাকাও।'

'মা যখন লুকিয়ে থাকেন, তখনও খুকুর প্রতি তাঁর অপার স্নেহ। কালী-মা ঠিক এই রকম। তাঁর চোখ যদি দীর্ঘকাল ধরে বন্ধ থাকে তবু আমাদের ভয় নেই। তাঁর মুখে সবসময়ে হাসি লেগে আছে। একদিন তাঁর অবকাশমত যখন সেই খেলা সাঙ্গ করবেন, তখন তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে আমাদের দৃষ্টির মিলন ঘটবে, আর তখনি আমরা ইহজগৎ থেকে দূরে চলে যাবো—অসীমের আর এক প্রান্তে।'

পাঁচ দিনের দিন স্বামীজী এলেন নিবেদিতার কাছে। নিবেদিতা গুরুকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানালেন। পরে স্বামীজী নিবেদিতাকে আশীর্বাদ জানিয়ে কালী-সাধনার মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণের কী রকম দৃঢ় বিশ্বাস ছিল প্রত্যেক অবতারই প্রকাশ্যে বা গোপনে কালী উপাসনা করেন। না-হলে তাঁরা শক্তি পাবেন কোত্থেকে? শিব আর কালী তাঁদের আরাধ্য দেবতা। শ্রীরামকৃষ্ণ

দেখতেন, তাঁর ভেতর থেকে লম্বা সাদা একটা সুতো বেরিয়ে আসছে। সুতোটার এক প্রান্তে একটা জ্যোতিঃপিণ্ড। তারপর এই পিণ্ডটা ফেটে যেতো। ঠাকুর দেখতেন তার মধ্যে মা বীণাপাণি। মা বীণা বাজান আর সেই সুর পশু-পাখি জীব-জগতের রূপ ধরে থরে-থরে সব গুছিয়ে ওঠে। মা যখন আর বাজান না, সব মিলিয়ে যায়। তারপর আলোটা গোটাতে-গোটাতে আবার জ্যোতিঃপিণ্ডে রূপ নেয়। সুতোটাও ছোট হতে-হতে তাঁর মধ্যে এসে মিলিয়ে যায়···।

এরপর স্বামীজী নিবেদিতার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। যাবার আগে তিনি পুনরায় তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, এখন বুঝেছি, শিবই পরম গুরু। জ্ঞানবৃক্ষের মূলে যোগারূঢ় হয়ে তিনি শিক্ষা দেন, অজ্ঞান ধ্বংস করেন। তাঁকেই সর্ব কর্ম সমর্পণ করতে হবে। নইলে সুকৃতিও বন্ধন হয়ে ওঠে, তা হতেও কর্মের সৃষ্টি হয়। নিত্যবুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পুরুষই শিব। জগতের হলাহল পান করেন বলেই তিনি নীলকণ্ঠ। অনায়াসে কালকূট জীর্ণ করেন এমন মহাপ্রাণ শুধু তিনিই।······জীবনের তারুণ্যকে উৎসর্গ করা কী যে কঠিন! বৃদ্ধবয়সে আত্মত্যাগ করতে আসে যারা, তারা নিজেদের মুক্তির পথ সাফ করে বটে, কিন্তু অন্যের গুরু হতে পারে না। যৌবন-মধ্যাহ্নে যে নিজের জীবন-ডালি দিতে পারে সেই ধন্য, সেই তো সদ্‌গুরু।

আর দু'দিন পরে স্বামীজী নিবেদিতার নির্জনবাসের মেয়াদ শেষ করতে বললেন। তারপর নিবেদিতাকে উদ্দেশ করে বললেন, যে-শান্তি পেয়েছ তাতেই মহিমময়ী হয়ে ওঠো। এবার এসেছে কাজের সময়। শক্তি-স্বরূপিণী মা সর্বদা তোমার সঙ্গে রয়েছেন। তাঁকে জাগিয়ে তোল। তাঁকে ডাকো, দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা। মা দশভুজা মূর্তিতে দুর্জয় প্রহরণ ধরে দানব দলন করবেন। তোমায় শক্তি দেবেন।

কথাটি শেষ করে স্বামীজী ভারতীয় সাধুদের সাধনার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলেন নিবেদিতার সঙ্গে।

ওদিকে শরৎকাল শেষ হতে না হতেই রিজলী ম্যানরে অতিথিরা একে একে বিদায় নিলেন। স্বামীজী নিজেকে বড় নিঃসহায় বোধ করতে লাগলেন। তাঁর অন্তরে উপলব্ধি করতে লাগলেন তীব্র অনুভূতি। ভাবলেন, তিনি এতদিন ধরে যেসব কাজ করে এসেছেন সেসবই কি ব্যর্থ হলো? নৈরাশ্য-বেদনায় ভেঙে পড়লেন স্বামীজী। নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করলেন, এ আমি কোথায় রয়েছি? এখানে এখনও কেন আছি? হে রামকৃষ্ণ, আমায় তুমি নাও। তোমার পাদপদ্মই যে জীবের একমাত্র আশ্রয়। এ-শরীর ভেঙে পড়েছে। কঠিন তপস্যায় হোক এর পতন। দিনে দশহাজার প্রণব জপ করবো। হিমালয়ের বুকে গঙ্গার তীরে প্রায়োপবেশন করে বলবো "হর হর ব্যোম্ ব্যোম্!" নামটা বদলে ফেলব, কেউ আমায় চিনতে পারবে না। আবার সন্ন্যাস নেবো, আর লোকালয়ে থাকবো না। যেদিন থেকে আমার প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেদিনটাকে শতবার অভিসম্পাত করি……।

অসুখের যাতনায় স্বামীজীর শরীর দিন দিন ভেঙে পড়তে লাগলো। একদিন তিনি বললেন ম্লেচ্ছের দল, আমার সব তোদের জন্যে খুইয়েছি। আমার আর কিছুই নেই।

একদিন তিনি নিবেদিতাকে বললেন, আর কতদিন এখানে মাটি কামড়ে থাকবে বলো দেখি? কবে যাবে? কাজে হাত দেবে কবে?

নিবেদিতা বললেন, আপনার স্পষ্ট নির্দেশ পেয়েই আমি এখানে এসেছি। আবার আপনি যখন যেতে বলবেন তখনই যাবো।

এরপর নিবেদিতা শিকাগোয় ফিরে যাবার জন্যে তৈরী হলেন। স্বামীজী বললেন, আমার যদি তোমার মত স্বাস্থ্য আর শক্তি থাকতো আমি ছুনিয়া জয় করতুম। তুমি ক্ষত্রিয়াণী। জানো,

আমরা এক গোত্রের লোক? তুমি ব্রাহ্মণ নও। কৃচ্ছ্র তপ তোমার নয়। কাজ করো, লড়ে যাও। আর যে-কোনও অবস্থায় মনে রাখবে তুমি স্বাধীন। তোমায় সবরকম স্বাধীনতা আমি দিয়েছি। অন্তরের প্রেরণাকে গভীরভাবে অনুভব করো। তারপর আর কিছুরই তোয়াক্কা রেখো না। মনে রেখো, তুমি শুধু মায়ের দাসী। তিনি যদি তোমায় কিছুই না দেন, কৃতার্থ হয়ে ভেবো, তোমায় তিনি কী মুক্তিই দিয়েছেন। আমায় যদি অমন মুক্তি দিতেন তিনি?

স্বামীজী নিউ ইয়র্কে ফিরে যাবার আয়োজন করতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে মিসেস্ বুলও যেতে চাইলেন। স্বামীজী তাঁকে এবং নিবেদিতাকে মাতৃশক্তি সঞ্চার করলেন। এই প্রসঙ্গটি নিবেদিতা মিস্ ম্যাকলাউডকে লেখা এক পত্রে জানালেন: 'সূতী পোশাকটা আলখাল্লা আর উড়ানির মত করে ধীরামাতার কোমরে জড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আজ থেকে তুমি সন্ন্যাসিনী।" তারপর আমাদের দু'জনের মাথায় হাত রেখে বললেন, "পরমহংসদেব আমায় যা-কিছু দিয়েছিলেন সবই তোমাদের দিয়ে দিলুম। একটি নারীর কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি তা তোমাদের দুজনকে দিলুম—দিলুম নারীকেই। এ নিয়ে যা পারো করো। নিজেকে আর বিশ্বাস করি না। কাল যে কি করবো ঠিক নেই আমার। হয়তো সব ভণ্ডুল করে দেবো। মা নারী,—তাঁর কাছ থেকে যে-শক্তির উত্তরাধিকার পেয়েছি নারীরাই তা ধারণ করবার যোগ্য। মা কে বা কি, তা আমি জানি না। তাঁকে দেখিনি কখনো। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখেছেন, এমনি করে ছুঁয়েছেন তাঁকে (আমার হাতটা ছুঁয়ে দেখান)। কে জানে হয়তো তিনি বিদেহিনী মহাশক্তি। যাহোক, আমার বোঝা আজ তোমাদের কাঁধে চাপালুম। আমি শান্তিতে থাকতে চাই। আজই সকালে মনে হচ্ছিল পাগল হয়ে যাবো। দুপুরের খাওয়ার আগে শুতে

গিয়ে কেবলই ভেবেছি। তারপর এই বুদ্ধি মাথায় এলো। এতো মনটা খুশী হলো তাতে! যেন মুক্তি পেয়ে গেলুম। এতদিন যে বোঝা বয়েছি আজ তা নামাতে পারলুম……"

'ঠিক এই কথাগুলিই বলেছিলেন কি? মনে তো হয়। যতদূর মনে আছে, তখন তিনটের কাছাকাছি কিংবা আরেকটু পরে হবে! দিনের আলো আছে তখনও।……আমাদের দুজনেরই তখন তোমার কথা মনে পড়েছে। য়ুম, এমনি করে একটা অপরূপ কিছু ঘটে গেল জীবনে। সন্ন্যাসিনী সারা আর আমার জীবন পাল্টে গেল সেই মুহূর্তে।'

স্বামীজী সারা বুল ও নিবেদিতাকে আশীর্বাদ জানালেন। নিবেদিতা অনুভব করলেন, স্বামীজী তাঁকে যেন তাঁর সমস্ত শক্তি দান করেছেন।

এরপর নিবেদিতা ও সারা বুলের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্যে স্বামীজী তাদের কাঁধে হাত দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে চললেন। যেতে যেতে হেসে বলতে লাগলেন, আবার আমি শুকদেব হয়েছি। সেই কোন যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ আমায় ঐ নাম দিয়েছিলেন, মায়ের পায়ে আমায় সঁপে দেবার আগে। শুক চিরকালের দস্যি ছেলে। জগৎকে দেখে কেবল হাসেন। অথচ তিনি মায়ের ভক্ত। আমি তাঁর মত মায়ের আনন্দ-কাননে খেলা করে বেড়াচ্ছি।

স্বামীজী নিবেদিতার ভবিষ্যৎ ভ্রমণসূচী জেনে নিলেন। বিনাওয়াটার স্টেশনে এসে ওঁরা পৃথক হয়ে গেলেন।

স্বামীজী নিবেদিতার কাছ থেকে 'দুর্গা দুর্গা' বলে বিদায় নিলেন এবং সেইসঙ্গে নিবেদিতাকে বললেন, কোনও কাজ আরম্ভ করবার আগে বা কোথাও যেতে হলে সবসময় 'দুর্গা দুর্গা' বলবে মার্গট। তাহলেই তোমার সব বিপদ কেটে যাবে।

গুরুর কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করে নিবেদিতা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করলেন। প্রথমে ৭ই নভেম্বর

নিবেদিতা এলেন শিকাগোয়। ৬ই নভেম্বর তিনি মিস্ ম্যাথিউর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বালক-বালিকাদের কাছে বক্তৃতা দেন। ১৭ই নভেম্বর মিশনারী বোর্ড কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে 'ফ্রাইডে ক্লাবে' 'ভারতীয় নারীগণের অবস্থা' প্রসঙ্গে বক্তৃতা দেন।

২০শে নভেম্বর মিস্ অ্যাডামস্-এর উদ্যোগে হালহাউসে 'ভারতে ধর্মজীবন' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

১লা ডিসেম্বর হালহাউসে আর্ট অ্যাণ্ড ক্র্যাপট অ্যাসোসিয়েশানে বক্তৃতা করেন নিবেদিতা। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'ভারতের প্রাচীন শিল্পকলা।' ঐ সময় স্বামীজীর সঙ্গে নিবেদিতার সাক্ষাৎ হলো।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই জানুআরি শিকাগো ত্যাগ করলেন নিবেদিতা।

শিকাগো হতে নিবেদিতা গেলেন ডেট্রয়েট। অ্যান আরবর্, ক্যান্সান সিটি, মিনিয়া পোলিস প্রভৃতি স্থান হতে তিনি আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা পেলেন। অনেকে ভারতে এসে নিবেদিতাকে সাহায্য করতে চাইলেন। আমেরিকাবাসীদের কাছে নিবেদিতা তাঁর ভারতে কাজের কথা ব্যাখ্যা করলেন। তিনি কিভাবে এবং কেন হিন্দু হলেন একথাও ওদেশে প্রচার করলেন।

তিনি বললেন, আমেরিকায় যেমন রয়েছে মিশনারীদের বিদ্যালয়, ভারতেও তিনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাবের আদর্শে। তার জন্যে তিনি সাহায্য চান পাশ্চাত্য-বাসীদের কাছ থেকে।

নিবেদিতাকে সাহায্য করার জন্যে ওখানে একটা সাহায্য-সমিতি খোলা হলো। তার নাম 'পারস্পরিক-সাহায্য-সমিতি।' মিঃ লেগেট হলেন ঐ সমিতির সভাপতি। মিস্ ম্যাকলাউড, মিসেস্ বুল আর তাঁদের বন্ধুরা হলেন পৃষ্ঠপোষক।

নিবেদিতা তাঁর বিদ্যালয়ের আদর্শ ব্যাখ্যা করে প্রচুর পুস্তিকা

প্রকাশ করলেন। সেগুলি প্রচার করলেন আমেরিকানদের উদ্দেশ্যে যাতে তাঁরা তাঁর বিদ্যালয়ের আদর্শ বুঝতে পারেন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে নিবেদিতা পুনরায় ফিরে এলেন শিকাগোয়। তারপর মে মাসে আসেন জ্যামাইকা শহরে।

নিবেদিতার কাজ দেখে সন্তুষ্ট হলেন স্বামীজী। ভাবলেন, যার জন্যে নিবেদিতা সুদূর পাশ্চাত্যভূমিতে এসেছেন তা এতদিনে সার্থক হতে চলেছে। তিনি নিবেদিতাকে লিখলেন, 'আদরিণী নিবেদিতা, প্রাণ ঢেলে তোমাকে আশীর্বাদ করছি। কোনমতেই মুষড়ে পড়বে না। শ্রীওয়াহ্ গুরু। শ্রীওয়াহ্ গুরু! তোমার শিরায় ক্ষত্রিয়ের রক্ত। আমাদের এই গেরুয়া হলো কুরুক্ষেত্রে মরণের সাজ। আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে প্রাণপাত; সাফল্য অর্জন নয়। শ্রীওয়াহ্ গুরু। শিব বলছেন, "আমিই ধাতা। আমি হাত তুলি, সব মিলিয়ে যায়। আমি ভয়েরও ভয়, আতঙ্কেরও আতঙ্ক। আমি অভয়, এক, অদ্বিতীয়। আমি নিয়তির নিয়ন্তা মহাকাল।" শ্রীওয়াহ্ গুরু। বৎসে, অবিচল থেকে, সোনা দিয়ে যা কিছু দিয়ে কেউ যেন তোমায় কিনতে না পারে।'

গুরুর কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে কাজে উৎসাহ বোধ করলেন নিবেদিতা। জুন মাসে নিউ ইয়র্ক যাত্রা করলেন। ওখানে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। তিনি তখন ক্যালিফোর্নিয়া হতে শিকাগো হয়ে নিউ ইয়র্কে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে দিনকতক ধরে অবস্থান করতে লাগলেন নিবেদিতা। আমেরিকা থেকে একেবারে সোজাসুজি ফিরবেন ভারতে। কিন্তু তাঁর বন্ধুদের অনুরোধে নিবেদিতাকে যেতে হচ্ছে প্যারিসে। ওখানে প্যাট্রিক গেড্ডিস তাঁর সহযোগিতা চাইছেন। তাঁকে সাহায্য করলে নিবেদিতা তাঁর কাছ থেকে অনেকরকম সুযোগ-সুবিধা পাবেন। এই প্যাট্রিক-দম্পতির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল নিবেদিতার যখন

তিনি ছিলেন রিজলী-ম্যানরে। প্যাট্রিক গেড্ডিস একজন বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী। তাঁর রূপান্তরবাদ সম্বন্ধে নিবেদিতার কৌতূহল জাগিয়ে দিলেন। নিবেদিতা তাঁকে ভারতের অনেক কথা জানালেন। তিনি নিবেদিতাকে যতটা পারবেন সাহায্য করবেন। তাঁর কাছ থেকে মিলবে ইউরোপীয় ইতিহাসের নাড়ীর খবর। সেই সঙ্গে ওখানকার শিল্পপদ্ধতিরও। প্যারিসে গেলে ভারতীয় উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে দেখা হবে নিবেদিতার। তিনি ঐ সময় আসছেন ইউরোপে। মিসেস্ বুল ইংল্যাণ্ডে আর আমেরিকায় অনেক চেষ্টা করে তাঁর জন্যে একটা বৃত্তি যোগাড় করে দিয়েছেন।

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে যাবার আগে নিবেদিতা নিউ ইয়র্কে প্র্যাট্ ইনস্টিটিউশনে 'হিন্দুনারীর আদর্শ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। স্বামীজী নিজে ঐ বক্তৃতা শুনে খুশী হলেন।

২৮শে জুন নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করে কনকর্ড হয়ে প্যারিসে এলেন নিবেদিতা।

আমেরিকা হতে ফ্রান্সে এলেন নিবেদিতা প্যাট্রিক গেড্ডিসকে বিজ্ঞানের কাজে সাহায্য করতে। সেই সময় ফ্রান্সে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। মিঃ গেড্ডিসের কাজ ছিল আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-কংগ্রেসের বিষয়গুলি দৈনন্দিন ভাষণের সাহায্যে সাজিয়ে গুছিয়ে পেশ করা। এই কাজে তিনি নিবেদিতাকে তাঁর সহকারী সচিব হিসাবে নিয়োগ করলেন। বিকেল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ চলতে লাগলো। একাধিক সপ্তাহ চললো এভাবে। পরে নিবেদিতা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না এরকম কাজে। তিনি চাইলেন কর্মে স্বাধীনতা। মিঃ গেড্ডিস তা দেন নি তাঁকে। ফলে দু'জনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। এই প্রসঙ্গে নিবেদিতা ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখে মিস্ ম্যাকলাউডকে এক পত্রে জানালেন: 'আমি যেন জেরবার হয়ে

গেলুম। উনি চাইছেন ওঁর চিন্তাকে ওঁরই মত করে ভাষায় রূপ দেবে এমন একজনকে। কিন্তু আমি যা খাড়া করছি তাকে বলা যেতে পারে কথার 'মোজেয়িক'—ঝক্‌ঝকে কথার টুকরোগুলো ওঁর। আমি কেবল ব্যাকরণমাফিক বাক্যরচনার ধূসর সিমেণ্টে সেগুলো বসিয়ে চলেছি। বুঝতেই পারছো এ-হেন রচনা কীরকম পঙ্গু।'

জুলাইয়ের প্রথম দিকেই বৈজ্ঞানিক বসু এসে পৌছলেন প্যারিসে। তিনি মিঃ গেঞ্জিসের সঙ্গে আলাপ করলেন। তাঁর সঙ্গে বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। প্রথমে মিঃ বসু আলোচনা করলেন জড়ের ওপর বিদ্যুৎশক্তির প্রতিক্রিয়া। তারপর এলো উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের কথা। উদ্ভিদের মধ্যে জীবের সমস্ত লক্ষণ বর্তমান আছে। তবে ওদের নাড়ীতন্ত্র খুব সূক্ষ্ম। সহজে বোধগম্য হয় না। খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে তবে জানা যায়।

এরপর মিঃ বসুর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আলাপ হলো। লেডি বেটি, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ বিদগ্ধ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং মহিলারা মিঃ বসুর সঙ্গে আলাপ করে খুশী হলেন। স্বামী বিবেকানন্দ একা থাকতে চাইলেন। মিসেস্ লেগেট তাঁকে নেমন্তন্ন করলেন, আমার বাড়ীতে থাকবার জন্যে আসুন।

স্বামীজী বললেন, আমি থাকবো জুল বোয়ারের বাড়ীতে।

জুল বোয়ার হচ্ছেন একজন ফরাসী শিষ্য স্বামীজীর। ভদ্রলোক একটি ছোট ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন। স্বামীজী তাঁর কাছে বেশ আরামে রইলেন। কিন্তু তার মনের মধ্যে একটা চিন্তা কেবল মাথা তুলে দাঁড়াতে লাগলো। ভারতে ফিরে আসার জন্যে তিনি ভাবতে লাগলেন। এইসময় মিসেস্ বুল এলেন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি গরমের ছুটিতে ব্রিটানিতে ছিলেন। বেলুড়ের কাজকর্ম বোঝার জন্যে স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ করলেন।

মঠ এবং সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের আর্থিক উন্নতির জন্যে চাঁদা তোলার বিষয় নিয়েও বুলের সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ হলো। এখন থেকে স্বামীজী মিসেস্ বুলের সাহায্যের ওপর বেশী করে নির্ভর করতে লাগলেন। এর আগেও তিনি প্রায়ই জানাতেন বুলকে নিজের কথা চিঠিপত্রের মাধ্যমে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুআরি এবং ৪ঠা মার্চের পত্রে তিনি লিখলেন, 'তুমি নিশ্চয় আমায় ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, যাবে না ?······দিশারী হিসেবে নিজের চেয়ে তোমার ওপরে বেশী ভরসা আমার।······তোমার ভেতর দিয়েই মা আমায় এখন পথ দেখাচ্ছেন। আমি যে তাঁর অবোধ ছেলে। আমায় যাই করতে হোক না কেন আমার সব শক্তি যে তোমায় দিয়ে দিয়েছি, এটা স্পষ্ট অনুভব করি। মঞ্চে দাঁড়িয়ে কোনও-কিছু বলা আর আমার আসবে না। তাতে আমি খুশী। এখন চাই ছুটি। ক্লান্ত হয়েছি, যে তা নয়। কিন্তু এবার আর কথা নয়। একটু ছোঁয়াতেই কাজ হবে মন্ত্রের মত। শ্রীরামকৃষ্ণের মত। কথা বলার দায় তোমার। আর ছেলেদের ভার দিয়েছি মার্গটকে। ওসবের সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক নেই। আমি খুশী। স্বেচ্ছায় ছুটি নিলুম। কেবল এখান থেকে সরিয়ে ভারতে নাও আমাকে। নেবে না কি ? জানি, মা তোমাকে দিয়ে নেওয়াবেন।

প্যারিসে মিস্ ম্যাকলাউডের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে রইলেন স্বামীজী। এই সময় তিনি ফরাসী ভাষা শিখতে লাগলেন আন্তর্জাতিক ধর্ম-মহাসভার কার্যকলাপ বোঝার জন্যে। এছাড়াও তিনি পাশ্চাত্য দর্শন নিয়ে আলোচনা ও পাঠ করতেন। বাইরের লোকদের সঙ্গে বেশী কথাবার্তা বা আলাপ করতেন না। নিজের মধ্যে দিব্যানু-ভূতির আনন্দে মত্ত থাকতেন। মাঝে মাঝে যেতেন মিসেস্ লেগেটের বাড়ীতে। সে সন্ধ্যেবেলায় চলতো গানবাজনার আসর। জগদ্‌বিখ্যাত শিল্পী এমা কালভে আসতেন ঐ আসরে গান গাইতে। এর আগে স্বামীজী এমা কালভে-কে দেখেছেন

আমেরিকার বিভিন্ন আসরে। স্বামীজী লেগেটের বাড়ীতে এমা কালভের গান শুনে মুগ্ধ হলেন। পরবর্তীকালে এমা কালভে ভারতে এলে বেলুড়মঠের সন্ন্যাসীরা তাঁর কণ্ঠে সংগীত শুনে মুগ্ধ হন। বিশেষ করে এমা কালভের কণ্ঠে স্বামীজী যে সংগীত শুনে মুগ্ধ হন সেই 'লা মারসে ইংল্যাজ' গানটি পুনরায় গেয়ে শোনান মঠের সন্ন্যাসীদের।

এবার ভারতে ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হলেন স্বামীজী। নিবেদিতা একদিন তাঁকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অর্থসাহায্যের সফলতা জানিয়ে এক বিবৃতি দিলেন। স্বামীজী তাঁর জন্যে বিশেষ আনন্দ বোধ করলেন। তিনি যে এসবের উর্ধ্বে চলে গেছেন। এখন তাঁর ভাল-মন্দ কিছুতে মোহ নেই। কেবল ভাবমুখে রয়েছেন জীবনের শেষ-লগ্ন আসার অপেক্ষায়। তবু তিনি মাঝে মাঝে উৎসাহ দিয়ে চলেছেন নিবেদিতাকে। তাঁর কোন অভিযোগ অনুযোগ শুনলেন না। একবার নিবেদিতা তাঁর কাছে বৈজ্ঞানিক প্যাট্রিক গেড্ডিসের বিরূপ ব্যবহারের খবর জানান। তাতে স্বামীজী আদৌ বিচলিত হলেন না। বরং তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। কি হয়েছে তাতে? তোমাদের মধ্যযুগীয় গির্জার তোরণের পানে নজর করে দেখোনি কখনো? আগে-আগে চলেছেন মহামানব, পরমপিতার ইচ্ছার কাছে নিজেকে তিনি সঁপে দিয়েছেন। তাঁর ঠিক পিছনে দেখবে সবসময় একটা শয়তান লেগে আছে।···পায়ের তলায় যে-ফুল ফুটেছে তাদের কুড়িয়ে নিতে শেখো। ভাল চোখে ভ্যাখো সব-কিছুকেই, কাদার ছিটে যদি গায়ে লাগে তবুও। অখণ্ড-মণ্ডলাকার জগৎ ব্যাপ্ত করে রয়েছেন তিনিই। কোনও-কিছুর ভাল-মন্দ বিচার করা কি আমাদের কাজ? অনেকদিন আগে হিমালয়ে মায়ের একটা মন্দির দেখেছিলুম— ভাঙাচোরা, মুসলমানেরা ধ্বংস করেছে। অহঙ্কার নিয়ে ভাবতুম 'সে-সময়ে আমি যদি থাকতুম মা, তোমায় রক্ষা করতুম, এর চেয়েও

বড় মন্দির করে দিতুম তোমার।' কিন্তু ভাবনায় বাধা দিলেন মা নিজেই। শুনতে পেলুম মা বলছেন, 'এই ভাঙা-মন্দিরে থাকা আমার খুশি তা জানিস? নইলে এখানে কি সাততলা সোনার মন্দির গড়তে পারতুম না আমি? তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি তোকে রক্ষা করি?'

একটু থেমে স্বামীজী পুনরায় বললেন, তুমি যেমন জেদী তেমনি একরোখা, ঠিক আমি যেমনটি ছিলুম। তোমার চালচলনে এখনও স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রয়েছে। মায়েরও কাছে নিজেকে সঁপে দাও। কী ভাল আর কী মন্দ তা বেছে নেওয়ার অভিমান এখনো তোমার রয়েছে। সুযোগ পেলেই নির্জনে নিঃসঙ্গ হয়ে থাকো। ভেদবুদ্ধি যাতে ছাড়তে পারো, নিজের অন্তরে সেই শক্তি অর্জন করো। কেমন করে করবে তা আমি জানি না। অন্তরের অন্তস্থলে ডুবে যাও। সংস্কারের সকল ছাঁচ ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলতে হবে। তবেই না কুল ছাপিয়ে ছুটবে আলোর নির্ঝর। তখনই তোমার সব আয়োজন পূর্ণ হবে। যে-পাঁকের ছোঁয়ায় আজ তোমার হাতে দাগ লাগে, তখন তাই দিয়ে গড়বে প্রতিমা। তাতে সঞ্চার করবে মুক্ত প্রাণের আনন্দ। বস্তুকে দাম দিও না। তুমি শুধু অবিশ্রাম সৃষ্টি করে চলো।

অবিশ্রাম সৃষ্টি করার আনন্দময় প্রেরণা লাভ করলেন নিবেদিতা স্বামীজীর কাছ থেকে। তাঁর মন নানারকম সংশয়-দোলায় ভেঙে পড়েছিল। এবার তা ধীরে ধীরে জেগে উঠলো যখন মিসেস বুল তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন বিট্রানিতে গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নিতে।

নিবেদিতা গেলেন। ওখান থেকেই তিনি স্বামীজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলেন লণ্ডনে। যাবার আগের দিন স্বামীজী নিবেদিতাকে ভালভাবে খেতে বললেন। তারপর তাঁকে নির্জনে ডেকে আশীর্বাদ করে বললেন, যাও, জগতের কাজে ঝাঁপিয়ে

পড়ো। আমি যদি তোমায় গড়ে থাকি, তুমি টিকবে না। আর মা যদি তোমায় গড়ে থাকেন অমৃতা হবে।

গুরুদেবের কাছ থেকে অমর আশীর্বাদ নিয়ে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের শেষ সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে চলে এলেন নিবেদিতা লণ্ডনে। সেখানে গুণী-জ্ঞানীমহলে আচার্য বসুর পরিচয় করিয়ে দেন এবং তাঁর গবেষণা চালিয়ে যাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কেবল তাই নয় ব্রিটিশভারতে আচার্য বসু যাতে যথাযোগ্য সম্মানের পদ অলঙ্কৃত করেন, তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্বীকৃতি হিসাবে তাঁর জন্যে নিবেদিতা এবং মিসেস বুল বিশেষ চেষ্টা করেন।

লণ্ডনে এসেও তিনি তাঁর বিত্থালয়ের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করতে লাগলেন। সপ্তাহে তিনটি করে ভাষণ দিতেন। তাছাড়া 'স্টেড এ্যাণ্ড বিটি' পত্রিকায় নিবেদিতার লেখা ছাপা হতো। তার জন্যে প্রচুর লিখতে হতো তাঁকে। টাকাও পেতেন বেশ।

নিবেদিতা আচার্য বসুর কাছে ব্রাহ্মধর্ম প্রসঙ্গে কিছু শিক্ষা করেন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুআরি মাসে নিবেদিতা গেলেন লণ্ডন হতে গ্লাসগো। ওখানকার এক প্রদর্শনীর ভারতীয় বিভাগে বক্তৃতা দিলেন। বৈজ্ঞানিক প্যাট্রিক গেড্ডিসই সব আয়োজন করে দিলেন।

স্কটল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসে নিবেদিতা রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে দেখা করলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত তখন লণ্ডনে ছিলেন। ওখানকার ভারতীয় ছাত্রদের কাছে অর্থনীতি আর আর্থিক জগতের গোড়ার কথা নিয়ে আলোচনা করতেন। নিবেদিতা তাঁর কাছ থেকে ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করলেন। পরে তিনি ভারতীয় ছাত্রের চরিত্র ও শিক্ষা প্রসঙ্গে বিশেষ জ্ঞান লাভ করলেন। এইসময় রমেশ দত্তের প্রেরণায় নিবেদিতা রচনা করলেন 'ভারতীয় জীবনের রহস্য' নামে বিখ্যাত গ্রন্থ।

লণ্ডনে অবস্থান করলেও ভারতে ফেরবার জন্যে নিবেদিতার কাছে চিঠি আসতে লাগলো সারদামণির এবং স্বামীজীর। সারদামণি মার্চ মাসে ভারতে ফেরবার কথা লিখলেন। কিন্তু নিবেদিতার ফেরা সম্ভব হলো না। রমেশ দত্তর পরামর্শে তিনি আরও কিছুদিন লণ্ডনে থাকার কথা চিন্তা করলেন এবং রইলেনও। পরে ২১শে মে নিবেদিতা ভারতে না ফিরে চলে এলেন নরওয়েতে। ওখানে তখন অবস্থান করছিলেন মিসেস বুল তাঁর স্বামীর সঙ্গে সমুদ্রতীরে এক সবুজ পাহাড়ঘেরা কুটিরের মধ্যে।

নরওয়েতে এসে নিবেদিতা এক অরণ্যের মধ্যে তিন সপ্তাহ কাটিয়ে দিলেন। একাকিনী পল্লীর শ্যামল অঙ্গনে বসে লেখাপড়া আর ধ্যানধারণার কাজে ডুবে যেতেন। এখানে বসেই তিনি তাঁর ভাবী জীবনের কর্মধারা বুঝতে পারলেন। ভাবলেন, কেবল কাজ করে যেতে চাই—কেবল কাজ। আর স্বপ্ন দেখতে চাই না। শক্তি সঞ্চয় না করা পর্যন্ত কিছুতেই ভারতে ফিরে যাবো না স্থির করেছি। গোপালের মা যে-কুঁড়েটিতে থাকতেন, নামমাত্র ভাড়ায় সেইটি নেবো। কঠোর দারিদ্র্যের ভয় ঘুচে দেহমনের শুদ্ধি ঘটবে তাতে।

নরওয়ে থেকে মিসেস বুলকে চিঠি লিখলেন নিবেদিতা, 'স্বাধীনতার একটা কদর আছে আমার কাছে। এমন অনেক কিছুকে জীবনে মেনে নিয়েছি যা স্বামীজী বোধ হয় কখনও অস্বীকার করতে দিতেন না। কিন্তু তাঁরই জন্যে সেসবকে মনে ঠাঁই দিয়েছি। আমার বিশ্বাস 'সব ভাল যার শেষ ভাল।' স্বামীজীও আগের মতই আমাকে তাঁর সন্তান বলেই গ্রহণ করবেন।......আমার সম্পর্ক এখন কাজের সঙ্গে। আমি এখন ওদেশের মেয়েদের সম্পত্তি। আজ আমি ভাবনায় যতটা হিন্দু এতটা এর আগে কখনো ছিলুম না। কিন্তু সেইসঙ্গে ওদেশে রাষ্ট্র-চেতনার প্রয়োজনটাও অত্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে।

এই হলো আমার মনের কথা—নিজের কাছে আমায় খাঁটি থাকতেই হবে। নবজাগ্রত ভারত আর ভারতীয়দের জন্যে আমার কিছু করবার আছে, এ-বিশ্বাস আমার জন্মেছে। সেই 'কিছু' করবার অধিকার কেমন করে পাবো সেটা ঠিক করার ভার মায়ের, আমার নয়।'

নিবেদিতার এই চিঠি পড়লে মনে হয় যেন একজন কালী-বিশ্বাসিনী হিন্দু বঙ্গবালার লেখা। ভারতীয় আধ্যাত্মসাধনার শক্তি নিবেদিতাকে পুরোপুরি ভারত-কন্যার রূপ দিয়েছে। এ হচ্ছে তাঁর গুরুর মহা অবদান এবং কৃপা।

অরণ্যের নির্জন পরিবেশে নিবেদিতা আত্মানুসন্ধান করতে লাগলেন। পরে আত্মোপলব্ধির ফলে তিনি জানতে পারলেন, তাঁর মধ্যে মহাশক্তির প্রকাশ হয়েছে। সেই মহাশক্তির কাছ থেকে হস্তীর সমান অতুল বলবিক্রম লাভ করে ভারতের মঙ্গলের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বেন তিনি। তাঁর কাজে সাহায্য করার জন্যে ইতিমধ্যে অনেক বন্ধুবান্ধব জুটে গেল। জুলাইয়েরই প্রথমে অনেকে এলেন নরওয়েতে। মিসেস বুল এলেন। রমেশ দত্ত আগেই এসেছিলেন। আর এলেন মিসেস সেভিয়ার। তিনি লণ্ডনে কিছুদিন থেকে ভারতে যাবেন।

নিবেদিতার সঙ্গে রমেশ দত্তর ভারতের নানারকম সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হলো। নিবেদিতা দত্তকে 'ধর্ম-বাপ' বলে ডাকতেন। তাঁর কাছ থেকে তাঁর ভাবী জীবনের কর্ম প্রসঙ্গে অনুপ্রেরণা লাভ করলেন। এখানে অবস্থানকালে নিবেদিতা তাঁর অপর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ The web of Indian life-এর কয়েকটি পরিচ্ছেদ রচনা করলেন এবং সেগুলি দত্তকে পড়িয়ে শোনালেন। শ্রীদত্ত নিবেদিতার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অর্থনীতির ইতিহাস' এখানে বসে লিখলেন।

ম্যাকলাউডকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখে নিজের মনোভাব

ব্যক্ত করতেন নিবেদিতা। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল এবং ১৯শে জুলাই যে পত্রদ্বয় লিখলেন নিবেদিতা, তাতে প্রকাশ পেয়েছে ভারতে তাঁর ভাবী কর্মের সুচিন্তিত ভাবধারা। তিনি লিখেছেন: 'ভারতের জন্যে আমি কিছুই করছি না। কেবল লিখে-পড়ে তৈরি হচ্ছি। দেখতে চাইছি কেমন করে শিশু-চারাটি বেড়ে উঠবে। যখন সত্যি সত্যি সেইটি বোঝা হয়ে যাবে, জানবো আর কিছু করবার নেই, শুধু ওটিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা ছাড়া। আমার তো এই ধারণা। ভারতবর্ষ তার স্বাধ্যায় তপস্যায় ডুবে ছিল। একদল দস্যু তার ঘরে হানা দিয়ে দেশটাকে ছারেখারে দিয়েছে। ভারতবর্ষের তপোভঙ্গ হয়েছে। দস্যুর দল আর-কিছু কি শেখাতে পারে? না। এখন ভারতের কর্তব্য হলো তাদের তাড়িয়ে দিয়ে আবার আপন স্বভাবে ফিরে যাওয়া। মনে হয় এই ধরনের একটা কিছুই ভারতের পক্ষে আদর্শ সাধনা। ইংল্যাণ্ডের রাজশাসনের পালা এখনও শেষ হয়নি। কিন্তু সর্বান্তঃকরণে কামনা করি, সেদিন আসুক যেদিন এপালা সাঙ্গ হবে। ইটালীর স্বাধীনতা-সংগ্রামে দেশের কচি ছেলেরাও রংরুট হয়ে ম্যাট্‌সিনির পাশে দাঁড়িয়ে মুক্তির বার্তা প্রচার করেছিল। ভারতবাসীরা স্বদেশের স্বাধীনতা যেদিন আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে, সেদিন আমি যেন আবার নতুন জন্ম নিয়ে "তরুণ ভারতের" জয়গাথা উচ্চারণ করতে পারি—এই আমার প্রার্থনা।

'ঐ বিদেশী খ্রীষ্টান পাদরি বা সরকারের দালালদের সঙ্গে মিশে আমার কিছুই করবার নেই। ভারতের পক্ষে যা-কিছু ভারতীয়, তা যতই অর্থহীন বা তুচ্ছ হোক না কেন তা আমার নমস্য। এ ধরনের কিছু ছাড়া আর সবই ভাল যত না করুক মন্দ করবে ঢের বেশী। আমারও ওসব জিনিসের কোনও প্রয়োজন নেই।

'হ্যাঁ, যে কর্মপদ্ধতি বেছে নিয়েছি তাতেও কিছু ক্ষতি করবে, কিন্তু এতে গণ-দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হবে। ভাল হোক বা

মন্দ হোক, তা তাদেরই ভাল-মন্দ, আর কারও নয়। এরকম ক্ষতিকে আমি মোটেই গ্রাহ্য করি না। এরও প্রয়োজন আছে। আমার স্বজাতীয়েরা মর্মান্তিক ক্ষতি করলে তোমার হে ভারত, কে তার পূরণ করবে? তোমার যে সন্তানেরা সাহসে আর বুদ্ধিতে অতুলন, কোনও কিছুর কাছে যারা নুইতে জানে না, তাদের ওপরে প্রতিদিন তিক্ত অপমানের লক্ষ ধারা ঝরে পড়ছে। তার এতটুকু প্রতিকার করবে কে?

'এখন ভাবি; ইংল্যাণ্ডে ভারতের জন্যে কিছু করবার চেষ্টাটা কী বোকামি! কী যে সময়ের অপব্যয় এতে তা বলতে পারবো না। ক্ষুধার্ত নেকড়েকে কচি ছেলের মত নিরীহ করে ফেলা যায় ভাব কি? তোমার খুকুমণির মত শান্ত আর মিষ্টিস্বভাব হবে তাদের? ইংল্যাণ্ডে ভারতের জন্যে কাজ করার অর্থ এইরকম অসাধ্যসাধন। সেখানেও কাজ করার প্রয়োজন আছে। কাজ করতে হবে, তা জানি। কিন্তু কি-ধরনের সে-কাজ তা জানো? স্বামীজী, ডাঃ বসু, মিঃ দত্তের মত মানুষের ইংল্যাণ্ডে আসা উচিত। তাঁরা এসে বুঝিয়ে দেবেন যে ভারতবর্ষ কি এবং কি সে হতে পারে। তাঁরা হাজারে-হাজারে বন্ধু শিষ্য বা অনুরাগী যোগাড় করুন এদেশে। আজ থেকে কুড়ি বছর পরে ভারতবর্ষ আঘাত হানবে যখন (আমি জানি সে-আঘাত আসবেই) তখন হঠাৎ ইংল্যাণ্ডে একদল নরনারী সচেতন হয়ে উঠবে। এর আগে এভাবে নিজেদের বিচার তারা করে নি। কিন্তু সেদিন দল বেঁধে তারা বলে উঠবে, "তফাত যাও! এদের স্বাধীন হতে দাও।" কিন্তু এ হলো ইংল্যাণ্ডের পাপের প্রায়শ্চিত্ত, ভারতবর্ষের জন্যে কিছু করা নয়। বুঝতে পারছো? আর আমি অন্ততঃ ঐ জন্যে জন্মাইনি শুধু। আকুল প্রাণে চাইছি, স্বামীজী যদি বুঝতে পারতেন কে তিনি···কিন্তু তাঁর সাধনা সম্বন্ধেই বা কি জানি আমি? আমাদের বুদ্ধির অগোচর তা···

'ও য়ুম! আমরা চাই, ভারতে...কিন্তু কী চাই আমরা? চাই ধরিত্রীর প্রতিটি ধূলিকণা আমাদের আকুল-বাণী বহন করুক। আমরা চাই প্রকৃতির মন্দাক্রান্তা রূপায়নী-শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে। বৃক্ষরোপণ, শিশুশিক্ষা বা ভূমিবিভাগ—এসব সমাজ-হিতকর কাজের কথা ভুলে গেছি মনে কোরো না। তাও চাই। কিন্তু সেইসঙ্গে চাই উদাত্ত আহ্বান, জনতার উম্মাদনা, প্রাণবিসর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এগুলো না হলে চলবে না। কি আমাদের চাই সে-কথা খতিয়ে দেখি যখন, হতাশ হয়ে পড়ি। কিন্তু যখন মনে হয় সময় হয়েছে—আমি নয়, মহাশক্তি নিজে নেমেছেন কাজে তখন আবার সাহসে বুক বাঁধি।

'আমাদের কর্তব্য বলতে শুধু 'স্রোতে গা ভাসান দেওয়া—তা সে যেখানেই নিয়ে যাক না। যে-কথা বলবার ভার পড়বে তা যেন সব বলতে পারি, লোহা গরম থাকতে-থাকতেই যেন দিতে পারি হাতুড়ির ঘা। ভরসা আছে, আমরা বিফল হবো না। আমার কাজ হলো চোখ মেলে দেখা, আর অন্যদের চোখ খুলে দেওয়া। বাকীটুকু আপনি হবে। স্বপ্ন দেখাটাই সবচাইতে শক্ত'......

'ভাই য়ুম্! আশা আছে, তোমার হৃদয় উদার, সেখানে এসব ভাবনার ঠাঁই হবে।...যদি মনে কর আমার সবই ভুল, সবই সর্বনেশে, অশেষ কৃতজ্ঞতায় তোমার পা ছুঁয়ে আমার পথে আমি চলে যাবো। আমার পাওয়া স্বপ্নকে আমায় রূপ দিতেই হবে।'

নিবেদিতার ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হয়েছে। দীর্ঘ ৪৬ বছর পরে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত লাভ করেছে স্বাধীনতা।

শ্রীঅরবিন্দও বলেছিলেন এরকম দৃঢ়তার সঙ্গে, 'আমার জন্মদিনে ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে।'

তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। ১৫ই অগস্ট তারিখটি বিপ্লবী, কবি ও ঋষি অরবিন্দের জন্মদিন। ঐ শুভ দিনেই পরাধীন

ভারতের বন্ধনদশা ঘুচেছিল। সে জেগে উঠেছিল মুক্তির এক আলোময় পুণ্য-লগ্নে।

শ্রীঅরবিন্দ নিবেদিতার কাছ থেকে দেশসেবার অগ্নিময় প্রেরণা লাভ করেন। কেবল তিনি কেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও প্রেরণা পান। ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে এই দু'জন বিপ্লবীর ভূমিকা অসামান্য। এর মূলে রয়েছে জগজ্জননী মহাশক্তি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁর সাধনা করেন এবং যাঁর শক্তি ধরণীর ধূলিতে নামিয়ে এনেছিলেন এই দু'জন মহাত্মা তার যথাযথ সদ্ব্যবহার করে যান দেশের কাজে নিয়োগ করে। কেবল এঁরা দু'জন কেন এঁদের সঙ্গে আরও অনেক বিপ্লবী দেশের মুক্তিসংগ্রামে প্রাণ দিয়েছেন।

মোট কথা তাঁদের ঐ কাজে প্রেরণা এসেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতার মাধ্যমে। এঁরা হয়তো দেশের মুক্তি-সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। তথাপি পরোক্ষভাবে একাজে এঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

অধ্যাপক এবং ঐতিহাসিক হরিদাস মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থ "স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ"-এ লিখেছেন : '...এই মহামনীষীর (শ্রীঅরবিন্দ)...অবদান হলো জনগণের মনে মাতৃভূমির নূতন ধ্যানের আবেগ জাগিয়ে তোলা। মাতৃভূমি তাঁর কাছে এক বিশাল ভূখণ্ড বা অগণিত মানবসমষ্টি মাত্র নয়, মাতৃভূমি প্রকৃতপক্ষে দেশজননী—প্রত্যেক দেশভক্তের পরম-আরাধ্যা দেবী। স্বদেশের মধ্যে তিনি স্বয়ং জগজ্জননীকে প্রত্যক্ষ করলেন। এই উপলব্ধিতে তিনি আত্মহারা হয়ে দেশবাসীকে আহ্বান করলেন জগজ্জননীর সেই রূপ দেখবার জন্যে। দেশপ্রীতি তাঁর জীবনের মূল মন্ত্রে পরিণত হলো, জাতীয়তাবোধ হলো তাঁর পরম ও চরম ধর্ম। এই দেশপ্রীতি ও জাতীয়তার মর্মবাণীই অরবিন্দ বারবার প্রচার করেছেন 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায়। তিনি লিখেছেন, "স্বাধীন ভারত এক খণ্ড লোষ্ট্র বা কাষ্ঠ নয়, তাকে খোদাই করে

একটা জাতিতে পরিণত করা যায় না। স্বাধীন ভারত রয়েছে তাদের অন্তরে যারা স্বাধীনতার জন্যে ব্যাকুল। হৃদয়ের এই ব্যাকুলতা দিয়েই স্বাধীন ভারত গড়ে তুলতে হবে। মুমুক্ষু ব্যক্তির মুক্তিকামনা যেমন তার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে রাখে, তেমনি জাতীয় নব জাগরণের আশায় মুক্তিপিপাসু মানুষের সমস্ত সত্তা তদ্‌গত হওয়া দরকার। নামহীন সন্ন্যাসীর ত্যাগের মতই আমাদের করতে হবে সর্বস্বত্যাগের সাধনা। শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য-লাভের জন্য যে উন্মাদনা অনুভব করতেন, দেশমাতৃকার স্বাধীন গৌরবদীপ্ত রূপ প্রত্যক্ষ করবার জন্যে আমাদেরও অন্তরে সেই উন্মাদনা জাগা দরকার। জগাই-মাধাই যে উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত রাজকার্য পরিত্যাগ করে শ্রীচৈতন্যের সংকীর্তনে যোগদান করেছিলেন, আমাদেরও সেই উদ্দীপনা ও আবেগের সঙ্গে দেশের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। যদি কোন কার্পণ্য আমাদের পরিপূর্ণ আত্মত্যাগের পরিপন্থী হয়, যদি লাভ-লোকসানের হিসাব আমাদের ত্যাগ-স্বীকারকে খণ্ডিত করে, যদি কোন দ্বিধা ও সন্দেহ আমাদের আশা ও উৎসাহকে স্তিমিত করে দেয়, যদি ব্যক্তিগত স্বার্থের চিন্তা আমাদের দেশপ্রেমকে কলুষিত করে, তাহলে দেশজননী তৃপ্তা হবেন না, আমাদের কাছে ধরা দেবেন না।

'ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে দ্রষ্টা-ঋষি ও মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী নেতা হিসাবে অরবিন্দের অবদান প্রায় তুলনাবিহীন।'…

(স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ—হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়—পৃঃ ১০৯-১১০)

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম নির্ভীক সৈনিক উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব প্রসঙ্গে হরিদাস মুখোপাধ্যায় লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ—'উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ'-এ: 'নর্মদাতীরে নির্জনস্থানে আশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারতের নানা স্থান ভ্রমণকালে উপাধ্যায়ের মন ক্রমশই ভারতমুখী হয়ে ওঠে।

অন্তরের গভীরে তিনি শুনতে পেলেন জাতীয় মুক্তির মন্ত্র। স্বদেশী যুগে তিনি ঐ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লেখেন, "আমার ঘর নাই—পুত্রকলত্র কেহই নাই। আমি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া মনে করিয়াছিলাম যে নর্মদাতীরে এক আশ্রম প্রস্তুত করিয়া—সেই নিভৃত স্থানে ধ্যান-ধারণায় জীবন অতিবাহিত করিব। কিন্তু প্রাণে প্রাণে কি এক কথা শুনিলাম। ......ভারত আবার স্বাধীন হইবে—এখন নির্জনে ধ্যান-ধারণার সময় নয়—সংসারের রণরঙ্গে মাতিতে হইবে।......আমি চন্দ্র দিবাকরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে আমি ঐ মুক্তির সমাচার প্রাণে প্রাণে শুনিয়াছি। মলয়পবন স্পর্শে যেমন শীতার্ত তরুর প্রাণে নবরাগের সঞ্চার হয়—প্রিয়জন-সমাগমে যেমন বিরহীর প্রাণে আনন্দ-লহরী উথলিয়া উঠে—রণভেরী শুনিলে যেমন বীরহৃদয় তালে তালে নাচিয়া উঠে—ঐ স্বাধীনতার সংবাদ শুনিয়া আমারও প্রাণে তেমনি এক নূতন সাড়া পড়িয়া গেল। আমি নর্মদার আশ্রম ছাড়িয়াছি বটে, কিন্তু আমার হৃদয়ে আর একটি আশ্রমের নূতন ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি দেখিতেছি স্থানে স্থানে স্বরাজ-গড় নির্মিত হইয়াছে। সেখানে ফিরিঙ্গির সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। আমার জপ-তপ বাঁধন-ছাঁদন সব ঘুচিয়া গিয়াছে—আকুল পাগল-পারা উধাও হইয়া বেড়াইতেছি। আর গোলাম-গড়ে থাকিতে চাই না—ঐ স্বরাজ-গড় গড়িতে—স্বরাজ-তন্ত্রের প্রজা হইতে—আমার প্রাণ সদাই আনচান।"

'এই স্বরাজলাভের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা স্বদেশী যুগে উপাধ্যায়ের মনে অনির্বাণ দীপশিখার মত প্রজ্জলিত ছিল। এই আকাঙ্ক্ষার স্পষ্ট উন্মেষ তাঁর চেতনায় দেখা দেয় নর্মদাতীরে। তিনি নিবিড়ভাবে অনুভব করলেন নর্মদাতীরের নির্জন আশ্রমে ধ্যান-ধারণায় মগ্ন হওয়ার চেয়ে পরাধীন জাতির মুক্তিসংগ্রামে ব্রতী হওয়াই জীবনের মহত্তর ধ্যান ও তপস্যা। তাই কলিকাতায়

ফিরে এসে (১৯০০) 'সোফিয়া' (নব পর্যায়) সম্পাদনকালে তিনি প্রকাশ্যভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করলেন।'......(উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতের জাতীয়তাবাদ হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়—পৃঃ ৮৭—৮৮)

নরওয়েতে বেশীদিন রইলেন না নিবেদিতা। ভারতে ফেরার জন্মে তাঁর চিত্ত অধীর হয়ে উঠলো। গুরুর মহান্ আহ্বান যেন মর্ম দিয়ে অনুভব করতে লাগলেন। ওখান থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর চলে এলেন লণ্ডনে। ১৪ই সেপ্টেম্বরে যান গ্লাসগো প্রদর্শনীতে। সেখানে বক্তৃতা দেন। তারপর অক্টোবরে যান বেথানী নামে ক্ষুদ্র মঠে। সেখানে থাকেন এক সপ্তাহ। একদিন তিনি বন্ধুদের উদ্দেশ্য করে বললেন, ভারতে ফিরে যাওয়ার জন্মে আমি প্রস্তুত। সামনে দেখতে পাচ্ছি পথ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবার স্বামীজীর সঙ্গে যোগ দিতে হবে। শ্রীমার সঙ্গেও দেখা করতে হবে। নভেম্বর মাসটি নিবেদিতা অধ্যাপক গেড্ডিসের সঙ্গে কাটিয়ে দিলেন। এই সময়ই তিনি আচার্য বসুর 'Living and Non-living' নামে বইটির সম্পাদনা করেন।

৩১শে ডিসেম্বর নিবেদিতা মম্বাসা জাহাজে জিনিসপত্র পাঠিয়ে দেন। পরে প্যারিস হয়ে ৯ই জানুআরি ঐ জাহাজে উঠে ভারত অভিমুখে রওনা হন। এমন সময় তাঁর হাতে টেলিগ্রাম এসে পৌঁছলো। টেলিগ্রাম এসেছে ভারত থেকে। বেলুড়মঠের সন্ন্যাসীরা পাঠিয়েছে : স্বামীজী ভয়ানক অসুস্থ। যত তাড়াতাড়ি পারেন চলে আসুন ভারতে।

টেলিগ্রাম পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গেই নিবেদিতার অন্তরটা কেমন যেন হয়ে উঠলো। মনে হলো কে যেন তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। যাহোক তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন, ঠাকুর ওঁকে সুস্থ রেখো। আমি যেন ভারতে গিয়ে ওঁকে ঠিক আগের মত দেখি।

২০

গুরুর অন্তিম শয্যাপাশে নিবেদিতা

রমেশ দত্ত এবং সারা বুলের সঙ্গে নিবেদিতা কলম্বো হয়ে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুআরি জাহাজযোগে ভারতে এসে পৌঁছলেন।

৪ঠা ফেব্রুআরি মাদ্রাজের মহাজন সভা হলে রমেশ দত্ত আর নিবেদিতাকে সম্বর্ধনা করা হলো। মিঃ জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার অভিনন্দন পত্র পাঠ করলেন।

সভায় বক্তৃতা দিলেন নিবেদিতা। তিনি ঐ বক্তৃতার মাধ্যমে ভারতের প্রতি তাঁর অকপট ও অকৃত্রিম ভালবাসা ব্যক্ত করলেন। সেইসঙ্গে তিনি ইংরাজ শাসকবর্গের কর্মকে সমালোচনা করলেন। তারা ভারতবাসীদের বর্বর বলে অযথা সমালোচনা করে।

নিবেদিতা আরও বললেন, 'য়ুরোপে যাবার আগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাধারণ জীবনের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল। পবিত্রতা, গভীর চিন্তা আর অনুভূতিই ভারতীয় দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য। কলকাতায় থাকার সময় ঐগুলিই আমার জীবনযাপনের মূল লক্ষ্য ছিল। ভোগবিলাসে ভরা পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণ করার সময় হিন্দু পরিবারের সুখময় গৃহই ছিল আমার স্মৃতি।'

নিবেদিতা পুনরায় বললেন : 'স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, ধর্ম ব্যাপারে আপনারা দাতা, পাশ্চাত্যের কাছে আপনাদের শেখবার কিছু নেই। সামাজিক ব্যাপারেও সেই রকম। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের যোগ্যতা আপনাদের যথেষ্ট আছে। বাইরের কোন ব্যক্তির ঐ বিষয়ে উপদেশ দেবার বা হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। জীবনের অগ্রগতির জন্যে পরিবর্তন অনিবার্য। কিন্তু এই পরিবর্তন

মৌলিক, স্বনিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই। তিন হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার কি কোন মূল্য নেই যে, পাশ্চাত্য দেশের তরুণ জাতিগুলি প্রাচ্যবাসীদের পরিচালিত করবে? "ভারতীয় জীবন অনুন্নত, সুতরাং ভারত চায় অন্যান্য দেশের মত সভ্য হতে," এই উক্তির উত্তরে বলতে চাই যে আড়ম্বরহীনতাই ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য আর সভ্যতারও ঐটেই শ্রেষ্ঠ লক্ষণ।

'ভারতীয় নারীগণ অশিক্ষিত ও অত্যাচারিত এই অভিযোগ কোনক্রমেই সত্য নয়। অন্যান্য দেশের চেয়ে এখানে নারীজাতির প্রতি অত্যাচার কম। ভারতীয় নারীর মহৎ চরিত্র তার জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আধুনিক অর্থে তারা অজ্ঞ বটে, অর্থাৎ লিখতে প্রায় কেউই পারে না। অক্ষর পরিচয়ও অতি অল্প স্ত্রীলোকের আছে। কিন্তু তাই বলে কি তারা অশিক্ষিত? যদি তাই হয়, তবে যেসব মা, ঠাকুরমা, দিদিমা ছেলেমেয়েদের কাছে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও নানা উপন্যাস বর্ণনা করেন, তাঁদের সকলকেই অশিক্ষিত বলা যেতে পারে। আবার এঁরাই যদি য়ুরোপীয় উপন্যাস এবং কতকগুলি বাজে ইংরেজী পত্রিকা পড়তে পারতেন তবে আর অশিক্ষিত বলে অভিহিত হতেন না। এটা কি পরস্পর বিরুদ্ধ মনে হয় না?'

'প্রকৃতপক্ষে আক্ষরিক জ্ঞান সংস্কৃতির পরিচয় নয়। ভারতীয় জীবনের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, ভারতীয় পারিবারিক জীবনের মূলকথা হলো মহত্ত্ব, ভদ্রতা, পরিচ্ছন্নতা, ধর্মশিক্ষা, হৃদয় ও মনের উৎকর্ষ, আর প্রত্যেক ভারতীয় নারীর মধ্যেই এই গুণগুলি বর্তমান। সুতরাং সে নিজের মাতৃভাষা পড়তে এবং নাম সই করতে না পারলেও সমালোচকরা তাকে যে দৃষ্টিতে দেখেন এবং যথার্থ দৃষ্টিতে সে তার চেয়ে অনেক বেশী শিক্ষিত।'

নিবেদিতার বক্তৃতাগুলি পত্রিকায় প্রকাশিত হলো এবং সেগুলি পাঠ করার ফলে ইংরাজ শাসকবর্গ তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলো।

তাঁর বিরুদ্ধে গোয়েন্দা লেলিয়ে দিলে। তারাও নিবেদিতার গতিবিধি সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো।

৯ই ফেব্রুআরি নিবেদিতা এলেন বাগবাজারে। স্বামীজী তখন অসুস্থ অবস্থায় কাশীতে বাস করছিলেন। তথাপি তিনি ১০ই ফেব্রুআরি এক পত্রে মিসেস বুলকে লিখলেন: 'প্রিয় মাতা ও কন্যাকে আর একবার ভারতভূমিতে স্বাগত জানাচ্ছি। জো-কর্তৃক প্রেরিত মাদ্রাজের পত্রিকা আমাকে বিশেষ আনন্দিত করেছে। মাদ্রাজে নিবেদিতার অভ্যর্থনা নিবেদিতা এবং মাদ্রাজ উভয়ের পক্ষেই ভাল হয়েছে। তার বক্তৃতা সত্যিই সুন্দর।'

কাশীতে অবস্থান কালেই স্বামীজী নিবেদিতার বিদ্যালয় প্রসঙ্গে নানারকম চিন্তা করতে লাগলেন এবং গুরুভাইদের কাছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপদেশ দিলেন।

১১ই ফেব্রুআরি তারিখে নিবেদিতা কামারহাটিতে গিয়ে গোপালের মাকে দেখে এলেন। ওখান হতে ফেরার পথে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে।

নিবেদিতার সঙ্গে ছিল তাঁদের পুরোনো দাসী বেট। তার সাহায্য লাভ করে নিবেদিতা নিজেকে বেশ স্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

এই সময় বাগবাজারের বাড়ীতে অনেক বিপ্লবীরা আসাযাওয়া করতে লাগলেন। রমেশ দত্ত প্রায়ই আসতেন নিবেদিতাকে বাংলা পড়াতে। মিঃ গোখলে, আবদুর রহমান, আনন্দমোহন বসু, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হলো নিবেদিতার। ওঁদের সঙ্গে দেশের মুক্তি-আন্দোলনের বিষয়ে নানাপ্রকার আলোচনা হতে লাগলো। কারণ তিনি ছিলেন আইরিশ-কন্যা এবং স্বাধীনচেতা। তাঁর পক্ষে মুখ বুজে পরের অত্যাচার সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠলো।

১১ই মার্চ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি। তার

আগেই স্বামীজী ফিরলেন কলকাতায়। কিন্তু তাঁর অসুস্থতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। স্বামীজীর সঙ্গে বেশী লোক দেখা করতে পারতো না। কারণ তিনি অসুস্থ ছিলেন।

স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করলেন নিবেদিতা। ২১শে মার্চ ক্লাসিক থিয়েটারে নিবেদিতা বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু হলো 'আধুনিক বিজ্ঞানে হিন্দু মন'।

এই বছরে স্বামীজীর উৎসাহে মঠে এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলো। স্বামীজী অসুস্থ ছিলেন বলে নীচে নামতে পারেন নি। ওপরের ঘরে বসে জানলা দিয়ে দেখছিলেন। কাছেই ছিলেন মিস্ ম্যাকলাউড। তাঁকে দেখে বললেন স্বামীজী, আমি কখনো চল্লিশে পৌঁছবো না।

মিস্ ম্যাকলাউড স্বামীজীর ঐ কথায় বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। পরে যে ঐ কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে এমন আশা উনি করলেন না।

এপ্রিলে স্বামীজীর অন্যতমা শিষ্যা কৃষ্টিন গ্রীনষ্টাইডেল ভারতে এলেন নিবেদিতার সঙ্গে একত্রে বাগবাজারের বাড়ীতে থাকবার জন্যে।

এই সময় জাপান থেকে ফিরলেন মিস্ ম্যাকলাউড। তাঁর সঙ্গে তাঁর দুই জাপানী বন্ধু এলেন ভারতে। তাঁদের নাম যথাক্রমে প্রিন্স ওডা আর কাকুশো ওকাকুরা। জাপানে 'প্রত্নমন্দির-সংস্কার সমিতি'র প্রধান পাণ্ডা হলেন ওকাকুরা। সরকার তাঁকে অনেক লোভনীয় পদ দিতে রাজী হলেন। কিন্তু ওকাকুরা তা নেন নি। সামান্য একখানি কুটীরে সরলভাবে থাকতে ভালবাসতেন তিনি। সেখানেই তাঁর শিল্পীজীবন অনাড়ম্বরভাবে কাটিয়ে দেবেন এই তাঁর ইচ্ছা। ওঁরা জাপান থেকে এসেছেন স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করে সেখানে নিয়ে যেতে। সেখানে ধর্মসভার এক আয়োজন চলছে।

স্বামীজীর শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি এই দু'জন জাপানীর সঙ্গে প্রাণখোলা আলোচনা করলেন। বিশেষ করে বৌদ্ধ ভিক্ষু

প্রিন্স ওডাকে তাঁর বড় ভাল লাগলো। ওডার বড় ইচ্ছে তিনি যাবেন ভগবান তথাগতের সাধনস্থল দেখতে। স্বামীজীরও ইচ্ছে হলো তিনিও যাবেন সেখানে। অসুস্থ শরীর নিয়েই যাত্রা করলেন। মিস্ ম্যাকলাউডও গেলেন।

বুদ্ধগয়া এবং কাশী হয়ে দলবল নিয়ে স্বামীজী ফিরে এলেন বেলুড়ে। এখানে আসার পর থেকেই তাঁর শরীর ভেঙে পড়লো। এই সময় কলকাতায় প্রচণ্ড গরম পড়াতে নিবেদিতার খুব কষ্ট হচ্ছিল। তিনি স্বামীজীর আদেশ পেয়ে কৃষ্টিন ওকাকুরার সঙ্গে গেলেন মায়াবতীতে। ওখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী মুগ্ধ করলো নিবেদিতাকে।

মায়াবতীতে থাকার সময় নিবেদিতা মাঝে মাঝে নির্জনে বসে ধ্যান করতেন। নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে ধন্য হতেন। নিজেকে স্বামীজী অর্থাৎ তাঁর গুরুর উপযুক্ত শিষ্যা হিসাবে গড়ে তোলবার সময়-সন্ধিক্ষণ বুঝতে পারলেন এবং গুরুশক্তি তাঁর জীবনে যে অনেকখানি কাজ করেছে এও ভালভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হলেন। এই প্রসঙ্গে এবং এই সময়কার ভাব বিশ্লেষণ করে নিবেদিতা চিঠিপত্রে জানালেন: 'এখন আমি যন্ত্র মাত্র। এইটি হওয়ার জন্যে চার বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। বেলুড় মঠে যেদিন নতুন নামকরণ হলো সেদিন আমার অধ্যাত্মশিক্ষার পাঠ শুরু হয়েছিল।...এখন বুঝতে পেরেছি, স্বামীজী এমন একজনের প্রত্যাশায় ছিলেন যার মাঝে নিজের অন্তরের সব শক্তি সব ভাবনা উজাড় করে ঢেলে দিতে পারেন।...'

মহাশক্তির হাতের পুতুল আমরা। আমরা যন্ত্র আর তিনি স্বয়ং যন্ত্রী। তিনি আমাদের পরিচালনা করছেন বলে আমরা চলছি। তা না হলে কি চলতে পারতুম! তাই রামপ্রসাদ সেন গেয়েছেন:

'...আমি যন্ত্র আর তুমি যন্ত্রী
যেমন চালাও তেমনি চলি...'

সেই মহাশক্তির প্রকাশ রয়েছে সর্বত্র। বাস্তব সংসারজগতে ক্ষুদ্র ধূলিকণা হতে বৃহৎ পর্বতের মধ্যে অবস্থান করছে সেই শক্তি। সাধনবলে তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি উপলব্ধি করা যায়। যাঁরা জেনেছেন তাঁরা ধন্য এবং জীবনধারাকে সেই পুণ্য ও কল্যাণময়ী শক্তির অনুকূলে পরিচালনা করে ধন্য হয়েছেন।

২০শে জুন নিবেদিতা মায়াবতী হতে রওনা হয়ে বেরিলি, লখনৌ প্রভৃতি হয়ে ২৬শে জুন প্রত্যাবর্তন করলেন কলকাতায়।

তীর্থভ্রমণের পর স্বামীজীর শরীর দিন দিন খারাপ হতে লাগলো। তরুণ সন্ন্যাসীরা গুরুদেবের এই প্রকার ভাব দেখে বিচলিত হলো। নিবেদিতার মনেও সংশয় জাগলো, তবে কি ইনি আর থাকবেন না এই নশ্বর পৃথিবীতে? আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন?

এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলেন না নিবেদিতা। গুরুকেও জিজ্ঞেস করলেন না। তিনি যে এখন অসুস্থ। তাঁকে বিচলিত করা যায় কি!

অসুস্থ শরীর নিয়েও স্বামীজী মঠের কাজ তদারক করতে লাগলেন। তাঁর পোষা কয়েকটি পশুপক্ষী ছিল। তাদেরও খাওয়াতে লাগলেন সকালে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে। সন্ন্যাস-জীবনের নিয়মনিষ্ঠা ও সংযম ঠিকমত পালন করে চলেছেন। রাত তিনটের সময় শয্যা ত্যাগ করে ধ্যানে বসতেন। গুরুভাইদের এবং তরুণ সন্ন্যাসীদের ডেকে ধ্যানে বসতে বলতেন। তাঁরা স্বামীজীর সঙ্গে ধ্যান করতেন। ধ্যান করতেন নিবেদিতাও। এই সময় তাঁর মনে জাগলো গুরুদেবের একটি কথা। শ্রীরাম-কৃষ্ণের দেহরক্ষার আগে এই রকম ধ্যান করতেন তিনি। তখন তাঁর মনে যে অনুভূতির প্রকাশ হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে পরে তিনি নিবেদিতাকে বলেছিলেন, '...তারপর সন্ধ্যেবেলায় ধ্যান করতে বসে দেহবোধ হারিয়ে ফেললুম। দেখছি, সব শূন্য...একেবারে ফাঁকা...

চন্দ্র-সূর্য দেশকাল মহাব্যোম সবই যেন একসা হয়ে গেল। তারপর কোন্ সুদূরে মিলিয়ে গেল। কিন্তু অস্মিতার একটা সূক্ষ্ম রেশ অনুভবে জেগেছিল যার সূত্র ধরে আবার এই ব্যবহারের জগতে ফিরে এলুম। পাশে বসে ঠাকুর তখন আমায় বোঝাচ্ছিলেন, "যদি দিন-রাত এমনি থাকিস, মায়ের কাজ হবে না যে। যেদিন তোর কাজ শেষ হবে সেদিন আবার এ-অবস্থা ফিরে আসবে"...'

ধ্যান করবার সময় অনেক সন্ন্যাসী এসে স্বামীজীকে নানারকম কথা জিজ্ঞেস করতো মঠের কাজ নিয়ে। স্বামীজী নিজেকে বড় বিব্রত বোধ করতেন। এক সময় তিনি বলে উঠলেন, কেন আমাকে ডাকলে? আমি সাড়া দিতে পারি না...আমি যে মহাসঙ্গমের পথে পা বাড়িয়েছি।

স্বামীজীর কথা শুনে আর কেউ বিরক্ত করতো না। একদিন স্বামীজী নিবেদিতাকে কাছে আহ্বান করে বললেন, এই আমার মৃগচর্মের আসন। এটাকে যত্ন করে রেখে দিও।

স্বামীজীর কথা শুনে বিচলিত হলেন নিবেদিতা। ভাবলেন, স্বামীজী যখন তাঁকে সাধনার আসন দিয়ে দিচ্ছেন তখন তিনি আর বেশীদিন জীবিত থাকবেন না এই পৃথিবীতে। এবার বোধহয় সময় হয়েছে তাঁর চলে যাবার।

এইসব ভাবছেন এমন সময় স্বামীজী তাঁকে বললেন, তুমি অমন করে কী ভাবছো মার্গট? বিহ্বল হয়ো না। মহাশক্তিময়ী জগজ্জননীর ওপর ষোল আনা আশা-ভরসা রেখো। তিনি তোমায় ঠিক ঠিক পথে পরিচালিত করবেন। তুমি এটি গ্রহণ করো মার্গট।

এই বলে স্বামীজী নিবেদিতার করকমলে অর্পণ করলেন তাঁর বিখ্যাত এবং শুচিশুদ্ধ মৃগচর্মাসনটি।

অশ্রুসিক্ত নয়নে ঐ আসনটি গ্রহণ করলেন নিবেদিতা। তারপর ফিরে এলেন বাগবাজারে। সম্প্রতি সেখানে একটা বাড়ী ভাড়া করে মেয়েদের স্কুল চালানো হচ্ছে।

সেদিন ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন তারিখ। দিনটি সত্যি শুভ। ঐদিন স্বামীজী বেলুড়মঠ থেকে এলেন তাঁর মানসকন্যা নিবেদিতার বিদ্যালয়টি দর্শন করতে। নিবেদিতা তখন স্কুল থেকে সবেমাত্র বেরুচ্ছেন এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন, গুরুদেব আসছেন। তখুনি তিনি চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'গুরু মহারাজ কী জয়।'

স্বামীজীও হাত নেড়ে নিবেদিতার স্বাগত অভ্যর্থনা গ্রহণ করলেন। তিনি একাই বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। খিলানের থাম, ঘরের মেঝে, মাটির দেওয়াল এবং উঠোনের ডুমুর গাছ হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখতে লাগলেন। তারপর উঠলেন দোতলায়। দেখলেন, নিবেদিতার ঘরের এক কোণে পাতা রয়েছে মৃগচর্মাসন। তার ওপর বসে পড়লেন তিনি। ঐ মৃগচর্মাসনটি কিছুদিন আগে তিনি দিয়েছিলেন নিবেদিতাকে।

অনেককিছু দেখে শুনে শেষকালে বললেন স্বামীজী, বাড়ীটা ভাল লাগলো, তোমার কাজের উপযুক্তই হয়েছে। শিশুর মাঝে যে ভগবান আছেন তাঁর অর্চনা করতে ভুলো না কখনো। এমন কি ক্ষুদ্র কীটের মাঝেও লুকিয়ে আছে ব্রহ্মবস্তু।

স্বামীজীর কথাগুলি বড় ভাল লাগলো নিবেদিতার। তিনি যে গুরুর কাছ থেকে এইরকম কথা শুনতে প্রত্যাশা করেছিলেন। স্কুল গড়ার ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে গুরুদেবের। সুতরাং তিনি যদি সেই স্কুলের জন্যে নির্বাচিত বাড়ী দেখে পছন্দ করেন তাহলে তার ওপর বলবার কিছু নেই।

এরপর স্বামীজী কতকগুলি মাটির তৈরি খেলনা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। ওগুলি নিবেদিতা সংগ্রহ করেছিলেন স্কুলের ছোট ছোট বালিকাদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেবার জন্যে।

কিছুক্ষণ নিবেদিতার কাছে কাটিয়ে স্বামীজী ওঠবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। যাবার সময় বললেন, কাল সকালে বেলুড়ে এসো।

আমার ইচ্ছে তোমার কাজের ছকটা মঠের সাধুদের বুঝিয়ে দেবে।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন নিবেদিতা। তারপর বললেন, স্বামীজী, বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন যেদিন হবে আপনি এসে আশীর্বাদ করে যাবেন।

নিবেদিতার মুখের দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসলেন স্বামীজী। তারপর বললেন, আমি তো সব সময় তোমাকে আশীর্বাদ করছি।

সত্যিই স্বামীজী তাঁর মানসকন্যাকে সব সময়ের জন্যে আশীর্বাদ করে চলেছেন। কয়েক সপ্তাহ আগে নিবেদিতাকে আশীর্বাদ এবং উৎসাহ দিয়ে স্বামীজী একটি পত্র লিখলেন : 'স্নেহের নিবেদিতা, অফুরন্ত শক্তির আধার হও। স্বয়ং জগদম্বা তোমার দেহ-মনে আবিষ্ট হন। তোমার মাঝে চাই দুর্নিবার বিপুল শক্তির উদ্বোধন। আর সেই সঙ্গে অসীম শান্তিও। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি সত্যের ঠাকুর হন আমায় যেমন তিনি চালিয়ে নিয়েছেন তেমনি করে তোমায়ও চালিয়ে নিন···না, তার চাইতেও হাজারগুণ সার্থক করুন তোমায়।'

পরদিন অর্থাৎ ২৯শে জুন নিবেদিতা গেলেন বেলুড়ে স্বামীজীর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে। তরুণ সন্ন্যাসীরা তাঁকে ঘিরে ধরে তাঁর বক্তব্য শুনতে লাগলেন। স্বামীজীর সামনে বসে নিবেদিতা সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁর বালিকা বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মসূচী ব্যাখ্যা করলেন। সেদিন বেশ অনেক সময় ধরে স্বামীজী এবং সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন নিবেদিতা। তারপর চলে এলেন বাগ-বাজারে, গুরুদেবের আশীর্বাদ শিরে ধারণ করে। আসার সময় গুরুদেব দু' দু'বার শিষ্যার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ জানালেন।

গুরুদেবের এরকম প্রেমপূর্ণ আশীর্বাদ এর আগে আর কখনো অনুভব করেন নি নিবেদিতা। এ যেন জ্বলন্ত শাবকের ওপর এক তুষারশীতল জলধারা। নিবেদিতার মনের সকল সংশয় ও দ্বন্দ্বজ্বালার অবসান হয়ে গেল এই আশীর্বাদে। ভাবলেন, এ যে

গুরুদেবের অহেতুকী কৃপা। এই কৃপাসিন্ধুতে অবগাহন করে তিনি সত্যিই শান্ত ও স্নিগ্ধ হয়েছেন মনে-প্রাণে। এতদিন তিনি যে জিনিসের সন্ধান করে ফিরছিলেন আজ তা পেয়েছেন তিনি পূর্ণভাবে। গুরু তাঁর সর্বস্ব সঁপে দিলেন শিষ্যার অন্তরভাণ্ডে।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে জাগলো এক সংশয়, গুরুদেব এরকম ভাবে তো কখনো আশীর্বাদ করেন নি। তবে কি তিনি আর থাকবেন না নশ্বর দেহে এই পৃথিবীতে?

এমনি চিন্তাক্লিষ্ট মন আর উদ্বেলিত হৃদয় নিয়ে ফিরে এলেন নিবেদিতা বাগবাজারের বাড়ীতে। ওদিকে প্রকৃতির রাজ্যে ভীষণ খরা। গ্রীষ্মকালের তাপ চারদিকে ধরিয়ে দিয়েছে তৃষ্ণার জ্বালা। বাইরে-ভেতরে এরকম তৃষ্ণার জ্বালায় অধীর হয়ে উঠলো নিবেদিতার মন। গুরুদেবের কাছে এসে তাঁর শীতল আশীর্বাদ গ্রহণ করে শান্ত হবার জন্যে দু'একদিনের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লেন পথে। আবার রওনা হলেন বেলুড় মঠের দিকে। কি জানি তিনি আর জীবিত থাকবেন কিনা! যদি আমাকে না দেখা দিয়ে চলে যান? বিশেষ করে সেদিন আমি ওঁকে যে-অবস্থায় দেখে এসেছি! তাতে করে উনি আর বেশীদিন হয়তো থাকবেন না এই পৃথিবীতে।

গুরুদেবকে আগে থেকে না জানিয়েই মঠে এলেন নিবেদিতা। সেদিন ছিল বুধবার। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুলাই। একাদশী তিথি। উপবাসের দিন। মঠের শান্ত পরিবেশে একটা তৃপ্তির আমেজ উপলব্ধি করলেন নিবেদিতা।

পরে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হতে তিনি আনন্দ প্রকাশ করলেন। স্বামীজী নিবেদিতার চোখমুখের হাবভাব লক্ষ্য করে বুঝতে পারলেন, এই বুঝি শেষ দেখা দেখতে এসেছেন নিবেদিতা।

তিনি তখন মঠের সন্ন্যাসীদের ডেকে বললেন, তোমরা ভাল আহার প্রস্তুত করতে থাকো। আজ এখানে নিবেদিতা খাবে।

স্বামীজীর কথামত সন্ন্যাসীরা নিবেদিতার জন্যে রান্নার আয়োজন করলে। ভাত, তরকারি, দই আর ফলের আয়োজন হলো।

খেতে বসলেন নিবেদিতা। স্বামীজী যত্নের সঙ্গে তদারক করতে লাগলেন। সেই সময় তিনি অতীত ঘটনার স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে নানা বিষয় নিয়ে গালগল্প ও হাসি-তামাসা করতে লেগে গেলেন নিবেদিতার সঙ্গে।

সেদিন বেশ চমৎকার এক ঘরোয়া পরিবেশের সৃষ্টি হলো। খাওয়া হয়ে গেলে একজন ব্রহ্মচারী এক ঘটি জল আর একটি তোয়ালে এনে ধরলেন নিবেদিতার সামনে।

স্বামীজী ব্রহ্মচারীর হাত থেকে জলের ঘটি আর তোয়ালে কেড়ে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে ধীরে ধীরে নিবেদিতার হাতে জল ঢেলে দিলেন। তারপর তোয়ালে দিয়ে তাঁর দু'হাত মুছিয়ে দিলেন।

স্বামীজীর এই প্রকার কাণ্ড দেখে অবাক হলেন নিবেদিতা। কি করবেন কিছুই ভেবে পেলেন না। শেষকালে স্খলিত কণ্ঠে বললেন, স্বামীজী, আমারই তো আপনাকে এসব করার কথা। আপনি কেন আমাকে এসব করছেন ?

হেসে বললেন স্বামীজী, যীশু তো তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন।

নিবেদিতা তখন একমনে যীশুর কথা স্মরণ করতে লাগলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, হ্যাঁ, তা দিয়েছিলেন বটে কিন্তু শেষের দিনে···

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই নিবেদিতার অন্তর আশঙ্কায় হিম হয়ে যেতে লাগলো। স্বামীজীও বুঝতে পারলেন নিবেদিতার অন্তরভাব। তিনি তাঁকে উৎসাহ দিয়ে প্রাণভরে আশীর্বাদ জানালেন।

নিবেদিতা গুরুকে প্রণাম করে ফিরে এলেন বাগবাজারে। সেদিনটা বেশ আনন্দে কাটলো নিবেদিতার জীবনে। পরদিন সকালে জনৈক ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে নিবেদিতা গ্রহণ করলেন স্বামীজীর প্রেরিত ঠাকুরের ভোগ। সেই মহাভোগ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতা উপলব্ধি করলেন তাঁর অন্তর এক অনাস্বাদিত আনন্দে ভরপুর। সেদিনটা ধ্যানের মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে দিলেন তিনি।

পরদিন ভোরবেলায় মঠ থেকে একজন এসে নিবেদিতার হাতে তুলে দিলে ছোট্ট একটি চিঠি।

নিবেদিতা সেটি খুলে দেখলেন, তাতে লেখা রয়েছে স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের সংবাদ। লিখেছেন স্বামী সারদানন্দ: 'নিবেদিতা সব শেষ। কাল রাত ন'টায় স্বামীজী ঘুমিয়ে পড়েছেন চিরতরে।'— ইতি সারদানন্দ। ৪ঠা জুলাই, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ।

চিঠিটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিবেদিতা নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে লাগলেন। ভাবলেন, এইজন্যেই কি গুরু আগের দিন আমার জন্য প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন?

কিন্তু নিবেদিতা কান্নায় ভেঙে পড়লেন না গুরুর শোকে। যে লোকটি গুরুর মহাপ্রয়াণের সংবাদ এনেছিল তার সঙ্গেই চলে গেলেন মঠে।

স্বামীজীর ঘরে এসে দেখলেন তিনি মেঝের ওপর শুয়ে যেন ঘুমুচ্ছেন। গায়ে গেরুয়া কাপড়। শুয়ে আছেন হলদে ফুলের বিছানায়। মাথায় গেরুয়া রঙের সিল্কের পাগড়ী।

নিবেদিতা ধীরে ধীরে স্বামীজীর মাথার কাছে এসে বসলেন। মাথাটি তুলে নিলেন নিজের কোলের ওপর। তালপাতার পাখা দিয়ে কিছুক্ষণ বাতাস করলেন। পরে কয়েকজন ভক্ত এবং সন্ন্যাসীদের অনুরোধক্রমে তিনি মাথাটি নামিয়ে রাখলেন ফুলের তৈরি বিছানার ওপর।

তারপর তরুণ ব্রহ্মচারীদের মুখে শুনলেন স্বামীজীর জীবনে শেষ দিনের কথা, খুব ভোরে উঠেই স্বামীজীর গুরু ভ্রাতা ও তরুণ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন ঠাকুরের মন্দিরে। সেখানে গভীর-ভাবে ধ্যানে বসলেন। তাঁর হাবভাব দেখে এবং অপরূপ তন্ময়তা লক্ষ্য করে আমরা বিচলিত হলুম। তারপর আমরা দেখলুম, স্বামীজীর চারদিক ঘিরে একটা জ্যোতি ঘুরছে-ফিরছে। দেবাদিদেব শঙ্করের মত অর্ধনিমীলিত নয়ন দিয়ে দেখছেন জগৎসংসারের রূপ। আমরা তখন সকলে অস্ফুটে ওঙ্কার উচ্চারণ করে চলেছি। একতান উপাসনায় ভরে উঠলো অন্তর। আনন্দে বিহ্বল হয়ে স্বামীজী গেয়ে উঠলেন—

'মা কি আমার কালো রে—
কালো রূপে দিগম্বরী করে হৃদপদ্ম আলো রে।'

এরপর স্বামী ব্রহ্মানন্দ এসে নিবেদিতাকে বললেন, কিছুদিন ধরেই স্বামীজীর মুখে একটা প্রশান্ত করুণার ভাব ফুটে ওঠে। ঠাকুরের সঙ্গে মুখভাবের এমন মিল যে, ওঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতেই যেন সাহস হতো না।

ওদিকে স্বামীজীর পুণ্য দেহ সংকারের জন্যে আয়োজন চলতে লাগলো। মঠের পূর্বদিকে একটা বেলগাছ আছে। স্বামীজীর পূর্ব নির্দেশমত তার তলায় তাঁর মরদেহ সংকার করলেন সন্ন্যাসীরা। শবদেহ চিতায় তুলে দেওয়া হলো। প্রথমে নিবেদিতা পাটকাঠির মশাল জ্বালিয়ে চিতায় অগ্নিসংযোগ করলেন। তারপর অন্যান্য সন্ন্যাসীরা করলেন।

চিতা নিভে গেলে নিবেদিতা ধীরে ধীরে স্বামীজীর পুণ্যাত্মাকে স্মরণ করে বলতে লাগলেন, প্রভু, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

সংকার-কর্ম যখন সমাপ্ত হলো তখন সকলে একে একে ফিরতে লাগলেন গন্তব্যস্থানে। নিবেদিতাও ফিরে এলেন। তাঁর পিছু

পিছু এলেন সদানন্দ। ছ'জনের নয়ন অশ্রুসিক্ত। তথাপি নিবেদিতা গুরুদেবের অভয়বাণী স্মরণ করে মনে-প্রাণে বল সঞ্চয় করতে লাগলেন। মনে মনে প্রার্থনা জানালেন, হে মহাবীর! হে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক! তোমার তেজে আমার দেহ-মন শক্ত করো, তোমার উজ্জ্বল আলোয় আমার যাত্রাপথ সুগম করে দাও। আমি যেন তোমার নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে নির্বিঘ্নভাবে পৌঁছতে পারি।

নিবেদিতার ধর্ম ও ভারতের মুক্তিসংগ্রাম

দেহরক্ষা করলেন গুরুদেব। তার ফলে শিষ্যা নিবেদিতা ভেঙে পড়লেন না। নিজেকে অসহায়ও বোধ করলেন না। কেননা এতদিন ধরে গুরু তাঁকে যে শক্তি দিয়ে গড়ে-পিঠে তুলেছেন সেই শক্তির কেন্দ্র আবিষ্কার করতে পেরেছেন নিবেদিতা। নিজের অন্তরের মধ্যে সেই শক্তি লুক্কায়িত রয়েছে। তাকে জাগিয়ে তুললে সেই নিয়ে যাবে নিবেদিতাকে তাঁর অভীষ্ট পথে।

এই বিশ্বচরাচর একমেবাদ্বিতীয়ম অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের সৃষ্টি। তিনি সর্বভূতের মাঝে থেকে লীলা করছেন। তাঁকে একবার জানতে পারলেই জীবের সব সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। জীবজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে মানুষ। সেই মানুষ চেষ্টা করলে সাধনার দ্বারা দিব্যজীবন লাভ করতে পারে। দিব্যজীবন লাভ করলে শুভকর্মের দিকে মন যায়। জনকল্যাণকর কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারলে সে ধন্য হয়। এভাবে নিষ্কাম কর্মের মধ্যে দিয়ে যে জীবন মানুষ ভোগ করে তাই হচ্ছে তার প্রকৃত ধর্ম। ধর্মই কর্ম আবার কর্মই ধর্ম, এই দুটোর মধ্যে

কোন প্রভেদ নেই। একটার সঙ্গে আর একটা জড়িয়ে রয়েছে অঙ্গাঙ্গীভাবে। নিষ্কাম প্রেমবলে নির্লিপ্ত ও অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে সংসারে দুঃখ থাকে না, হা-হুতাশ ও হতাশাও যায় লুপ্ত হয়ে। তখন কর্তার মনে জাগে আনন্দ আর যার জন্যে কর্ম করা হয় সেও খুসী হয় এবং কর্তার সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়ে ওঠে মধুর এবং আত্মীয়তাময়। অথচ এর সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে কর্তার। পরের হিতের জন্যে সে নিজের স্বার্থ বলি দিলেও স্বাতন্ত্র্যের মাপকাঠি এতটুকু বিচলিত হবে না। এই শিক্ষাই পেয়েছেন নিবেদিতা তাঁর গুরুর কাছ থেকে। কর্মের প্রকৃত কর্তা হচ্ছেন ঈশ্বর; জীব নিমিত্তমাত্র। তিনিই সবকিছু কর্ম করাচ্ছেন জীবকে নিয়ে। সুতরাং জীবের পক্ষে কর্তৃত্বাভিমান থাকা নিতান্ত মূর্খতা এবং দুর্বলতা। তাই সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের চরণে নিজেকে সমর্পণ করে তাঁর ইচ্ছার অধীন হয়ে দাস-আমিরূপে সবকিছু কর্ম করে যেতে হবে।

গুরু নিবেদিতাকে প্রেরণা দিয়েছেন মহাশক্তির শরণাপন্ন হতে। নিবেদিতা এখন সেই মহাবাণী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। কেবল মন্দিরে বসে শক্তির আরাধনা করলে চলবে না, তাকে জনকল্যাণের কাজে ব্যয় করতে হবে। তার জন্যে নিবেদিতা বেছে নিয়েছেন জনশিক্ষা। নারীই হচ্ছে সংসারের অন্যতম ভিত্তি এবং সৃষ্টি-স্থিতি-রূপিনী শক্তি। এই নারীশিক্ষার ভার নিলেন নিবেদিতা। এই অবলা নারীদের মনে-প্রাণে শিক্ষার আলো প্রবেশ করাতে পারলে তারা মনে-প্রাণে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে। অজ্ঞানের অন্ধকার ঘুচে গিয়ে জাগবে জ্ঞানের আলো। সঙ্গে সঙ্গে আসবে আত্ম-স্বাতন্ত্র্য-বোধ। তখন দেশের পরাধীনতার গ্লানি ঘোচাবার জন্যে মনে জাগবে দেশমাতার প্রতি ভক্তি। তাই থেকে আসবে অখণ্ড জাতীয়তাবোধ। এই জাতীয়তাবোধই আনবে দেশের মুক্তি—স্বাধীনতা। আর স্বাধীনতা না এলে সে-জাতির কিছুই হবে না।

নিবেদিতার জীবনব্রত হলো ধর্মের ভিত্তিতে এ-দেশের জনসাধারণকে শিক্ষা এবং অখণ্ড জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে তোলা।

মাঝে মাঝে গুরুদেবের কথা মনে পড়ে নিবেদিতার : 'জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ জানতে বাধ্য হয় তার ধর্মকে, তার পরিবারকে, যে-সমাজে তার আশ্রয় তাকে, যে-গ্রাম তাকে লালন পালন করছে, যে-দেশকে সে শ্রদ্ধা করে—তাদেওর। এদের জন্যে প্রাণ দিতে সে প্রস্তুত হয়। একটা আদর্শের স্বপ্নেই মানুষ বেঁচে থাকে। সুদূরের পিপাসায় প্রাত্যহিকের গণ্ডি সে অনেকদূর ছাড়িয়ে যায় এবং অবশেষে বহুর মাঝে একেকে উপলব্ধি করে। এই প্রয়াস অন্তরের সমস্ত সংবেগ আর শক্তি নিয়ে প্রাণের এই উদয়নকেই বলি ধর্ম। এরই গর্ভে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন ভ্রূণরূপে সংহত হয়ে আছে।

আবার বলেছেন ঃ নতুন যুগ ভেতরের তাগিতেই মাথা তুলবে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতে এসেছিল জাতীয় জাগরণের বন্যা। সেই বন্যার পেছনে ছিল স্বাধীনতা-সংগ্রামের দুর্বার তরঙ্গমালা। তার গতি ঠিক ঠিক পথে ধর্মের কঠিন কোমল গণ্ডীর মধ্যে দিয়ে অখণ্ড জাতীয়তাবোধের মূর্তিতে রূপান্তর করার সাধনায় ব্রতী হন নিবেদিতা। তাঁর গুরু কেবল জনসেবা এবং অধ্যাত্ম সাধনার জন্যে গড়ে তোলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কিন্তু নিবেদিতা চাইলেন স্বাতন্ত্র্য ভাবে ধর্মের মাধ্যমে এদেশের জনসাধারণের আত্মিক শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে। তার দ্বারা সে দেশে-বিদেশে প্রীতির শুভবার্তা প্রচার করতে পারবে। সকলকে ভালবাসতে শিখবে। নিজের দুঃখ দূর করার শক্তিও পাবে। ভারত ধর্মের দেশ। সে ধর্ম হচ্ছে বেদান্ত ধর্ম। তার দ্বারা আমরা প্রত্যেকের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারি মহাশক্তির প্রকাশ। ফলে আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে স্বাতন্ত্র্য বোধ এবং কর্ম করার অখণ্ড তেজ। ভারতীয় ধর্মের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নিবেদিতা বলেছেন : প্রতীচ্যের কাছে 'সভ্যতা' যে-বস্তু, ধর্ম আমাদের তাই। এই

হলো জীবনের লক্ষ্য, পরম পুরুষার্থকেই চরম মর্যাদা দেবার একটা প্রয়াস। স্ব-প্রতিষ্ঠ ধর্মের কাজই তাই এ-কথা কোনমতেই ভুলো না যে ভারতবর্ষের ভীত দাঁড়িয়ে আছে ওরই ওপরে। ব্যক্তিগত সুখদুঃখ ছাপিয়ে সবার সঙ্গে পরিপূর্ণ একাত্মতা যে অনুভব করে কুলধর্মকে যে বিশ্বধর্মে সম্প্রসারিত করতে পারে ঈশ্বর তারই হৃদয়ে। আর একেই বলে ধর্ম।

ভারতে একটা নতুন সভ্যতা গড়ে তোলার সমস্যাটা নিবেদিতা তুলে ধরলেন সবার সামনে: আধুনিক সভ্যতাকে আত্মসাৎ করার মত শক্তি কি হিন্দুধর্ম রাখে? আমরা বলি, হ্যাঁ। হিন্দুর সমস্ত অভ্যাস ও আচারের ঊর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সার্বভৌম বিরাট বেদান্ত দর্শন। যে-কোনও ধর্মানুষ্ঠান বা যে-কোনও সমাজ-সংগঠন পরিকল্পনার উপযোগিতা যাচাই হতে পারে ঐ দর্শন দিয়ে।

ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানলে মনে আসে উদার ভাব। তখন সেই সুন্দর মন পরিবার এবং দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে ছুটে চলে যায় অসীম ও অনন্তের রাজ্যে। তখন জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে ভাই বলে আলিঙ্গন দিতে ইচ্ছা জাগে। ফলে গড়ে ওঠে দেশের মধ্যে একটা অখণ্ড জাতীয়তাবাদ এবং আমরা সকলে উপলব্ধি করতে পারি যে আমরা ভারতবাসী এক অখণ্ড জাতি—আমরা একই শক্তির অধীন। সংস্কারবশে আমাদের লৌকিক ব্যবহার ও আচারে স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হলেও অন্তরে অন্তরে আমরা এক—আমরা মানবজাতি। এই মানবজাতির মঙ্গল বিধান করাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র কর্ম এবং তাই ধর্ম। এই বিশ্বসংসার সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের ছায়ামাত্র। সুতরাং তাঁকে উপাসনা করা মানে সমগ্র জীবজগতের সেবা করা। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করে গেছেন:

'...বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥

নিবেদিতা গুরুর এই মহামন্ত্র অক্ষরে অক্ষরে নিজের জীবনে রূপায়িত করার জন্যে এখন থেকে উঠে পড়ে লাগলেন। তিনি প্রচার করলেন উদাত্ত কণ্ঠে: অজ্ঞেয় ব্রহ্মের দাস না হয়ে এসো প্রত্যক্ষ দেশমাতৃকার দাসত্ব করি আমরা। পূজাবেদীর জায়গায় গড়ে তোল কলকারখানা আর বিশ্ববিদ্যালয়। দেবতাকে নৈবেদ্য না দিয়ে মানুষের সেবা করো। শিখিয়ে-পড়িয়ে তাদের মানুষ করে তোল। কর্মসন্ন্যাস দ্বারা ঈশ্বরোপাসনায় আপনাকে উৎসর্গ না করে এসো জ্ঞানার্জনের জন্যে আমরা প্রাণপাত করি, মানুষের মনে সহযোগিতা আর সংগঠনের ভাব জাগিয়ে তোলবার জন্যে সাধনা করে চলি। আমাদের ধর্মের গোঁড়ামি রূপান্তরিত হোক দেশাত্ম-ভাবনায়। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। পণ্ডিতেরা তাঁকে যে-নামে খুসী ডাকুক না কেন!

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় জাতীয় মহাসভার অধিবেশন বসে। এই উপলক্ষে কয়েকজন দেশনেতার সংস্পর্শে এলেন নিবেদিতা। তাঁর সঙ্গে আলাপ হলো নেতাদের। গোপালকৃষ্ণ গোখলে, বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে দেখা হলো নিবেদিতার। তাঁদের প্রাণে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা জাগিয়ে তুললেন। নিবেদিতার মনে একান্ত বাসনা ছিল তিনি কেবল ঈশ্বর আরাধনা এবং বালিকা বিদ্যালয় নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন না। তিনি দেশের কথাও ভাববেন এবং দেশের রাজনীতি নিয়েও মাথা ঘামাবেন। তখন ভারতের চারদিকে চলছিল জাতীয় আন্দোলন। নিবেদিতা সেই আন্দোলনের পেছনে থেকে কাজ করতে মনস্থ করলেন। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি তাঁর ছিল পূর্ণ সহানুভূতি। তাঁর গুরুদেব তাঁকে এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বলে গেছেন। এবার নিবেদিতা গুরুর স্বপ্ন সফল করার প্রয়াস পেলেন। স্মরণ করলেন গুরুদেবের অমরবাণী: 'দেখতে পাচ্ছি, কোনও অভাবিত উপায়ে ভারত স্বাধীন হবে কিন্তু নিজেদের

তোমরা যদি উপযুক্ত করে না তোল তিন পুরুষের বেশী সে-স্বাধীনতা চলবে না।'...

এই মহাবাণীকে কাজে রূপায়িত করার জন্যে নিবেদিতা দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তবে নিবেদিতা রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি কোনদিন। তিনি চেয়েছিলেন, জনসাধারণের মনে শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটানোই হচ্ছে বড় কথা। নিবেদিতার এই কাজ অনেকে ভাল নজরে দেখলেন না। বিশেষ করে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের কাছে তাঁর এই কাজ সত্যিই বিসদৃশ লাগলো। তাঁরা চেয়েছিলেন নিবেদিতা মঠের কাজে লিপ্ত থাকবেন। দেবতার আরাধনা ও নিষ্কাম মন নিয়ে জীবসেবা এই দু'ই ব্রত গ্রহণ করবেন তিনি। কিন্তু কার্যত দেখা গেল অন্য ব্যাপার। ঈশ্বর-আরাধনা ও জীব-সেবার ব্রতকে যেমন প্রাধান্য দিলেন নিবেদিতা ঠিক সেইরূপ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের যোদ্ধাদের মনে জাতীয়তাবোধের অনুপ্রেরণা জাগাতে লাগলেন। মঠের সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিবেদিতার মনোমালিন্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। ফলে কোষাধ্যক্ষ ব্রহ্মানন্দের নির্দেশে নিবেদিতা মঠের সঙ্গে নিজের সংস্রব ত্যাগ করলেন। ব্রহ্মানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের কথা স্মরণ করে নিবেদিতাকে রেহাই দিলেন মঠের কাজ হতে। স্বামীজী একবার বলেছিলেন নিবেদিতা প্রসঙ্গে মঠের সন্ন্যাসীদের কাছে, 'ও যদি মঠের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নাও রাখে তোমরা ওকে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দিও।'

স্বামী ব্রহ্মানন্দের ডাকে নিবেদিতা দু' দু'বার বেলুড় মঠে যান। একবার ৮ই জুলাই আর একবার ১০ই জুলাই।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ নিবেদিতাকে অনেক করে বোঝালেন, তুমি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজে যোগ না দিয়ে মঠের কাজে আত্মনিয়োগ করো।

রাজি হলেন না নিবেদিতা। তিনি স্পষ্টই বললেন, আর কিছু আমার দ্বারা হবে না। ভারতমাতার সাধনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি, দেশের ভাবনা আর আমি এক হয়ে গেছি। এ-পথ ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে মরা আমার পক্ষে অনেক বেশী সহজ।

এরপর নিবেদিতা মঠের কাজে ইস্তফা দিয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে একটি পত্র লিখলেন। পত্রটি নিম্নরূপ :

১৭, বোসপাড়া লেন,
বাগবাজার, কলকাতা
১৮ই জুলাই, ১৯০২

প্রিয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ,

আজ সকালে আপনার চিঠি পেলুম। মঠের পক্ষ থেকে আপনি আমার প্রাপ্তি স্বীকার গ্রহণ করুন। ব্যাপারটা বেদনাদায়ক। কিন্তু আমার পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে যে-ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক তাই আমায় মেনে নিতে হবে।

তবুও বিশ্বাস রইলো, আপনিও মঠের আর সকলে প্রতিদিন আমার হয়ে আমার শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করবেন শ্রীরামকৃষ্ণ আর আমার প্রাণের ঠাকুরের ভস্মাবশেষের বেদীমূলে।

যথাসম্ভব সহজভাবেই কাগজে কাগজে আমার এই নতুন পরিস্থিতির খবরটা সকলকে জানিয়ে দেবো।

আমার কৃতজ্ঞতা আর আন্তরিকতা জানাই।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা।

চিঠি লেখার পর থেকে কার্যত মঠের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল কিন্তু গুরুভাইয়েদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ছেদ হলো না। পরবর্তীকালে নিবেদিতা অনেকবার মঠে যাতায়াত

করেছেন। গুরুভাইয়েদের এবং সন্ন্যাসী ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বেশ মধুরই ছিল।

নিবেদিতার এই ব্যাপারটি সর্বসাধারণের গোচরীভূত করার জন্যে তখনকার কলকাতার বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র 'পত্রিকা'-য় একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হলো। বিবৃতির শিরোনামা হচ্ছে 'সিস্টার নিবেদিতা'। বিবৃতিটি নিম্নরূপ :

'অনুরোধ করা হয়েছে, আমরা যেন সর্বসাধারণকে জানাই যে স্বামী বিবেকানন্দের শোক-বাসরান্তে বেলুড়-মঠপক্ষ ও নিবেদিতা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, অতঃপর সিস্টার নিবেদিতার কোনও কাজেই মঠ-কর্তৃপক্ষের সম্মতির অপেক্ষা থাকবে না। তাঁর কাজ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলে গণ্য হবে।'

এর পর মঠের সঙ্গে নিবেদিতার জীবনে যা ঘটলো তা লিখেছেন নিবেদিতার জীবনীকার লিজেল রেম : 'এর পর বাকী রইল হিসাব-নিকাশের ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলা। সেটা শিগ্‌গিরই মিটে গেল। তাঁর কাছে যা ছিল তা থেকে নিবেদিতা চারশো পাউণ্ড মঠকে দিয়ে দিলেন। ঐ টাকায় সারদাদেবীর জন্য একখানা বাড়ী কেনা হবে। নিজের বাগবাজারের বাড়ীটা রাখবার জন্য বছরে যে-টাকাটা লাগবে সেইটা নিবেদিতা হাতে রাখলেন। তাছাড়া ভারতের নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে ভাষণ দেওয়ার একটা মতলব করছিলেন, তার জন্যে পথ-খরচার কিছু টাকা। অমূল্য মহারাজ মঠের একজন বিশিষ্ট ব্রহ্মচারী। তিনি আর সদানন্দ নিবেদিতার কাছে রইলেন। সুতরাং স্বাধীন জীবনের গোড়ায় মঠ হতে নিবেদিতার বিদায়পর্বটা প্রীতি-মধুরই রইলো।' (নিবেদিতা —লিজেল রেম—পৃঃ ৪০৫-নারায়ণী দেবী কর্তৃক অনূদিত)।

নিবেদিতার ভাবী জীবনের কার্যসূচী জানা যায় তাঁর দু'খানি লিপি হতে। এ দু'টি তিনি লিখেছিলেন তাঁর বান্ধবী মিস্ ম্যাকলাউডকে। প্রথম চিঠিটি নরওয়ে থাকবার সময়ে লিখলেন।

চিঠির বিষয়বস্তু ছিল: '...প্রাচ্য নারীর জীবন বিপুল ধারায় বয়ে চলেছে। আমি কে যে তার গতি বদলে দেবো? না হয় দশ-বারোটি মেয়ের মনে আমার ভাবনা সঞ্চারিত করেই দিলুম। সেটা এমন কী বেশী লাভের হবে? তার চেয়ে এ-দেশের পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের মনেও যদিও জাতীয়-চেতনা জাগিয়ে তোলা যায়, জীবনের বৃহত্তর সমস্যা আর দায়িত্ব সম্বন্ধে তাদের সচেতন করা যায়, তাতেই কি ওদের কাজ করা হবে না? তারপর যখন নতুন ভারতের বিরাট পরিকল্পনাকে নিজেরা যাচাই করে দেখবার সময় পাবে ততদিন হয়তো মেয়েরা জীবনকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শিখবে আর নতুন নতুন চাহিদা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠবে। তাই হবে না কি? নিজেদের এমনি করে গড়ে তুলবে না কি ওরা? বুঝতে পারি না। হয়তো এসব ভাবের ঘোরে ভুল বকছি। বলতে পারি না। কেবল মনে হয়, গোটাকয়েক মেয়েকে প্রভাবিত করা নয়, আমার কাজ হলো একটা জাতিকে জাগিয়ে তোলা। কেমন করে তা সম্ভব; একজন মানুষ আমায় দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এ কেবল আমার হাতিয়ারে শান লাগানো। আগেই আমি দেখেছি কি হতে চলেছে।'

দ্বিতীয় চিঠিটি লিখলেন ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে জুলাই। চিঠির বিষয়বস্তু ছিল: 'আমার কাজে আমি হয়তো সফল হবো না। কাজটা যে কত অসম্ভব আর আমি নিজে যে কী অযোগ্য তা আমি যেমন বুঝতে পারছি, তুমি তা বুঝবে না, বুঝতে পারো না। কিন্তু তাতে হের-ফেরটা কি হলো? ভাবছো, তাহলে আমার কাজে নামা উচিত নয়? মহাশক্তির বিপুল তরঙ্গে আজ আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা। তীরে পৌঁছবো কিনা সে-ভাবনার দায় তাঁর ওপরেই ছেড়ে দেবো না কি?

'তা নইলে গুরু এমন সময় চলে গেলেন কেন? তাঁকে আর বেদনা না দিয়ে এদেশের প্রতিটি অণুপরমাণু অবন্ধ্যবীর্যে মহা-

ভবিষ্যৎকে রূপ দিক, তাঁর অলক্ষ্য প্রাণের স্রোত সেই সম্ভাবনাকে মূর্ত করুক, এইজন্যেই নয় কি? মনে পড়ে না কি, তিনি বলেছিলেন, একদল কর্মী গড়ে তোলবার পর যে-কোনও মহাপুরুষের অন্যত্র সরে যাওয়া উচিত। তিনি নিজে তাদের মধ্যে থাকলে তারা স্বাতন্ত্র্য পায় না।...আমি জানি, তাঁর নামে যে-কাজ করছি তা তুমিও প্রশ্রয়-ছায়ায় লালন করবে, করবে মঙ্গলের কামনা'......

২২

আবার ভারত পরিক্রমায় নিবেদিতা

স্বামীজীর দেহত্যাগের পর তাঁর জীবনী ও বাণী নিয়ে দেশের জনসাধারণের মনে নানারকম আলাপ-আলোচনা চলতে লাগলো। তার সঙ্গে নিবেদিতাকেও অনেকে তাঁর মানসকন্যারূপে জানতে পারলে। অনেকের ধারণা হলো, নিবেদিতা বুঝি তাঁর অবর্তমানে ভারতবাসীর সেবাব্রতের ভার নিয়েছেন। তাই মঠের সন্ন্যাসীদের মত নিবেদিতাকেও জনসাধারণ শ্রদ্ধার চোখে দেখতে লাগলো। তাদের চোখে নিবেদিতা আর বিদেশিনী নন। তিনি ভারত-ভগিনী। ভারতের সেবার জন্যে তিনি গ্রহণ করেছেন হিন্দুধর্ম। জনসাধারণ তাঁকে কাছে পেয়ে তাঁর মুখ থেকে কিছু কথা শুনতে ইচ্ছে করলে। যশোর (অধুনা পূর্ব পাকিস্তান) থেকে একদল লোক এলো নিবেদিতার কাছে। এসে বললে, আপনাকে ওখানে যেতে হবে একবার। আমরা আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতে ইচ্ছা করি।

ওদের কথা শুনে খুশী হলেন নিবেদিতা। বললেন, আমি আপনাদের আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করলুম।

পরে নিবেদিতা গেলেন যশোরে। জনসভায় ভাষণ দিলেন। জনগণের দাবি, তিনি ধর্মপ্রসঙ্গে কিছু বলুন।

উত্তরে নিবেদিতা জানালেন, স্বামীজীই আমার ধর্ম। এছাড়া আমার কাছে আর অন্য ধর্ম নেই। তিনিই আমার কাছে দেশপ্রেম-স্বরূপ।

নিবেদিতার মুখে এরকম কথা শুনে বিস্মিত হলেন জনসাধারণ।

কি সুন্দর এবং অর্থবহ কথা বলেছেন নিবেদিতা। গুরুর ওপর এমনভাবে আত্মসমর্পণ করে ক'জন। গুরুর ধ্যান-ধারণার মধ্যে—তাঁর জীবনের সর্বকর্মের মধ্যে নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখার সুখ নিবেদিতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে চলেছেন। এরকম নিষ্ঠা থাকলে গুরুর প্রতি, তবে সে অনায়াসে তার ব্রতে সিদ্ধিলাভ করতে পারে।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগস্ট কলকতায় প্রতিষ্ঠিত হলো বিবেকানন্দ সোসাইটি। নিবেদিতা ছিলেন অন্যতম উদ্যোগী সভ্যা।

জাপানী শিল্পী ওকাকুরা সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে উত্তর ভারত পরিক্রমায় বেরুলেন। পথে উভয়ের মধ্যে ভারতপ্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হলো। বিশেষ করে ওকাকুরা ভারতের সনাতনী ঐতিহ্য নিয়ে বললেন সুরেন্দ্রনাথকে, তোমরা জেগে ওঠো। দ্যাখো, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তির সমকক্ষ করবার জন্যে ত্রিশ বছরের কম সময়ে আমাদের দেশকে আমরা কী করেছি! আমাদের অতীত ছিল গৌরবোজ্জ্বল। তারই প্রেরণায় দেশের ঘুমন্ত আত্মাকে জাগিয়ে তুলেছি। তোমরাও মাথা তোল। যে বিরাট ভবিষ্যৎ তোমাদের সামনে তাকে রূপ দেবার এই সঙ্কেত।···ভারতের শৌর্য-বীর্যের হলো কি? অশোক আর বিক্রমাদিত্যের মত রাজার নামও দেশটা ভুলে গেছে? একটা জাতির সমস্ত রাজন্য অসম্মানের লাঞ্ছনা বুকে বইছে? নিজে তার হুকুম মেনে নিচ্ছে?

জাতীয় মহাসভা এ-দেশের লোকের হয়ে তার প্রতিবাদ করতে সাহস করে না? তোমরা কি ভুলে গেছ সমস্ত এশিয়ার সত্তা এক? হিমালয় তো আমাদের তফাত করেনি। বরং দুটো বিরাট সভ্যতাকে সংহত হয়ে ওঠবার সুযোগ দিয়েছে—কনফুসিয়ান চীনের বাস্তববাদী সভ্যতা আর বৈদিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সভ্যতাকে যারা মহাভারত আর উপনিষদের উৎস হতে পরম তত্ত্বের অমৃত ধারা আকণ্ঠ পান করেছে সেইসব গাঙ্গেয় দেবব্রতদের হলো কি?

এমনিভাবে অনেক কথা বললেন জাপানী ক্ষত্রিয়বীর, শিল্পী এবং দার্শনিক ওকাকুরা। সামান্য আহার ও পরিচ্ছদ পরিধান করে ভ্রমণ করতে লাগলেন। শয়নও করতেন একটি মাদুরে।

ওকাকুরা লিখলেন ভ্রমণকাহিনী। নিবেদিতা সেটি ভাল করে দেখে দিতে লাগলেন। তাঁর আর একখানা বইয়ের পাণ্ডুলিপিও দেখলেন নিবেদিতা। তার নাম 'প্রাচ্যের আদর্শ'। তাতে ভারত তথা জাপানের কথা লেখা হলো। পরে ঐ বইটি মিসেস্ বুলের চেষ্টায় আমেরিকা হতে প্রকাশিত হলো।

ওকাকুরা আর সুরেন্দ্রনাথ ভারত-পরিক্রমা করে ফিরে এলে নিবেদিতা স্বামী সদানন্দকে নিয়ে গেলেন ভারত-পরিক্রমা করতে। কেননা ইতিপূর্বে তিনি আহ্বান পেয়েছিলেন লাহোর, বোম্বাই এবং পুণা হতে।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর বেরিয়ে পড়লেন নিবেদিতা ভারত-পরিক্রমায়। স্বামী বিবেকানন্দও ভারতকে এবং ভারত-বাসীদের জীবনচিত্র ঠিক ঠিক জানবার জন্যে সারা ভারত পরিক্রমা করেছিলেন। তাঁর যোগ্যা শিষ্যা এবং মানসকন্যা নিবেদিতাও গুরুর ব্রত উদ্‌যাপন করতে অগ্রসর হলেন। নাগপুর হয়ে ২৪শে সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে এসে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেন নিবেদিতা। দেখলেন এখানকার এক শ্রেণীর মানুষ পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ করে চলেছে। তারা না ভারতীয়, না

ইউরোপীয়। তিনি তখন গুরুর কথা স্মরণ করে এইসব পথভ্রান্ত ভারতবাসীদের স্বধর্মে ফিরিয়ে আনতে ব্রতী হলেন। স্বামীজীর জীবনদর্শন তাদের সামনে তুলে ধরলেন উদাত্ত কণ্ঠনিঃসৃত বক্তৃতার মাধ্যমে : 'স্বামীজীর মধ্যে একাধারে লোকোত্তর আধ্যাত্মিকতা আর বিপুল দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি ঘটেছিল। এমন স্বদেশহিতৈষী পৃথিবীতে বড় বেশী জন্মায় নি। দেশের প্রাচীন সংহতি যখন এগিয়ে পড়ছে সেই সময়টিতেই এলেন তিনি। নতুনকে তিনি তো ভয় করতেন না। তিনি যখন এলেন তখন এ-দেশের লোক তাদের পুরোনো ঐতিহ্যকে পরিহার করতে চলেছে। অথচ তিনি ছিলেন পুরোনোর নৈষ্ঠিক পূজারী। ভারতের নিয়তি তাঁরই মধ্যে সার্থকতা লাভ করেছে।

'তাঁর সারাটা জীবন কেটেছে হিন্দুধর্মের একটা সার্বজনীন ভূমির সন্ধানে। অভাবিত নানা খুঁটিনাটি আর আপাতবিরোধের মধ্যেও মূলগত একটা ঐক্যের সন্ধান তিনি পেয়েছেন। এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

'স্বামীজী ব্যর্থতার কথা স্বপ্নেও মনে আনতেন না। দেশবাসীকে কোন্ ভবিষ্যদ্‌বাণী দিয়ে গেছেন? তাঁর মত মানুষ বীর্যের মন্ত্রই শুনিয়ে চলেন, আর কিছু নয়। তাঁর মতে দেশের আশা তার নিজের মাঝেই। পরের কাছে কোন আশা নেই। তাঁর স্বপ্নের ভারত ভাবীকালের গর্ভে। দুঃখ-বেদনার কশাঘাতে চেতনা আজ উদ্‌বুদ্ধ হয়েছে। এক দীর্ঘ বিবর্তনের এ কেবল প্রথম পর্ব। দেশের অতীত আদর্শ ও পরিবেশ হতে নিজের মাঝেই নিজের জীবনকে ভারত নতুন করে আবিষ্কার করবে, পরের অনুসরণ করে না। একটি কথাই বলবার ছিল স্বামীজীর। বার বার একটি বাণীই দিয়ে গেছেন, 'উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত! লড়াই করে চলো, লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত থামবে না'···

নিবেদিতার এমন প্রাণমাতানো এবং মনমাতানো ভাষণ শুনে

বোম্বাইবাসীরা মুগ্ধ হলো। তারা দলে দলে এলো তাঁর ভাষণ শুনতে। বোম্বাইয়ের অনেক জায়গায় তিনি ভাষণ দিলেন। উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মাঝে গিয়ে তিনি বক্তৃতা দিলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু হলো—'স্বামী বিবেকানন্দ' 'আধুনিক বিজ্ঞানে হিন্দু মানসের স্থান', 'ভারতের একতা', 'ইংরেজী ভাষা আয়ত্তীকরণের সমস্যা', 'ভারতের নারী,' 'এশিয়ার ভাবধারা' ইত্যাদি। তাঁর পক্ষে ভ্রমণ করছিলেন সদানন্দ। এতে করে নিবেদিতার মনে জাগলো সাহস ও শক্তি। তিনি নির্বিঘ্নচিত্তে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন।

১লা অক্টোবর হিন্দু ইউনিয়ন ক্লাবের সভ্যরা নিবেদিতাকে এক চায়ের আসরে অভ্যর্থনা জানালে। উদ্দেশ্য ছিল তাদের পরিবারবর্গের মহিলাদের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় করিয়ে দেওয়া। স্যার বালচন্দ্র কৃষ্ণ মারাঠী ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করলেন। তিনি নিবেদিতার বোম্বাই সফরের উদ্দেশ্য উল্লেখ করে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন।

নিবেদিতাও পালটা ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, এখানকার মেয়েরা আমাকে না দেখে যদি স্বামীজীকে দেখতো, তাহলে অধিক আনন্দের অধিকারী হতেন।

২রা অক্টোবর হিন্দু লেডিজ সোস্যাল ক্লাবের উদ্যোগে তিনি একটি বক্তৃতা দিলেন।

৪ঠা অক্টোবর গিরগাঁও অঞ্চলে সেখানকার অধিবাসীদের উদ্যোগে এক বক্তৃতার আয়োজন করা হলো। ঐ সভায় বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের আগমন হলো। সভার মাঝখানে একটি টেবিলের ওপর স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি রাখা হলো। সেই প্রতিকৃতি দেখতে পেয়ে নিবেদিতা পায়ের জুতো ছেড়ে নগ্ন পায়ে সভায় প্রবেশ করলেন। আনন্দের সঙ্গে বললেন, এমনি এক সভায় অভ্যর্থনার জন্যে আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ। আমাদের

মাথার ওপর উন্মুক্ত আকাশ। সামনে হরিৎ বৃক্ষ। এই পাম-জাতীয় বৃক্ষ ইউরোপে বিজয়লাভের সূচনা জানায়।

সকলে নিবেদিতার বক্তৃতা শুনে খুশী হলেন এবং তাঁকে অভিনন্দন জানালেন।

৬ই অক্টোবর গেটী থিয়েটারে বক্তৃতা দিলেন নিবেদিতা। তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল ভারতীয় নারী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সভ্যতার পার্থক্য উল্লেখ করে তিনি বললেন, আধুনিক যুগে ইউরোপে নারীরা সমাজে যে পদমর্যাদা উপভোগ করেন প্রাচ্যে বৈদিক যুগে নারীরা তার অনুরূপ মর্যাদা পেতেন। পাশ্চাত্যে নারীর আদর্শ দান্তের 'বেয়াত্রিচে', ভারতে যুগ যুগ ধরে সীতা এবং সাবিত্রীই পূজা পেয়ে আসছেন। ধর্মানুভূতিই সমগ্র এশিয়ার নারীজাতির আদর্শকে এমন বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এশিয়াতে পেয়েছে নারীপূজা।

ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ উল্লেখ করে তিনি বললেন, শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কিন্তু শিক্ষা কী ধরনের হবে তাই প্রশ্ন। ইংরেজী লিখতে ও পড়তে পারাই শিক্ষা নয়। মানুষ হওয়ার শিক্ষা লাভ করা চাই। উন্নতির সম্ভাবনার পক্ষে যেসব বাধা সেগুলি দূর করতে পারলেই ভারতীয় নারীরা শিক্ষালাভ করতে পারবে।

ঐদিন পুনরায় হিন্দু লেডিজ সোস্যাল ক্লাবে তাঁকে বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ জানানো হলো। এই সভায় নিবেদিতাকে একজন প্রশ্ন করলেন, আপনি স্বধর্ম ত্যাগ করলেন কেন ?

নিবেদিতা বললেন নিজের মানসিক দ্বন্দ্ব এবং স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে যোগাযোগের কথা। তারপর বললেন, আমি ভারতকে ভালবাসি, কারণ জগতের ধর্মমতগুলির মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট ভারত তার জন্মদাত্রী।···হে ভগিনীগণ, আপনাদের সকলের প্রতি আমার একান্ত ভালবাসা আছে। কারণ আপনারা এই প্রিয় ভারতভূমির কন্যা। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা পাশ্চাত্য

সাহিত্যের পরিবর্তে এই মহিমময় প্রাচ্য সাহিত্যের অনুশীলন করুন। আপনাদের সাহিত্যই আপনাদের উন্নত করবে। আপনাদের পারিবারিক জীবনের যে সরলতা ও গাম্ভীর্য তা যেন অটুট থাকে। প্রাচীনকালে এই পারিবারিক জীবনে যে পবিত্রতা ছিল এবং যা এখনও আপনাদের ঘরে রয়েছে সেই পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখবেন।

পাশ্চাত্যের আধুনিক রীতিনীতি ও আড়ম্বর এবং তার ইংরাজী শিক্ষা যেন আপনাদের বিনম্র সৌজন্য নষ্ট না করে। ...আমার এই অনুরোধ কেবল হিন্দু ভগিনীদের কাছে নয়, মুসলমান ভগিনীগণকেও আমার এই অনুরোধ। আপনারা সকলেই আমার ভগিনী। কারণ যে দেশকে আমি স্বদেশরূপে গ্রহণ করেছি আর যেখানে আমি আমার গুরুদেব বিবেকানন্দের অভিপ্রেত কাজ করে যেতে আশা করি আপনারা সকলেই সেই দেশের কন্যা।

নিবেদিতার বক্তৃতা শুনে খুশী হলেন ক্লাবের অধ্যক্ষা এন. এন. কোটারী। তাঁর বক্তৃতার জন্যে এবং তাঁর আগমন স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে তাঁকে ক্লাবের পক্ষ হতে এক প্রস্থ ঋকবেদ গ্রন্থ ও ১০৮ রুদ্রাক্ষের মালা উপহার দেওয়া হলো। মেয়েরা নিবেদিতার ললাটে পরিয়ে দিলে কুঙ্কুমের টিপ।

উত্তরে নিবেদিতা আনন্দের সঙ্গে বলে উঠলেন, এই রুদ্রাক্ষের মালা পেয়ে আমি খুশী হয়েছি। এর প্রতিটি রুদ্রাক্ষের ওপর আমি ভারতীয় ভগিনীদের মঙ্গলের জন্যে মহাদেবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করবো।

সকলেই নিবেদিতার বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হলেন। 'বোম্বাই গেজেট' এবং 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া'তে নিবেদিতা সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাণী প্রকাশিত হলো।

একদিন একটি ছাত্র এসে প্রশ্ন করলে, আমরা কোন্ কাজে লাগবো?

নিবেদিতা বললেন, যে ভাবেই হোক ভারতের সেবা করো। আমার মত মুক্ত মনের অধিকারী হও।

৭ই অক্টোবর নিবেদিতা গেলেন নাগপুরে। সেখানে তিনি বিচারপতি মিঃ কোলস্টকারের বাড়ীতে অতিথি হলেন। ওখানেই তিনি ৮ই হইতে ১১ই পর্যন্ত অবস্থান করলেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় সভা-সমিতিতে গিয়ে বক্তৃতা দিলেন।

১৪ই অক্টোবর নিবেদিতা গেলেন ওয়ার্ধায়। ঐদিন সন্ধ্যায় তিনি বক্তৃতা দিলেন 'খ্রীষ্টধর্ম' প্রসঙ্গে। পরদিন দু'টি বক্তৃতা দিলেন —একটি 'স্বামীজী' অন্যটি 'ভক্তি ও শিক্ষা'।

১৬ই অক্টোবর নিবেদিতা ওয়ার্ধা ত্যাগ করলেন। ওখান থেকে গেলেন অমরাবতী। ওখানে ১৭ই অক্টোবর 'এশিয়ার মহাপুরুষগণ' প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিলেন এবং ১৮ই অক্টোবর বক্তৃতা দিলেন 'আধুনিক চিন্তায় হিন্দুধর্ম' প্রসঙ্গে।

অমরাবতী হতে নিবেদিতা এলেন সুরাটে। পরে সুরাট হতে গেলেন বরোদায়। ওখানে তিনি ২১শে, ২২শে ও ২৩শে এই তিন দিন বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'প্রাচীন ও নূতন', 'এশিয়ার ঐক্য' এবং 'শক্তিপূজা'।

বরোদার মহারাজা ও মহারানী তাঁকে এক চায়ের আসরে আমন্ত্রণ জানালেন। এই বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে পরিচয় হলো নিবেদিতার।

বরোদা হতে নিবেদিতা গেলেন আমেদাবাদে। ওখানে তিনি তিন দিন বক্তৃতা দিলেন। ২৬শে, ২৮শে ও ২৯শে। 'কর্ম' প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিলেন ২৬ তারিখে, 'এশিয়ার ঐক্য' প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিলেন ২৮ তারিখে এবং ২৯ তারিখে বক্তৃতা দিলেন 'স্বামীজী' প্রসঙ্গে।

পরে আমেদাবাদ হতে বাঁদরায় এলেন নিবেদিতা। ওখানকার কন্‌হেরি গুহাগুলি দেখলেন। তারপর দৌলতাবাদ হয়ে ইলোরার বিখ্যাত গুহাগুলি দেখে ৭ই নভেম্বর ফিরলেন কলকাতায়।

কলকাতায় ফিরে চন্দননগরে একটি বক্তৃতা দিলেন নিবেদিতা। এছাড়াও নিবেদিতা বিবেকানন্দ সোসাইটি ও নিউ ইণ্ডিয়ান্ ইন্‌স্টিটিউটে দু'টি বক্তৃতা দিলেন।

কলকাতায় ফিরেও সুস্থির হতে পারলেন না নিবেদিতা। মাদ্রাজ থেকে তাঁর আহ্বান এলো। স্বামী সদানন্দের সঙ্গে তিনি ৮ই ডিসেম্বর চললেন মাদ্রাজ অভিমুখে। সেখানে তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গে 'কাসল্ কার্নান' ভবনে অবস্থান করতে লাগলেন।

মাদ্রাজে অবস্থানকালে একদিন স্বামী সদানন্দ প্রস্তাব করলেন ভুবনেশ্বরের কাছে খণ্ডগিরি পাহাড়ে 'ক্রিসমাস ইভ' উদ্‌যাপন করলে কেমন হয়।

নিবেদিতা বললেন, বড়দিনের সময় আমার তো মাদ্রাজে প্রোগ্রাম আছে। ঐ সময় খণ্ডগিরিতে যাবো কেমন করে?

সদানন্দ বললেন, তাহলে অন্য একদিন করুন।

নিবেদিতা বললেন, তাহলে আগে করা যাক, ১৩ই ডিসেম্বর।

রাজী হলেন সদানন্দ। স্বামী সদানন্দ, স্বামী শঙ্করানন্দ এবং নিবেদিতা এই তিনজনে এলেন উড়িষ্যার স্বনামখ্যাত স্থান ভুবনেশ্বরে। খণ্ডগিরির ওপর সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে ক্রিসমাস ইভ্ উদ্‌যাপন করা হলো। এই অনুষ্ঠানে বেশ সুন্দর একটি বর্ণনা দিয়েছেন ভগিনী নিবেদিতার জীবনীকার প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভগিনী নিবেদিতা'-য়: '...সন্ধ্যার সময় একখানা জ্বলন্ত মোটা কাঠের গুঁড়ির চারিধারে ঘাসের উপর তাঁহারা বসিলেন। একদিকে পাহাড়ের গায়ে গুহাগুলি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। নিস্তব্ধ রজনীতে কেবল বায়ুবিকম্পিত, সুপ্ত অরণ্যানীর মৃদু শব্দ। স্বামী সদানন্দ ও ব্রহ্মচারী কম্বল মুড়ি দিয়া বসিয়াছেন। ঈষৎ আলোকে তাঁহাদিগকে কৃষকের মত দেখাইতেছে। সেণ্ট লুক-প্রণীত ঈশার জীবনী তাঁহাদের সঙ্গে। পরিকল্পনা ছিল, ঈশার

আবির্ভাবের পূর্ব-রজনীতে দেবদূতগণের আবির্ভাব প্রভৃতি পাঠ করার সঙ্গে সকলে মনে মনে সেই দিব্য রজনীর কল্পনা করিবেন। নিবেদিতা পড়িতে লাগিলেন; পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া গেলেন। একের পর এক অধ্যায় পড়া চলিতে লাগিল। লুক-প্রণীত বাণীর সরলতা যেন স্পষ্টরূপে অনুভূত হইল। সেই অদ্ভুত জীবনের সমগ্র অংশ পাঠের পর অবশেষে মৃত্যু এবং সর্বশেষ অধ্যায়ে পুনরুত্থানও পঠিত হইল। পুনরুত্থানের বর্ণনাটি আর মনে হইল না যে, স্থূল অলৌকিক কাহিনী। সত্যই যেন এক দিব্যানুভূতি। যে দিব্যমানবের সঙ্গ নিবেদিতা এবং স্বামী সদানন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার মহৎ জীবনালোকে যেন সমগ্র ঘটনাটিই প্রত্যক্ষ, সত্য ও জাগ্রত বলিয়া বোধ হইল। নিবেদিতা সেই রজনীর তন্ময়তা ও অনুভূতি পরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং নিম্নলিখিতভাবে শেষ করিয়াছেন—'ঈশ্বর করুন, আমাদের আচার্যদেবের এই জীবন্ত সত্তা, স্বয়ং মৃত্যুও যাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে নাই, তাহা যেন তাঁহার শিষ্য আমাদের নিকট মাত্র স্মরণীয় বস্তু না হইয়া সর্বদা জ্বলন্ত জাগ্রতভাবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে।...'

(ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা—পৃঃ ২৫১-২৫২)

ভুবনেশ্বর হতে নিবেদিতা মাদ্রাজ অভিমুখে রওনা হলেন। পথে পড়লো ওয়ালটেয়ার, বেজওয়াদা, গুণ্টাকল প্রভৃতি স্থান। ওসব জায়গায় নামলেন তিনি। পরে ১৯শে ডিসেম্বর তিনি মাদ্রাজে পৌঁছলেন। মাদ্রাজে তিনি একমাস রইলেন। বহু লোক তাঁকে দেখতে আসতো এবং তাঁর ভাষণ শুনে ধন্য হতো। ওখানকার 'হিন্দু' পত্রিকায় ওঁর বলা ভাষণগুলি ছাপা হতো।

একদিন নিবেদিতার কাছে এলেন 'ইয়ং মেনস্ হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভ্যবৃন্দ। তাঁরা বললেন, আমরা আগামী ২০শে ডিসেম্বর এক সভার আয়োজন করেছি। আপনাকে ঐ

সভায় 'ভারতের ঐক্য' প্রসঙ্গে কিছু বলতে হবে। মৈলাস্যুর পাচায়াপ্পা হলে বসবে ঐ সভা। নিবেদিতা রাজী হয়ে গেলেন।

নির্দিষ্ট দিনে সভা আরম্ভ হলো। বক্তৃতার শুরুতে তিনি দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রণাম করে এসে নিজের গুরুর কথা স্মরণ করলেন। তারপর শুরু হলো বক্তৃতা। তিনি বললেন: 'ভারতের ঐক্য কথাটি অনেকের কাছে পরিহাসের জিনিস বলে মনে হয়। কিন্তু আজ এখানে আমরা সমবেত হয়েছি ভবিষ্যতে ভারতের ঐক্য স্থাপন সম্ভব কিনা অথবা অতীতে ঐক্য ছিল কিনা তা নিয়ে চিন্তা বা আলোচনা করার জন্যে নয়।

'হয় এখনই ভারতে একতা আছে, নয় কোনদিনই আমাদের মধ্যে একতা সম্ভব হবে না। একতা নেই একথা কাউকে উচ্চারণ করতে দেবেন না। যারা কেবল বলে বেড়ায়, আমরা দুর্বল, বিভক্ত, আর্ত, অসহায়, পরাধীন, কিন্তু যদি আমরা লড়াই করি ও যত্নপর হই তবে এই অবস্থা হতে পরিত্রাণ পেতে পারি—তাদের এই ধরনের স্বদেশপ্রেম (ইংরেজীতে যাকে বলে কুমীরের কান্না) কখনও যেন প্রশ্রয় না পায়। দেশ ও জাতির মধ্যে মুহূর্তের জন্যেও যদি ঐ নিদারুণ ক্ষত দেখা দেয়, আমার ভয় হয়, হয়তো আমরা তাই সত্য বলে ধরে নেবো আর কোনদিনই সেই ধারণা থেকে নিষ্কৃতি পাবো না। তিরিশ কোটি লোকের সমষ্টি এক বিরাট জাতির জীবনে সামান্য একপুরুষ সময় কিছুই নয়। ধর্মের ক্ষেত্রে সাধারণ বুদ্ধি ও বিচারের প্রয়োজন। সম্পূর্ণ সুস্থতা অপরিহার্য। স্বদেশপ্রেম শারীরিক উত্তাপবিশেষ নয় যা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে পরমুহূর্তে অবসন্ন করে দেয়। আমি আপনাদের কাছে একটিমাত্র শব্দ উত্থাপন করতে চাই যে শব্দ আপনাদের প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে যেন উচ্চারিত হয়—সেটি হলো 'জাতীয়তা'।

'মানবজীবনের দিকে তাকালে দেখা যায়, ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ

করার ক্ষমতা অনুসারেই মানুষ মহান্ ও শক্তিশালী হয়। এদেশে ভারতবাসীদের চেয়ে য়ুরোপীয়েরা বেশী শক্তিশালী। এর কারণ অত্যন্ত সরল ও স্পষ্ট। তারা নিজের সম্প্রদায় ও পরিস্থিতির সঙ্গে সংযোগ রেখে কাজ করতে সর্বদা তৎপর। আর এদেশের লোকের কাজের ধরন দেখলে মনে হয় না যে তার দেশের সংহতি সম্বন্ধে এতটুকু হুঁশ আছে।

'মধ্যাহ্ন-গগনের সূর্যের মত তিনি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করছেন যে, ভারতে এক অখণ্ড, শক্তিশালী, অনুপম মহান্ ঐক্য বিরাজ করছে এবং তিনি আশা করেন, শীঘ্রই সেই সময় আসছে যখন সকলে সেটা ধারণা করে সেই শক্তির বলে কাজ করতে সমর্থ হবে।'

'পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে একমাত্র হিন্দু জাতিই প্রত্যক্ষ করেছে যে, মনই জগতের সৃষ্টিকর্তা। জগৎ মন সৃষ্টি করেনি। আমরাই জগতের স্রষ্টা। উদীয়মান তরুণ ছাত্রসম্প্রদায়, যাদের মন নবীন ও মুক্ত, যাদের সম্পর্ক কেবল আগামীকালের সঙ্গে তাদের কাছে একথা বিশেষরূপে সত্য। আমরা শুনে থাকি যে, পঞ্চাশ বছর আগে ভারতে একতা বলে কিছু ছিল না। একথা সত্য যে, ডাকবিলির প্রচলন, রেলপথে যাতায়াত ও ইংরেজী ভাষার ব্যবহার এক বৃহত্তর অখণ্ড ভারত গঠনে সাহায্য করেছে। কিন্তু এই পঞ্চাশ বছরের আগে ভারতে ঐক্য ছিল না। এই ধারণাকে আমি অবজ্ঞার সঙ্গে উড়িয়ে দিতে চাই। যদি ভারতের নিজস্ব ঐক্য না থাকতো, তবে বাইরে থেকে কোনরকম ঐক্য সাধন সম্ভব হতো না।...আপনারা যেন কোনমতেই জাতীয়তার জন্যে ধর্ম ত্যাগ করবেন না। সবরকম শৃঙ্খল চূর্ণ করুন। প্রকৃত ধর্ম কাকে বলে, অন্তরের অন্তঃস্থলে হৃদয়ঙ্গম করে তাকে নতুন ভাবে প্রকাশ করা চাই। মাত্র কয়েক বছর আগে এই দাক্ষিণাত্যে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠ হতে যে বাণী উচ্চারিত হয়েছিল—ভারতের প্রতি তাঁর সেই

মহৎ বাণী উচ্চারণ করে আমি বক্তৃতা শেষ করতে চাই—'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

২৩শে ডিসেম্বর আর এক সভায় বক্তৃতা দেবার কথা ছিল নিবেদিতার। কিন্তু দুর্ঘটনার জন্য তিনি সভায় যোগ দিতে পারলেন না। ২৭শে ডিসেম্বর পুনরায় ঐ সভা বসার আয়োজন হতে লাগলো। এবারও নিবেদিতা যোগদান করতে পারলেন না। তার কারণ দেখিয়ে তিনি মাদ্রাজের মহিলাদের উদ্দেশ্য করে একটি 'খোলা চিঠি' লিখলেন। পরে ঐ চিঠিটি ২৪শে ডিসেম্বরের 'হিন্দু' পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। ঐ চিঠিতে নিবেদিতা দুঃখ প্রকাশ করে লিখলেন, 'আমি বুঝেছি, আমার গুরুদেবের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবশেই আপনারা দলে দলে সভায় সমবেত হয়েছেন। যদি আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হতো আর আপনাদের কাছে বর্ণনা করতে পারতুম, পাশ্চাত্যে আমাদের কাছে তাঁর আসার কী অর্থ আর স্বদেশবাসীর ওপর তাঁর কী প্রচণ্ড আশা ছিল তাহলে সত্যিই আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করতুম।

'তাঁর (স্বামী বিবেকানন্দের) দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভারতের ভবিষ্যৎ ভারতের পুরুষের তুলনায় নারীর ওপর বেশী নির্ভর করছে। আর আমাদের ওপর তাঁর বিশ্বাস ছিল অগাধ। একমাত্র ভারত-ললনাই প্রাচীনকালে সানন্দে মৃত স্বামীর চিতায় আরোহণ করতো। কেউ তাকে নিবৃত্ত করতে পারতো না। সীতা ছিলেন ভারতের নারী। সেইরকম সাবিত্রী ও উমা। কঠোর তপস্যার বলে মহাদেবকে লাভ করা এই হলো ভারতীয় নারীর চিত্র।··· সকল দেশেই জাতি তার পবিত্রতা ও শক্তি, এই দুই রক্ষার দায়িত্ব নারীর ওপর ন্যস্ত করে এসেছে, পুরুষের ওপর নয়। মুষ্টিমেয় পুরুষ হয়তো কোথাও কোথাও আচার্যরূপে পরিগণিত হয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশকেই জীবিকা অর্জনের জন্যে পরিশ্রম করতে হয়েছে। গৃহেই তাঁরা লাভ করেছেন অনুপ্রেরণা। তাঁদের শ্রদ্ধা, অন্তর্দৃষ্টি

এবং মহত্ত্বের উৎস যে গৃহ-পরিবেশ তা নারীর তপস্যার মধ্যেই নিহিত। ভারতীয় মাতা ও বধূ, নিজেদের এ-কথা মনে করিয়ে দেবার দরকার নেই। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ আর শঙ্করাচার্য তাঁদের মায়ের কাছে কতদূর প্রেরণা লাভ করেছিলেন। অসংখ্য নারী তপস্বিনীর মত নীরব, শান্ত জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। বিশ্বস্ত থাকাই ছিল তাঁদের গৌরব, পূর্ণতালাভ করাই ছিল তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ঐসব নারীর দ্বারাই ধর্মের সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি ঘটেছে, বহির্জগতে সংগ্রামের দ্বারা নয়।

'আজ আমাদের দেশ আর ধর্ম দারুণ দুর্দশায় এসে পড়েছে। ভারতমাতা এই মুহূর্তে তাঁর মেয়েদের বিশেষভাবে আহ্বান করছেন—তাঁরা যেন প্রাচীনকালের মত শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁকে সাহায্য করতে অগ্রসর হন। কী করে তা সম্ভব হবে? আমাদের সকলেরই এই প্রশ্ন। প্রথমতঃ, হিন্দুমাতা তাঁর ছেলেদের মধ্যে ব্রহ্মচর্যের তৃষ্ণা ফের জাগিয়ে তুলুন। এছাড়া জাতির পক্ষে তার প্রাচীন বীর্য লাভ সম্ভব নয়। ভারত ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথাও ছাত্রজীবনের এমন মহান্ আদর্শ নেই। যদি এখানেই তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে আর কোথায় তাকে রক্ষা করবার আশা করা যেতে পারে? ব্রহ্মচর্যের মধ্যেই সমস্ত শক্তি ও মহত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে। প্রত্যেক জননী যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁর সন্তানেরা মহৎ হবে।

'দ্বিতীয়তঃ, আমরা কি নিজেদের এবং সন্তান-সন্ততির মধ্যে পরদুঃখকাতরতা ফুটিয়ে তুলতে পারি না? এই পরদুঃখকাতরতা সকল মানুষের দুঃখ, দেশের দুরবস্থা এবং বর্তমানে ধর্ম কত বিপদগ্রস্ত তা জানতে আগ্রহ জাগাবে। এই জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু শক্তিশালী কর্মী জন্মাবে, যারা কর্মের জন্যেই কর্ম করবে আর স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর সেবার জন্যে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে প্রস্তুত থাকবে। এই স্বদেশের কাছ থেকেই আমরা সব পেয়েছি —জীবন, আহার, বন্ধু, পরিজন ও শ্রদ্ধা। এই দেশই কি আমাদের

প্রকৃত জননী নন? আবার কি তাঁকে মহাভারত রূপে দেখবার আকাঙ্ক্ষা আমরা পোষণ করবো না?

'প্রিয় জননী ও ভগিনীগণ, আমার মনে হয় আমার গুরুদেব এইসব কথাই আমার চেয়ে আরও সুন্দর ভাষায় আপনাদের কাছে ব্যক্ত করবেন।

'একান্ত অযোগ্যা, আমাকে সম্মান দেখিয়ে আপনারা যে তাঁকেই সম্মান দেখিয়েছেন সেজন্যে আবার আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের কাছে আমার সতত অনুরোধ, যিনি আমাকে কন্যারূপে গ্রহণ করে আপনার স্বদেশবাসী করেছেন, তাঁর জন্যেই আমাকে আপনাদের কনিষ্ঠা ভগিনীরূপে স্মরণ করবেন ও আমার জন্যে প্রার্থনা করবেন। এই সঙ্গে আমি স্বামী বিবেকানন্দের পেছনে সর্বদা অবস্থিত তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও সেই জগজ্জননী কালী যাঁর শক্তি এই দুই মহামানবের মধ্যে দিয়ে কাজ করেছিল আর নিঃসন্দেহে আমাদের মধ্যেও কাজ করবে, তাঁদের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

'সেই মহামায়ার নামের ভরসা করেই আমি নিজেকে আপনাদের সামনে দাঁড় করিয়েছি।'

মাদ্রাজে থাকার সময় নিবেদিতা বহু জায়গায় স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম ও আদর্শ এবং ভারতবাসীদের কর্তব্য প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিলেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহযোগিতায় তিনি এইসব বক্তৃতাগুলি দিলেন। এগুলি একত্র করে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো। তার নাম 'Hints on National Education in India'। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের প্রতি তাঁর অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করে নিবেদিতা লিখলেন: 'স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে কেবল ভাল বললে অস্পষ্ট বলা হয়। আমার বক্তৃতা ও আলোচনা সভায় তাঁর নীরব, দৃঢ় উপস্থিতি ও সমর্থন লাভ করেছি।'

এমনকি পরবর্তীকালে বেলুড়ে এসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নিবেদিতাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিলেন তাঁর কর্মে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বিবেকানন্দ সোসাইটির সঙ্গে জড়িত থেকে মাদ্রাজের বিভিন্ন জায়গায় হোম, পূজা এবং বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন। নিবেদিতা তাঁর ঐসব কাজ বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে বেড়ালেন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুআরি তারিখে রামকৃষ্ণানন্দ প্রথম বিবেকানন্দের জন্মতিথি পালন করলেন। এই ভাবগম্ভীর পরিবেশে উপস্থিত ছিলেন নিবেদিতা স্বামী সদানন্দের সঙ্গে।

এরপর নিবেদিতা অসুস্থ শরীর নিয়ে কলকাতায় ফিরলেন। তাঁর বক্তৃতাবলী শুনে সমগ্র মাদ্রাজবাসী বিস্মিত হলো। মাদ্রাজবাসীরা স্বামীজীকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করতো। এ হেন মহাপুরুষের মানসকন্যা যে রাজোচিত সম্মান পাবেন তা আর আশ্চর্য কি! নিবেদিতার বাণী এবং বক্তৃতার মধ্যে প্রকাশ পেল জাগরণের মন্ত্র। আত্মবিস্মৃত এবং পরাধীন ভারতবাসীর আত্মাকে জাগাবার জন্যে তিনি এই মন্ত্র প্রচার করলেন। এ যে তাঁরই গুরুর অভিপ্রায়। তিনি নিবেদিতা প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন, 'সমগ্র ভারত তার ভাবে মুখর হয়ে উঠবে—India shall ring with her।'

২৩

বাগবাজার বালিকাবিদ্যালয়ে নিবেদিতা

গুরুদেবের দেহত্যাগের পর নিবেদিতার মন বিষণ্ণ হয়ে পড়লো। তাই মনকে প্রফুল্ল রাখবার জন্য তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে এলেন। এ কাজে তাঁর দু'রকম ফল মিললো। এক কথায় বলতে গেলে বলা চলে শাপে বর হলো। প্রথম হলো নিজের শোকসন্তপ্ত মনকে কিছুটা সান্ত্বনা দেওয়া, দ্বিতীয়ত ভারতবাসীদের নানারকম এবং বৈচিত্র্যময় জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। কিন্তু বেশীদিন তাঁকে ঘুরতে হলো না। স্কুলের কথা মনে পড়ে গেল। আরব্ধ কাজ সফল করে তুলতে হবে। সুতরাং তিনি ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুআরি থেকে রীতিমত ক্লাস আরম্ভ করলেন। দেশের অবলা নারীকে শিক্ষা দিলে দেশ হবে উন্নত।

এই সময় নিবেদিতাকে সাহায্য করতে এলেন স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতমা মার্কিন শিষ্যা কৃষ্টিন। নিবেদিতা বালিকাদের শিক্ষার জন্যে কোনরকম পাঠ্যপুস্তকের প্রচলন করলেন না। তাদেরকে শিক্ষা দিলেন মুখে মুখে এবং দ্রব্যের মারফতে। ঠিক যেন কিণ্ডারগার্টেনের ধারায়। মায়ের মত স্নেহ দিয়ে তিনি স্কুলের মেয়েদের ভালবাসতেন এবং তাদের প্রসঙ্গে মন্তব্যও লিখে রাখতে লাগলেন। একটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃতি করছি: 'সন্তোষিনী দত্ত: জাতি কায়স্থ। ৬০ দিনের মধ্যে ৫১ দিন উপস্থিত। শুনতে পাই, পিতামহীর সঙ্গে তার স্বভাবের বেশ মিল আছে। তাঁরই মত বুদ্ধিমতী, মিশুক ও অমায়িক। তবে সম্পূর্ণ চপল প্রকৃতির। মেয়েটিকে আমার বেশ ভাল লাগে। ইংরেজী শিখেছে বেশ ভাল করে। তার রঙের কাজ বেশ সুন্দর।

হাতের কাজে গভীর অনুরাগ ও ওতে সে তন্ময় হয়ে যায়। বারংবার করেও ক্লান্ত হয় না। সহজেই ভদ্র ব্যবহার শিখছে।'

এমনি অনেক বালিকার সম্বন্ধে রিপোর্ট লিখে রাখতেন নিবেদিতা।

বালিকা ছাত্রীরা নিবেদিতার কাছে আসতো। লেখাপড়া শেখার চেয়ে খেলার ঝোঁক তাদের বেশী থাকতো। সময় সময় তাদের কাছ থেকে নিবেদিতা বাংলা শিখতেন। একেবারে দুষ্ট প্রকৃতির বলে তাদের দূরে সরিয়ে দিতেন না। মায়ের মত স্নেহ দিয়ে কাছে রেখে শিক্ষা দিতে লাগলেন। এইসব মেয়েদের কাছ থেকে তিনি বাংলা শিখতে আরম্ভ করলেন। এই প্রসঙ্গে নিবেদিতা লিখেছেন : 'ভারী চালাক ও অদ্ভুত মেয়ে। গলার স্বর কর্কশ। কিন্তু কেবল ভাল আর চটপটে। গায়ের রঙ্ খুব কালো। আর দেখতে অনেকটা জংলী ধরনের। তার চেহারা ও স্বভাবে ছিল না বিন্দুমাত্র লাবণ্য। ভব্যতাও নেই। অথচ দয়ার প্রতিমূর্তি। তার এক ভায়ের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব। তারা দু'জনেই বিকেলে আমার কাছে আসতো ও আমাকে বাংলা শেখাতো।'

এক একটি মেয়ে খেয়ালের বশে অনেকরকম উৎপাত করতো। একদিন একটি ছাত্রী নিবেদিতার রঙের বাক্স থেকে সমস্ত রকমের রঙের তুলি বের করে একটা নতুন বইয়ের মধ্যে নানারকমের আঁচড় কাটতে লাগলো, ফলে বইটা নষ্ট হয়ে গেল। ছাত্রীর কাণ্ড দেখে নিবেদিতা কিছু বললেন না। পরে সে ক্ষমা চেয়ে নিলে তিনি খুশীই হলেন।

অনেক মেয়ে স্কুলে মাঝে মাঝে আসা বন্ধ করে দিতো। নিবেদিতা তাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। দরকার হলে তাদের বাড়ীতে গিয়ে অভিভাবকদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আবার সেইসব পলাতকা ছাত্রীদের নিয়ে আসতেন স্কুলে।

অনেক সময় নিবেদিতাকে অনেক রকম অসুবিধার সম্মুখীন

হতে হয়েছে বালিকা বিদ্যালয় চালাতে গিয়ে। যেসব মেয়েদের মধ্যে বেশ বুদ্ধির পরিমাপ লক্ষ্য করা যেত তাদের মধ্যে তিনি দেখতে পেতেন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। তাই তাদের পড়াশুনোর প্রতি অধিকতর মনোযোগী হতেন। কিন্তু তাঁর সে মনোযোগ অচিরে নষ্ট হয়ে যেত যখন তিনি শুনতেন তার বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। কারণ তখনকার সমাজে ব্যাপকভাবে বালবিবাহের প্রচলন ছিল। এইসব দেখে হতাশ হয়ে পড়তেন নিবেদিতা। একজনের সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন: 'সে বিয়ে না করতে দৃঢ়সঙ্কল্প। তার বিশ্বাসভাজন কাকেও বলেছে যে জোর করে বিয়ে দিলে সে করবে আত্মহত্যা। তার তীক্ষ্ণ বিবেক, অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি আর যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞান আছে। উচ্চভাব অতি সহজে গ্রহণ করতে পারে। বিয়ে হতে তাকে রক্ষা করা উচিত।'

নিবেদিতার ইচ্ছা ছিল ঐ মেয়েটির বিয়ে বন্ধ করবেন। কিন্তু তিনি চেষ্টা করেও তার বিয়ের ব্যবস্থা ভেঙে দিতে পারলেন না।

শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকার ছিলেন নিবেদিতার অন্যতম ছাত্রী। তিনি নিবেদিতা প্রসঙ্গে এক নিবন্ধ লেখেন ২৮শে পৌষ ১৩৬৯ সালের রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায়। তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি:

'...অল্পদিনের মধ্যে আমাদের অজ্ঞাতসারে নিবেদিতা আমাদের জীবনস্বরূপ হয়ে পড়লেন, তাঁকে আমাদের তখন কী যে ভাল লাগতো, তিনি কখন আমাদের কাছে আসবেন ও কিছু বলবেন সেইজন্য আমরা উন্মুখ হয়ে থাকতুম। তাঁর কোন প্রয়োজনে লাগলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকতো না। তিনি সাধারণতঃ আমাদের অঙ্ক, ইতিহাস ও ছবি আঁকতে শেখাতেন, সাধারণ স্কুলের মত পাঠ্যপুস্তক দ্বারা ইতিহাস পড়াতেন না, তিনি নিজেই ইতিহাসের গল্প বলে যেতেন, আমরা শুনতাম, এক একদিন এক একটি বিষয় নিয়ে তিনি আরম্ভ করতেন এবং সেই বিষয়ের ভিতরেই যেন ডুবে

যেতেন। সিস্টার নিজে সমস্ত রাজপুতানায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, সে সম্বন্ধেও অনেক গল্প তিনি আমাদের কাছে করতেন। রাজপুত জাতির শৌর্যবীর্য, দেশের জন্য ত্যাগ, কষ্টসহিষ্ণুতা আবার রাজপুত নারীদের বীরত্ব-গাথা, আত্মসম্মান ও দেশের সম্মানরক্ষার জন্য অনলে জীবন আহুতি দান, তিনি অগ্নিগর্ভ ভাষায় বর্ণনা করতেন। সেই সময় তাঁর মুখের ছবি বিভিন্ন ভাবের ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো এবং আমাদের বিস্মিত ও মুগ্ধ করতো। সিস্টার আমাদের বলেছিলেন, তিনি যখন চিতোরে যান, রানী পদ্মিণী যেখানে জহরব্রত উদ্‌যাপন করেছিলেন সেই মহাতীর্থস্থানে নির্জনে একলা বসে দেবী পদ্মিণীর শেষ চিন্তা ধ্যান করতে গিয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং সেই অবস্থায় কতক্ষণ ছিলেন জানতে পারেন নি। সমাধি অবস্থায় তিনি যা অনুভব করেছিলেন, সেই অনুভূতির বিষয় আমাদের বলতে গিয়ে "শান্তি! শান্তি! শান্তি! আঃ কি সুন্দর" উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষু মুদ্রিত ও সুন্দর শুভ্র হাত দুটি জোড় করে প্রায় ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়লেন, আর কিছু বলতে পারলেন না। তখন তাঁকে স্নিগ্ধ শান্ত জ্যোতি দিয়ে গড়া যেন দেবীমূর্তি বলে মনে হচ্ছিল।'…

কেবল শিশুদের শিক্ষা নিয়েই মাথা ঘামাতেন না নিবেদিতা, সেইসঙ্গে বয়স্কা মেয়েদের শিক্ষাসমস্যার কথাও ভাবতেন। বাগ-বাজারের পাড়ায় অনেক বয়স্কা মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাঁর। তাদের মধ্যে অনেককে বিদ্যালয়ে এনে নানারকম শিক্ষণীয় বিষয় শেখাতে লাগলেন। ২রা নভেম্বর, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে নিবেদিতা বয়স্কা মহিলাদের জন্যে বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করলেন। কৃষ্টিন মেয়েদের সূচীশিক্ষা, লাবণ্যপ্রভা বসু পড়ানো এবং যোগীন-মা বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার ভার নিলেন। এই বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে নিবেদিতার চরিতকার 'প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভগিনী নিবেদিতা'-য় লিখেছেন: 'বিধবাশ্রম বা

অনাথাশ্রম স্থাপনে স্বামীজীর আগ্রহ কার্যে পরিণত না হইলেও এই বিদ্যালয় স্থাপনের দ্বারা নিবেদিতা অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। কৃস্টিনের সাহায্য ব্যতীত ইহা সম্ভব ছিল না।··· এইরূপে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে কোনরূপ অতিক্রম না করিয়া বিধবা ও বিবাহিতা নারীগণ সহজেই শিক্ষার সুযোগ পাইলেন। তখন মিশনারী বিদ্যালয়গুলিতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও অন্যান্য বিদ্যালয়ে দেশীয় ভাবের অভাব, এই দুই কারণে বিদ্যালয়ে যাতায়াতের ফলে কন্যাগণ বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় অভিভাবকগণ তাহাদের শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। ক্রমে ক্রমে সকলে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন যে, নিবেদিতার বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হিন্দু সংস্কৃতি ও রীতিনীতি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া সম্পূর্ণ দেশীয় ঢঙে জাতীয় শিক্ষা দেওয়া। অবশ্যই সর্বপ্রকার সাফল্যের মূলে ছিল নিবেদিতা ও কৃস্টিনের ঐকান্তিক উদ্যম ও পরিশ্রম। বাগবাজার পল্লীর বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া নিবেদিতা অভিভাবকগণের নিকট করজোড়ে তাঁহাদের কন্যাদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিতেন। তাঁহার ও কৃস্টিনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত আন্তরিকতা ও আগ্রহ সকল বাধা জয় করিয়াছিল।'···

(ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা—পৃঃ ২৬৬-২৬৭)

একজন প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজ নিবেদিতার বালিকা-বিদ্যালয় প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'ছোট কিণ্ডারগার্টেন হিসেবে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে এই শিক্ষায়তনটি এরূপ বেড়ে উঠলো যে বিয়ের যোগ্যা বহুসংখ্যক হিন্দু মেয়ে এখানে শিক্ষালাভের সুযোগ পেতো। বিধবা ও বিবাহিতার সংখ্যা আরও বেশী ছিল। নিবেদিতা ও তাঁর সহকর্মী-পরিচালিত এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে রেখে হিন্দু মেয়েদিকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া। বালিকা বা মহিলা কাউকেও নিজের বাড়ী থেকে আলাদা, বিজাতীয় ভাবাপন্ন পরিবেশে নিয়ে যাওয়া হতো না। এ যেন

সেই অঞ্চলেরই এক বাড়ী হতে অন্য বাড়ীতে যাওয়া মাত্র। বিজাতীয় ধর্ম অথবা সামাজিক প্রথার প্রতি মেয়েদের চিত্ত আকৃষ্ট করার বদলে এখানে ছিল দেশীয় আচার-ব্যবহার ও ভাবধারার মধ্যে দিয়ে সকলকে ভারতীয় আদর্শে উন্নত করার প্রচেষ্টা। শিক্ষয়িত্রীগণ নিজেরা সেইসব আদর্শ যতদূর সম্ভব অনুসরণ করতেন।'…

নিজের বিদ্যালয়ের পরিচালনা ব্যাপারে নিবেদিতা স্বয়ং লিখেছেন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগস্টের এক বিবরণীতে: '…বিবাহিতা মেয়েরা বাড়ীর বাইরে আসছেন এই ঘটনা (এদেশের) ইতিহাসে প্রথম। ক্রিস্টিনের ছাত্রীসংখ্যা কুড়ি হতে ষাট। তার রবিবার এবং আমার শনি, রবি দু'দিন ছুটি থাকে। প্রতি সোম ও বুধবার দুপুরে যখন বড় সেলাই-এর ক্লাস আরম্ভ হয়, তখন আমাদের সকলকেই খুব পরিশ্রম করতে হয়।'

নিবেদিতা নিজে প্রতিদিন সেলাই ও আঁকার ক্লাস নিতেন। পরে পড়াতেন ইতিহাস ও ইংরাজী।

নিবেদিতা-প্রতিষ্ঠিত এই বালিকা-বিদ্যালয় প্রসঙ্গে অনেকে অনেক নামে ডাকতো। স্থানীয় লোক বলতো 'সিস্টার নিবেদিতার স্কুল'। নিবেদিতা নিজে নাম রেখেছিলেন, 'রামকৃষ্ণ গার্লস স্কুল'। পাশ্চাত্যবাসীদের মধ্যে অনেকে বলতো—'বিবেকানন্দ স্কুল'। পরে নিবেদিতার দেহত্যাগের পর বিদ্যালয়ের নামকরণ হলো 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল'।

স্বামী সদানন্দ নিবেদিতার সঙ্গে থেকে তাঁকে সকল কাজে উৎসাহ জোগাতেন। ১৭নং বোস পাড়া লেনের বাড়ীতে স্থান সঙ্কুলান হচ্ছিল না দেখে ১৬নং বাড়ী ভাড়া নেওয়া হলো এবং সেখানে নিয়মিত ক্লাস চলতে লাগলো। নিবেদিতার একান্ত বাসনা ছিল যে বালিকাদের মত একদল বালককেও তিনি উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলবেন। তারা ছ'মাসকাল ভারত-পর্যটনে বেরুবে

অন্য ছ'মাস বিদ্যালয়ে পড়াশুনো করবে। দেশ পর্যটন করলে দেশের প্রতি প্রীতি ও জাতীয়তাবোধ যুগপৎ মনের মধ্যে ঠাঁই পাবে। এই কাজের উদ্দেশ্যে তাঁর চেষ্টায় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠিত হলো 'বিবেকানন্দ হোম'। এই ছাত্রাবাসটি 'বিবেকানন্দ সোসাইটি'র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতে লাগলো। একবার স্বামী সদানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদল ছাত্রকে নিয়ে বেরুলেন উত্তর ভারত পরিক্রমায়। তাঁরা কাঠগোদাম কেদার-বদরী প্রভৃতি স্থান ঘুরে এলেন। কিন্তু পরে অর্থের অভাবে তাঁর এই মহান্ পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। নিবেদিতার আর একটি বাসনা ছিল, তিনি একটি 'পত্রিকা' প্রকাশ করবেন। তার মাধ্যমে তিনি প্রচার করবেন জাতীয়তাবাদ। কিন্তু এবারও তাঁর এই মহান্ পরিকল্পনা মাঠে মারা গেল। তার মূলে ছিল অর্থসংকট। তিনি তখন অন্যের দ্বারা সম্পাদিত এবং পরিচালিত পত্রিকায় 'জাতীয়তাবাদ' প্রসঙ্গে নিয়মিত প্রবন্ধ প্রকাশ করতে লাগলেন।

১৭নং বোসপাড়া লেনের বাড়ীটিতে বহু নামী-অনামী মানুষের পদার্পণ হয়েছিল। এই বাড়ীটিতে নিবেদিতা ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিলেন। ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মিণ্টো নিজে ঐ বাড়ীতে এসেছিলেন নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতে। অনেকে আসতেন নানারকম উদ্দেশ্য নিয়ে। নিবেদিতা কারও কাছ থেকে কোন প্রতিদান আশা না করেই সাধ্যমত সাহায্য করতেন। ফলে সকলে তাঁকে প্রীতির চোখে দেখতো। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক র‍্যাটক্লিফ নিবেদিতার বাসায় প্রতি রবিবার সস্ত্রীক আসতেন এবং তাঁর সঙ্গে প্রাতরাশ করতেন। তিনি নিবেদিতা প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'প্রতি রবিবার সকালে তাঁর বাড়ীতে আমরা প্রাতরাশে যোগ দিতুম। প্রাতরাশের আয়োজন ছিল অতি সাধারণ কিন্তু হাস্যকৌতুক ও পরিশেষে নানারকম আলোচনার মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ সময় কেটে যেতো। নিবেদিতার

বাড়ীটি ছিল অতি সুন্দর বৈঠকখানা। নবাগত আমেরিকান অথবা ইংরেজের কলকাতায় অল্প সময় অবস্থানকালে নিবেদিতার বাড়ীতে তাঁদের দেখা পাওয়া যেতো। এছাড়া নানা চরিত্রের বহু ভারতীয়দের সঙ্গে পরিচয়ের এমন সুযোগ আর কোথাও ছিল না। কাউন্সিলের সদস্যরা বাংলাদেশে ও কলকাতার উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা যাঁদের নাম ও কাজ দৈনিক সংবাদপত্রগুলির প্রতিদিনের আলোচনার বিষয় ছিল, ভারতীয় শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, বক্তা, সাংবাদিক, ছাত্র সকলেই এখানে এসে জুটতেন। প্রায়ই রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সন্ন্যাসীকে দেখা যেত। দেশপর্যটক কোন পণ্ডিত, কোন ধর্মসম্প্রদায়ের কর্তা, অথবা সুদূর কোন প্রদেশাগত দেশনেতা সকলেই তাঁর বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন।'···

বিদ্যালয় পরিচালনা করা ছাড়াও অন্য অনেক জনসেবামূলক কাজ করতে হতো নিবেদিতাকে। গরমকালে বাগবাজার পল্লীতে যাতে প্লেগের উপদ্রব না হয় তার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন তিনি।

নিবেদিতা তাঁর বিদ্যায়তনটি বহু ব্যাপক আকারে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে লাগলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একদিন প্রস্তাব দিলেন, আপনার জায়গার অসুবিধা হলে আমার বাড়ীতে এসে বিদ্যালয় বসান। আমি বাড়ীর একাংশ ছেড়ে দিতে রাজী।

রাজী হলেন না নিবেদিতা। কবির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্য এর পেছনে অন্য আর একটি কারণ আছে। তা হচ্ছে আর্থিক অনটন।

এই আর্থিক অনটনের জন্যেই নিবেদিতা মাঝে মাঝে বই লিখতেন এবং সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে লেখা পাঠাতেন। "The Web of Indian life" বইটি আগেই লিখতে সুরু করেছিলেন নিবেদিতা। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে উইম্বলডনে এই গ্রন্থখানি লিখতে আরম্ভ করেন এবং ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে দার্জিলিং-এ বসে শেষ করেন।

এরপর তিনি লিখলেন 'The Story of Great God' অর্থাৎ 'মহাদেবের কাহিনী'। এই রচনাটি নিবেদিতা প্যারিসে স্বামীজী ও জগদীশ বসুর সামনে পাঠ করেছিলেন। পরে ওটি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হয়।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জানুআরি স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষে নিবেদিতা এলেন বেলুড় মঠে। পরদিন সাধারণ উৎসব ছিল। ঐদিনও নিবেদিতা স্বামীজী প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিলেন।

১৭ই জানুআরি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ। ঐদিন নিবেদিতা 'বিবেকানন্দ স্মৃতি-মন্দিরে' একটি ভাষণ দিলেন। স্বামী সারদানন্দ হলেন ঐ সভার সভাপতি। ঐ সভায় একাধিক বক্তা বক্তৃতা দিলেন। তাঁদের মধ্যে রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, মিঃ জে. চৌধুরী, সখারাম গণেশ দেউস্কর, 'নেশন' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ এন. ঘোষ ও ভগিনী নিবেদিতা।

এরপর নিবেদিতা কলকাতার বাইরে গিয়ে স্বামীজী প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিলেন। ২০শে জানুআরি রাত্রে তিনি বাঁকীপুর অভিমুখে যাত্রা করলেন। স্বামী সদানন্দ এই সময়ে জাপান থেকে ঘুরে এসেছিলেন। তিনিও চললেন নিবেদিতার সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গে আর একজন সাধক গেলেন। তাঁর নাম স্বামী শঙ্করানন্দ।

২৪

বুদ্ধগয়ায় নিবেদিতা

বিহার প্রদেশে ভ্রমণ করতে লাগলেন নিবেদিতা। রাজধানী পাটনার পূর্বনাম ছিল পাটলীপুত্র। একদা সম্রাট অশোকের রাজধানী ছিল। এখন ঐ স্থানটির কোন চিহ্ন নেই। কেবলমাত্র ভগ্নস্তূপ। সেই স্তূপ হতে একটি প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করলেন নিবেদিতা। এরপর তিনি ২৫শে জানুআরি বাঁকীপুর ত্যাগ করলেন। বাঁকীপুরে তিনি কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, 'ভারতে শিক্ষাসমস্যা', 'গীতা' 'আর 'স্বামীজীর মিশন'।

পাটনার 'বিহার হেরাল্ড', পত্রিকা লিখলো, 'ভগিনী নিবেদিতার ভাষণগুলি চিত্তাকর্ষক ও উচ্চ প্রেরণাদায়ক। ভারতে বিশেষ করে বিহার প্রদেশে এমন একজন বক্তার বিশেষ প্রয়োজন যাঁর উদ্দেশ্য যৌগিক রহস্যে দীক্ষাদান বা হিন্দুধর্মের জটিল ব্যাখ্যা নয়, পরন্তু জাতি হিসাবে ভারতীয়গণ যাতে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে তার জন্য কার্যকরী পথ ঠিক করা। আমাদের ছেলেদের শারীরিক শিক্ষা ও মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন আর আজ সকালে দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর প্রাণস্পর্শী, উল্লেখযোগ্য বক্তৃতাটি শ্রোতাদের জড়তা নাশ করে তাদেরকে কাজে প্ররোচিত করবে।'

সরস্বতী পূজোর দিন নিমন্ত্রণ পেলেন নিবেদিতা। 'পাটলীপুত্র হিন্দু বালক সংঘ' তাঁকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেখানে কিছু বলার জন্য। নিবেদিতা বালকদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে সেখানে গেলেন। ছাত্রদের কর্তব্য প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন, 'তোমাদের

সর্বদা চিন্তা করা উচিত ভারতজননী তোমাদের কাছ হতে কী চান। তোমরা সাহসী হও। তোমরা মহাভারতের কথা মনে রাখো। তোমাদের প্রথম কর্তব্য উত্তম আহার ও নিদ্রার প্রতি মনোযোগ অর্পণ, দ্বিতীয় কর্তব্য খেলাধুলায় যোগদান। তোমরা যে-শিক্ষা লাভ করছো তাতে এক বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করতেই অর্ধেক শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়।'

শেষকালে তিনি বললেন, 'আমাদের প্রয়োজন শক্তিশালী যুবাবৃন্দ। পড়াশোনাতেই সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে না যায়। তোমাদের লক্ষ্য হোক মাতৃভূমির কল্যাণ। সর্বদা মনে রেখো, সারা ভারতই তোমার দেশ আর এই দেশের বর্তমান প্রয়োজন কর্ম। জ্ঞান, শক্তি, সুখ ও ঐশ্বর্য লাভের জন্যে চেষ্টা করো। ঐগুলিই যেন তোমাদের জীবনের লক্ষ্য হয়। আর যখন সংগ্রামের আহ্বান আসবে তখন যেন তোমরা নিদ্রায় মগ্ন থেকো না।'

এরপর নিবেদিতা স্বামী সদানন্দের অনুপ্রেরণায় ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে মহিলাদের এক সভায় ভাষণ দিলেন। তার বক্তব্য বিষয় হলো জাপান। সকলে তাঁর বক্তৃতা শুনে প্রশংসা করতে লাগলো।

২৫শে জানুআরি বাঁকীপুর ত্যাগ করে তাঁরা বক্তিয়ারপুর হয়ে এক্কা করে এলেন রাজগৃহে বা রাজগীরে। পরদিন সকালে হাতীর পিঠে চড়ে নালন্দার ভগ্নস্তূপ দেখতে গেলেন। ২৭শে জানুআরি পুনরায় যাত্রা করলেন। এলেন বুদ্ধগয়ায়। এখানকার এক মোহন্তের বাড়ীতে এসে উঠলেন। বুদ্ধগয়ার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখার পর নিবেদিতা এলেন কাশীতে। অতঃপর কাশী থেকে ৩০শে জানুআরি তিনি লক্ষ্ণৌ যাত্রা করলেন। লক্ষ্ণৌতে থাকার সময় তিনি একাধিক বক্তৃতা দিলেন। তাদের মধ্যে প্রধান হলো, 'আজকের সমস্যা', 'শিক্ষা', 'বুদ্ধগয়া ও হিন্দুধর্মে এর স্থান', 'ভারতে মুসলমান', 'প্রকৃত গুরুভক্তি' আর 'হিন্দু-মুসলমান মিলন'।

লক্ষ্ণৌ হতে নিবেদিতা কলকাতায় ফিরলেন। এখানে এসে ১৬ই ফেব্রুআরি তিনি বক্তৃতা দিলেন 'বুদ্ধগয়া' প্রসঙ্গে। বক্তৃতাটি ছিল বুদ্ধগয়ার বুদ্ধমন্দিরের পরিচালন-ব্যবস্থা নিয়ে আন্দোলন প্রসঙ্গে। মন্দিরের অধিকার প্রকৃতভাবে বৌদ্ধদের হাতে যাওয়া উচিত—এই ছিল আন্দোলনের বিষয়বস্তু। নিবেদিতা প্রমাণ করলেন যে, শঙ্করাচার্যের আমল হতে তাঁর নির্দেশমত বুদ্ধগয়া-মন্দিরের পরিচালন-ব্যবস্থা চলে আসছে। এর কোনরকম পরিবর্তন অযৌক্তিক। এই আন্দোলনের বিপক্ষে তিনি স্টেট্‌সম্যান, অ্যাডভোকেট, টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া, ট্রিবিনে, বম্বে ক্রনিকল, বিহার হেরাল্ড প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন।

২৭শে ফেব্রুআরি টাউন হলে 'ডাইনামিক রিলিজিয়ান' প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিলেন নিবেদিতা। ২০শে মার্চ কোরিপস্থিয়ান থিয়েটারে কলকাতা মাদ্রাসা এক সভার আয়োজন করে। ঐ সভায় নিবেদিতা 'এসিয়ায় ইস্‌লাম' প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিলেন। পরে ১লা এপ্রিল ক্লাসিক থিয়েটারে 'বুদ্ধগয়া' প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিলেন।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে আমন্ত্রণ পেয়ে নিবেদিতা কাশী অভিমুখে রওনা হলেন। যাবার পথে তিনি পুনরায় গেলেন বুদ্ধগয়ায়। কাশীর জনসভায় তিনি 'ধর্ম ও ভবিষ্যৎ', 'নাগরিক জীবন' ও 'শিক্ষাসমস্যা' নিয়ে বক্তৃতা দিলেন।

গ্রীষ্মের ছুটি এসে গেল। মিসেস্ সেভিয়ার অবস্থান করছিলেন মায়াবতীতে। তিনি আমন্ত্রণ জানালেন, নিবেদিতা আমার এখানে গরমের ছুটিটা কাটিয়ে যেতে পারে।

আমন্ত্রণ পেয়ে নিবেদিতা রওনা হলেন মায়াবতী অভিমুখে। সঙ্গে গেলেন কৃষ্টিন, জগদীশচন্দ্র বসু, অবলা বসু এবং শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু। এই মায়াবতীতে অবস্থানকালে নিবেদিতা

১৭ই মে ইংরেজী ভাষায় জগদীশচন্দ্র বসুর বিখ্যাত গ্রন্থ উদ্ভিদের সাড়া বা Plant Response লেখেন।

মায়াবতীতে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে নিবেদিতা ২৩শে জুন ফিরে এলেন কলকাতায়।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই। এই দিনে গ্রীষ্মের ছুটির পর প্রথম বিদ্যালয় খুললো। ১৬নং বাড়ীতে পুনরায় ক্লাস চলতে লাগলো। এই সময় শ্রীমা ঐ বাড়ীতে এসে শিক্ষিকা আর ছাত্রীদের আশীর্বাদ জানালেন।

আবার এলো অক্টোবর মাস। এবার পূজোর ছুটি। নিবেদিতা আবার চললেন বুদ্ধগয়া অভিমুখে। এবার তাঁর সঙ্গে গেলেন একটি বিরাট দল। নিবেদিতা, কৃস্টিন, জগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীমতী অবলা বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিঃ ও মিসেস্ র‍্যাটক্লিফ, স্বামী সদানন্দ এবং স্বামী শঙ্করানন্দ। পাটনা হতে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এবং মথুরানাথ সিংহ যোগ দিলেন।

বুদ্ধগয়ায় গিয়ে নিবেদিতা বেশ ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে পঠন-পাঠন এবং বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁর গুরুদেব বুদ্ধদেবকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। নিবেদিতাও গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই মহান্ মানবপ্রেমিকের মানবতার আদর্শ শ্রদ্ধার চোখে দেখতে লাগলেন। তিনি বৌদ্ধযুগের ঐতিহাসিক তথ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন: 'বৌদ্ধধর্ম প্রকৃতপক্ষে প্রথমে একটি নতুন ধর্ম ছিল না। বুদ্ধ একজন হিন্দু আচার্য ছিলেন, তবে ঐ সময়ের অন্যান্য সন্ন্যাসীদের চেয়ে অনেক উঁচুস্তরের। তাঁর অনুগামীরা হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা নিজেদের নতুন সম্প্রদায় বলে মনে করতেন না। তবে জানতেন, তাঁরা প্রতিবেশীদের চেয়ে সৎ ও ধর্মে বিশ্বাসী হিন্দু। রামকৃষ্ণের অনুবর্তীরা যেমন নিজেদের হিন্দুসমাজের বহির্ভূত মনে করেন না, তাঁরা হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত। কেবল তাঁদের ধারণা, রামকৃষ্ণ বর্তমান যুগের অন্যান্য

আচার্য বা সন্ন্যাসীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সারা বৌদ্ধযুগে হিন্দুধর্ম জীবন্ত ছিল যদিও বৌদ্ধ লেখকরা এ বিষয়ে নীরব। আমি যদি আমার গুরুদেবের জীবনকাহিনী ও শিক্ষা বর্ণনা করি তবে স্বভাবতঃই তাতে বৈষ্ণবধর্মের কোন উল্লেখ থাকবে না। আমার গুরুদেবের সঙ্গে তুলনা করে শ্রীচৈতন্যের বিষয় কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ গুরুদেবকেই আমি বর্তমান যুগে শ্রেষ্ঠ আচার্য বলে বর্ণনা করবো। কিন্তু পরবর্তীকালে কোন ঐতিহাসিক যদি আমার বই থেকে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, রামকৃষ্ণের বহিরঙ্গ ভক্তেরা বৈষ্ণবধর্ম থেকে একটি পৃথক সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন অথবা হিন্দুসমাজ থেকে চৈতন্যের অনুগামীদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন ও নিষ্ঠুরভাবে তাদের মেরে ফেলেছিলেন, তাহলে ঐ ঐতিহাসিক কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। হিন্দুদের অত্যাচারে বৌদ্ধরা ভারত থেকে বিতাড়িত, এ ইতিহাস আমার কাছে মিথ্যা বলে মনে হয়। খ্রীষ্টধর্ম ও ইস্‌লাম ধর্মের মধ্যে যে বিরোধ, হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে তা কখনও ছিল না।'

এর পর বুদ্ধগয়া পরিত্যাগ করলেন নিবেদিতা। আসার সময় দুঃখে অভিভূত হয়ে অশ্রু বিসর্জন করলেন। ভাবলেন ভারতের প্রাচীনকালের শৌর্যবীর্য আর মহান্ ঐতিহ্যের কথা। বর্তমানে ভারতের কি দৈন্যদশা! তিনি গভীর আক্ষেপের সঙ্গে বললেন আমরা ব্যর্থ হয়েছি। দেশের গভীর নিদ্রা এখনও ভাঙেনি। জীবনের সঞ্চার দেখা যায় না। জনসাধারণ আমার কথা শুনতে আসে কিন্তু পরক্ষণেই সব ভুলে গিয়ে গতানুগতিক পথে চলে। আমরা কিছুই করতে পারিনি। যে মহা জাগরণ একদিন ভারতকে বিশ্বের গর্ব ও এসিয়ার কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেছিল তার অন্তরাত্মার সেই পুনর্জাগরণ এখনও ঘটেনি। কবে আবার এই জাতি তার মহান্ উত্তরাধিকার ও মানবজাতির চিন্তা ও সভ্যতার সংগঠনে একদিন সে যে বিশেষ স্থান লাভ করেছিল সে সম্বন্ধে

অবস্থিত হবে? কবে আবার সেই শক্তি, সেই উৎসাহ ফিরে আসবে?

বুদ্ধগয়া হতে নিবেদিতা এলেন কাশীর সারনাথ স্তূপ দেখতে। তারপর যান রাজগীরে। রাজগীরের পুরনো ঐতিহ্য স্মরণ করে লিখলেন একটি প্রবন্ধ—'Rajgir—an ancient Babylon'—রাজগীর—প্রাচীন ব্যাবিলন।

২৫

নিবেদিতা, বিপ্লববাদ ও স্বদেশী আন্দোলন

আমাদের ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসকদের অধীনে ছিল। আমরা সর্বপ্রকারে দুর্বল হয়ে পড়েছিলুম। আমাদের মধ্যে জাগরণ আসার জন্যে নানাপ্রকার চেষ্টা চলতে লাগলো। জাগরণ না এলে পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন হলো বিপ্লব। বিপ্লব মানে জনে জনে অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষ নয়, পরন্তু জড়মনকে চৈতন্য-শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করা। যেসব মনীষীরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে ভারতীয় জনজীবনে জাগরণের বন্যা আনার চেষ্টা করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁদের প্রচেষ্টাকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছেন। তিনি ছিলেন চরমপন্থীর মানুষ। এই দিক হতে তাঁর সঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে যথেষ্ট মিল ছিল। তখনকার দিনে কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে একশ্রেণীর মানুষ ছিলেন, যাঁরা পছন্দ করতেন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-শক্তি। তাঁরা ভাবতেন এই শক্তি ব্যর্থ হলে তখন প্রকাশ পাবে সশস্ত্র বিপ্লব। তাই প্রথম প্রথম তাঁরা শুধু

সমিতি, অনুশীলন সমিতি প্রভৃতি সমিতির মাধ্যমে স্বাধীনতা-সংগ্রামের কর্মীদের গড়েপিঠে তুলতে লাগলেন। গোপনে গোপনে এইসব তরুণ যোদ্ধাদের মনে ধর্ম, জাতীয়তাবোধ, আচার-আচরণ, স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লেখাপড়া, বক্তৃতা এবং পত্রিকার মারফত প্রবন্ধ প্রকাশ করা হলো। সেইসঙ্গে চললো জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এদেশের তরুণকে আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা। শ্রীঅরবিন্দ, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা 'ডন', 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি পত্রিকায় ধর্ম, শিক্ষা, জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে একাধিক প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। ভগিনী নিবেদিতাও অনেক প্রবন্ধ লিখলেন স্বনামে এবং বেনামে। কেবল লেখা নয়, অনেক সময় বক্তৃতাও দিতেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুআরি ডন সোসাইটিতে বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ভারতীয় আদর্শ'। ঐ বছর ২৩শে ফেব্রুআরিতে আর্ট স্কুলে 'ললিতকলা' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ১৩ই আগস্ট রামমোহন লাইব্রেরিতে 'কি কি পুস্তক পঠনীয় এবং কেন' শীর্ষক বক্তৃতা দেন। ২০শে অগস্ট পুনরায় 'ডন' সোসাইটিতে 'পরিবার না স্বদেশ' নামে বক্তৃতা দেন। তিনি নিজে কখনো বিপ্লবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি তবে সক্রিয় আন্দোলনের অন্তরালে তাঁর সমর্থন ও সহানুভূতি ফল্গুধারার মত কাজ করেছিল। তিনি ছিলেন জাতিতে আইরিশ। আয়র্ল্যাণ্ড স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেছে। ইংরেজদের অধীনতাপাশ হতে মুক্তির জন্যে আপ্রাণ লড়েছে। স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামের অনুকূলে নিবেদিতা অনেকবার মত প্রকাশ করেছেন। পরে ভারতে এসে তিনি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করলেও পরোক্ষভাবে অর্থাৎ স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের কানে কানে জাতীয়তাবাদের মন্ত্র শুনিয়েছিলেন। মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তাদের কাছে বীরবাণী

এবং বীরগাথা তুলে ধরেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, পরাধীন ভারতবাসীরা মনে-প্রাণে দুর্বল। তাদের কানে যদি জাগরণের মন্ত্র শোনানো যায়, তাহলে তারা আত্মশক্তি ও চৈতন্যশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা-যুদ্ধে আত্মাহুতি দিতে পারবে। তাই তিনি অন্যভাবে বিপ্লবীদের সাহায্য করতে লাগলেন, কখনো শিক্ষার মাধ্যমে, কখনো বক্তৃতাবলীর দ্বারা, কখনো ধর্মের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার ভিত্তিতে আবার কখনো বা দেশ-বিদেশের বীর বিপ্লবীদের জীবনীগ্রন্থ দান করে। এই প্রসঙ্গে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা তাঁর গ্রন্থ 'ভগিনী নিবেদিতা'য় লিখেছেন: '...শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন, নিবেদিতা তাঁহাকে পিটার ক্রাপ্টকিন্ ও ম্যাটসিনির পুস্তকাবলী উপহার দিয়াছিলেন এবং তাঁহার মারফত বাংলার বিপ্লব সমিতিকে ম্যাটসিনির আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ড দান করিয়াছিলেন। (Swami Vivekananda—Patriot Prophet, P. 119)। এ পুস্তকগুলি দেশের সর্বত্র সরবরাহ করা হইত। অতএব গুপ্তসমিতির সহিত নিবেদিতার যোগাযোগ ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গুপ্তসমিতি স্থাপনে অরবিন্দের উদ্দেশ্য ছিল গোপনে রাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুতি, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামকে অরবিন্দ প্রকাশ্যভাবে অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতি হিসাবে গ্রহণ করেন। তবে উহাই একমাত্র নীতি ছিল না এবং বাংলা দেশে অবস্থানকালে তিনি গোপনে বিপ্লবকার্য পরিচালনা করেন। উদ্দেশ্যসাধনে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বিফল হইলে যাহাতে প্রকাশ্য সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করা যাইতে পারে, তজ্জন্যই এই প্রস্তুতি (Sri Aurobindo on Himself, P. 34)'। নিবেদিতার ইহাতে সমর্থন থাকা অসম্ভব নহে। কারণ, দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তিনি ঠিক অহিংস ছিলেন না। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে পাটনায় বক্তৃতাকালে ছাত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমাদের প্রয়োজন শক্তিশালী যুবকবৃন্দের।

······দেশের কল্যাণ যেন তোমাদের জীবনের লক্ষ্য হয়। সর্বদা স্মরণ রাখিও, সমগ্র ভারতবর্ষই তোমার স্বদেশ, এবং বর্তমান এই দেশের প্রয়োজন কর্ম। আর যখন সংগ্রামের আহ্বান আসিবে, তখন যেন নিদ্রায় মগ্ন থাকিও না।'

'স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনে সশস্ত্র সংগ্রাম এবং তাহার জন্য গোপন প্রস্তুতি যেখানে প্রকাশ্যে প্রস্তুতির কোন সম্ভাবনা নাই—নিন্দনীয় নহে। গুপ্ত সভা-সমিতির সৃষ্টির কারণও ইহাই। পরাধীন দেশে বিদেশী শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার বা উহা পরিবর্তন করিবার প্রকাশ্য ক্ষমতার অভাবে গোপন আন্দোলনের সৃষ্টি অনিবার্য। সুতরাং নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, সমিতি গঠনপূর্বক গোপন আন্দোলনের দ্বারা স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য দেশকে প্রস্তুত করায় নিবেদিতার সমর্থন এবং উৎসাহ ছিল। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি গুপ্তসমিতিতে বিপ্লববাদের পুস্তক উপহার দেন এবং স্বয়ং উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতার দ্বারা যুবকগণের হৃদয়ে বিশেষ প্রেরণা সঞ্চার করিতেন। কিন্তু এই গুপ্তসমিতির পরিচালনার ব্যাপারে তাঁহার কোন দায়িত্ব ছিল না। বিশেষতঃ এই গুপ্তসমিতি হইতে পরে যে বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ এবং সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি হয়, তাহার সহিত তাঁহার কোন সংস্রব ছিল না, বা তিনি সক্রিয়ভাবে ইহাতে যোগদান করেন নাই। কোন কার্যে উৎসাহদান বা সমর্থন এক কথা, আর পরিচালনা বা সক্রিয় যোগদান অন্য কথা।······(পৃঃ ৩০০—৩০২)

'···বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর গুপ্তডাকাতি ও গুপ্তহত্যার মাধ্যমে বিপ্লববাদ আত্মপ্রকাশ করে। ১৯০৬ হইতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বহু হত্যা ও ডাকাতি হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অরবিন্দ-প্রবর্তিত গুপ্তসমিতির কার্যসূচী হইতে পরবর্তীকালের বিপ্লবাত্মক অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ পৃথকভাবে দেখা দিয়াছিল; এই সকল বিপ্লবাত্মক কার্য প্রধানতঃ কয়েকজন ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত।

নিবেদিতা যে এই গুপ্তডাকাতি এবং হত্যার বিরোধী ছিলেন, তাহার স্বপক্ষে বহু যুক্তি এবং প্রমাণ আছে।

'ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি যুবক অনুমতি না নিয়ে কোথাও উধাও হল। কয়েকদিন বাদে তারা ফিরলে যতীন্দ্রনাথ কৈফিয়ত তলব করলেন। প্রথমটা তারা কিছু না বলে মুখ বুজে রইল। তারপর যতীন্দ্রনাথ চাবুক হাতে নিয়ে তাদের শাসন করতে গিয়ে বললেন—সব কথা পরিষ্কার কর, নৈলে রক্ষা রাখব না। তখন তারা স্বীকার করল আর একজনের সোৎসাহে তারা তারকেশ্বরে ডাকাতি করতে গিয়েছিল। যেখানে টাকা ছিল বলে তাদের সংবাদ সেখানে দেখল কয়লার কাঁড়ি। এই ঘটনা সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা যতীন্দ্রনাথের কাছে আগেই নালিশ করেন যে কয়েকটি যুবক তাঁর রিভলভারটি ধার চাইতে গিয়েছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁকে এই প্রস্তাবিত ডাকাতির কথা বলা হয়। নিবেদিতা খুব অসন্তুষ্ট হন। যন্ত্রটি দিলেন না। উপরন্তু যতীন্দ্রনাথের কাছে সব কথা ফাঁস করে দেন'। (শ্রীমৎ নিরালম্ব স্বামী, পৃঃ ১০)

'ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, একবার বিপ্লবী দেবব্রত বসু নিবেদিতার বাড়ী গেলে কথাপ্রসঙ্গে নিবেদিতা তাঁহাকে বলেন, 'তোমাদের গুপ্ত-আন্দোলন সম্বন্ধে কোন কথা আমাকে বলো না।' ইহার বহুদিন পরে কৌতূহলী হইয়া তিনি একদিন দেবব্রত বসুকে গুপ্ত-আন্দোলন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে দেবব্রত তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, ইতিপূর্বে তিনি ঐ বিষয়ে কোন কথা তাঁহাকে বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। নিবেদিতা চুপ করিয়া যান। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় যখন ভূপেন্দ্রনাথের সহিত নিবেদিতার দেখা হয়, তখন তিনি পুনরায় ভূপেন্দ্রনাথকে বিপ্লব আন্দোলন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনিও দেবব্রত বসুর উত্তরের পুনরাবৃত্তি

করেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার পুস্তকেও ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

'ইহাতে কি অনুমান হয় যে, নিবেদিতা গুপ্ত-সমিতির দলটিকে আগাগোড়া পরিচালিত করিয়া বিপ্লব শিক্ষা দিয়াছেন? গোপনে বিপ্লব আন্দোলন ও ষড়যন্ত্রের ইতিহাস অন্য রূপ। ইহাতে অরবিন্দ প্রথমাবধি জড়িত ছিলেন, ও তাঁহার নির্দেশানুসারে 'যুগান্তর' দল কর্তৃক বিপ্লবকার্য, অর্থাৎ হত্যা, ডাকাতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী যে কয়খানি পুস্তক হইতে নানা তথ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার কোথাও নিবেদিতার কোন উল্লেখ নাই। প্রকৃতপক্ষে আজ পর্যন্ত, বিপ্লব সম্বন্ধে তদানীন্তন বিপ্লবীগণ কর্তৃক রচিত কোন পুস্তকে নিবেদিতার বিপ্লবে সক্রিয় সম্পর্কের উল্লেখ নাই। কোন কোন পুস্তকে এইমাত্র আছে যে, বিপ্লবকার্যে তাঁহার সহানুভূতি ছিল ও তিনি বিভিন্ন পুস্তক উপহার দিয়াছেন।

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীমতী অবলা বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যদুনাথ সরকার, বিনয়কুমার সরকার প্রভৃতি মনীষীগণ যাঁহারা নিবেদিতার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচিত ছিলেন এবং এস. কে. র‍্যাট্‌ক্লিফ্, অধ্যাপক প্যাট্রিক গেড্‌সিস, মিঃ এইচ্ ডব্লিউ নেভিনসন, মিঃ এ. জে. এফ. ব্লেয়ার, এফ. জে. আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি তাঁহার বন্ধুগণের কেহই তিনি বিপ্লবী ছিলেন বা বিপ্লব আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, এ কথা বলেন নাই। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন, নিবেদিতা ভারতবর্ষকে ভালবাসিয়া স্বদেশ রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ও তাহার সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন।'......(পৃঃ ৩০৭—৩০৮)

নিবেদিতা ছিলেন চিন্তায় বিপ্লবী। তিনি কোন জায়গায় কোন প্রকার অন্যায় সহ্য করতে পারতেন না। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে এদেশে জ্বলে ওঠে এক গণবিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। ঐ বছরে ১১ই ফেব্রুআরিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সমাবর্তন উৎসবে ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন এক মন্তব্য করলেন: 'প্রাচ্য অপেক্ষা প্রতীচীর লোকদের কাছেই সত্য বিশেষ আদৃত।'

নিবেদিতা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বিপ্লবী মনে দেখা দিল বিদ্রোহের আগুন। কার্জনের কথা তিনি বরদাস্ত করতে পারলেন না। তক্ষুণি তিনি উঠে-পড়ে লেগে গেলেন কার্জনের ঐ মন্তব্য খণ্ডন করতে। লর্ড কার্জন একটি ভ্রমণ-কাহিনী লিখেছিলেন। তার নাম 'প্রবলেমস্ অব দি ফার্ ইস্ট।' ঐ গ্রন্থের এক জায়গায় কার্জন লিখেছেন যে, তিনি যখন কোরিয়ায় যান তখন ওখানকার পররাষ্ট্র-দপ্তরের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করার জন্যে তিনি অসঙ্কোচে মিথ্যে কথা বলে নিজের বয়স তেত্রিশ হতে চল্লিশ বছর বাড়িয়ে দেন।

পরদিনই নিবেদিতা চলে এলেন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র অফিসে। সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করে কার্জনের লেখার অংশ এবং নিজের মন্তব্যসহ প্রবন্ধ পেশ করলেন। সম্পাদক সেটি পত্রিকায় প্রকাশ করলেন। তাতে করে লর্ড কার্জনের শঠতাপূর্ণ এবং দাম্ভিকতাযুক্ত মিথ্যাভাষণ সকলের কাছে প্রকাশিত হলো। ১৪ই ফেব্রুআরি পুনরায় ওটি স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হলো।

কেবল একটা ঘটনা নয় এরকম অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যায়। নিবেদিতা বিদেশিনী হলেও এদেশে এসে সম্পূর্ণ এদেশের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর মনে এদেশবাসীদের সম্বন্ধে কোনরকম কূট মন্তব্য বা তিক্ত কথা শুনলে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠতো। তিনি তখন তেজস্বী লেখনী ধারণ করে জ্বালাময়ী ভাষায় প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর প্রবন্ধগুলি সম্পূর্ণ এদেশবাসীদের

স্বার্থের অনুকূল হতো বলে তারা তাঁর যথেষ্ট প্রশংসা করলে। অল্পকালের মধ্যে তিনি সকলের কাছে পূজনীয় হয়ে উঠলেন—হলেন লোকজননী—কল্যাণময়ী লোকমাতা।

লোকে তাঁকে 'মা' বলে সম্বোধন করতে লাগলো। নিবেদিতাও তাদের মর্মবাণী হৃদয় দিয়ে অনুভব করে তাদের জীবনদুঃখ দূর করার জন্যে যত্নবতী হলেন।

নিবেদিতা প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

'এইজন্যই একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল যাঁর অসামান্য শিক্ষা ও প্রতিভা, তিনি এক গলির কোণে এমন কর্মক্ষেত্র বেছে নিলেন যা পৃথিবীর লোকের চোখে পড়বার মত একেবারেই নয়। বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি যেমন তার সব বিপুল শক্তি নিয়ে মাটির নীচেকার অতি ক্ষুদ্র একটি বীজকে পালন করতে অবজ্ঞা করে না, এও তেমনি। ……জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের যে বোধ তা পুঁথিগত—এ সম্বন্ধে আমাদের বোধ কর্তব্যবুদ্ধির চেয়ে গভীরতায় প্রবেশ করেনি। কিন্তু মা যেমন ছেলেকে সুস্পষ্ট করে জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তা রূপে উপলব্ধি করতেন। তিনি এই বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতই ভালবাসতেন। তাঁর হৃদয়ের সব বেদনার দ্বারা তিনি এই 'পীপল'কে (People), এই জনসাধারণকে আদৃত করে ধরে ছিলেন। এ যদি একটিমাত্র শিশু হতো তবে একে তিনি নিজের কোলের ওপর রেখে নিজের জীবন দিয়ে মানুষ করতে পারতেন।

'বস্তুতঃ তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাইরে একটি সমগ্র দেশের ওপর নিজেকে ব্যাপ্ত করতে পারে তার মূর্তিও এর আগে আমরা দেখিনি। এ সম্বন্ধে পুরুষের যে কর্তব্য-বোধ তার কিছু কিছু আভাস পেয়েছি কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তা প্রত্যক্ষ করিনি। তিনি যখন বলতেন our people

তখন তার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগতো আমাদের কারও গলায় তেমনটি তো লাগে না।'...(পরিচয়, পৃঃ ৯৭—১০০)

এক নতুন ভাবধারা নিয়ে আসে বিপ্লব এবং আন্দোলনের বন্যা পুরোনো জগদ্দলকে সরিয়ে দেবার জন্যে। জনগণের জড়মনে চেতনার সঞ্চারের জন্য এবং তাদের জীবনকল্যাণের যে বহুমুখী কর্মধারা তার পেছনে বিপ্লব বা আন্দোলন না থাকলে সেই কর্মধারা সফল হয় না। বাংলাদেশে তথা ভারতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমে এইরকম জনচেতনার জাগরণ এসেছিল। আবির্ভূত হয়েছিলেন একাধিক মনীষী জাতির ও যুগের প্রয়োজনে বিভিন্ন কাজ নিয়ে। এদেশে তখন ধর্মে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, কাব্যে, দর্শনে, সাংবাদিকতায়, রাজনীতিতে এবং চিত্রশিল্পে নতুন ভাবধারা নিয়ে নতুন প্রতিভাধর মহামানবগণ এলেন। ধর্মে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, সাহিত্যে এলেন বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ, কাব্যে এলেন মধুসূদন-দ্বিজেন্দ্রলাল-রবীন্দ্রনাথ, দর্শনে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিজ্ঞানে আচার্য জগদীশ-প্রফুল্লচন্দ্র, চিত্রে অবনীন্দ্রনাথ, সাংবাদিকতায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রাজনীতিতে সুরেন্দ্রনাথ-অরবিন্দ-তিলক। এক কথায় ভারতের জাতীয় জাগরণের শতমুখী দীপ প্রথম জ্বলে উঠলো ভারতের পূর্বপ্রান্তে, অখণ্ড বঙ্গদেশে। তারপর তার দীপ্তি ছড়িয়ে পড়লো সমগ্র ভারতভূমিতে। ভগিনী নিবেদিতা বিদেশিনী হয়েও ভারতের এই জাতীয় জাগরণের দীপটি নিজের হাতে বয়ে নিয়ে গেলেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। তাঁর হাতে দীপটি দেখে ভারতবাসীগণ যেমন একদিকে বিস্মিত হয়েছিল তেমনি অন্যদিকে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছিল। তাঁর ১৭নং বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে তখনকার বাংলা তথা ভারতের মহামানবগণের যাতায়াত ঘটেছে। নিবেদিতা তাঁদের সঙ্গে দেশের নানা বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন। বিশেষভাবে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের যোদ্ধাদের মনে-প্রাণে

উৎসাহ দিয়ে এসেছেন মহান্ জাতীয়তা এবং স্বদেশপ্রেমের পটভূমিকায়। কবি রবীন্দ্রনাথ, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু, তাঁর স্ত্রী অবলা বসু, তাঁর ভগ্নী লাবণ্যপ্রভা বসু, রাজনীতিবিদ্ বিপিন পাল, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক দীনেশ সেন, শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ডঃ কুমারস্বামী, নন্দলাল বসু, অর্থনীতিবিদ্ রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ নিবেদিতার কাছ থেকে নানাভাবে প্রেরণা ও উৎসাহ পেয়েছেন তাঁদের স্ব স্ব সাধনক্ষেত্রে। এইসব মহামানবগণ উত্তরজীবনে স্ব-প্রতিষ্ঠ হয়ে সকলেই একবাক্যে নিবেদিতার কাছে ঋণ স্বীকার করে যান।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় হতে কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে এদেশের জনচিত্তে বিক্ষোভ দেখা দেয়। তার আগেই ১৩ই মার্চ নিবেদিতা ব্রেন ফিভারে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি প্রায় একমাস যাবৎ জ্বরে ভুগলেন। পরে একটু ভাল হয়ে উঠলে তিনি মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কৃস্টিনের সঙ্গে দার্জিলিং যাত্রা করলেন। তাঁর সঙ্গে বসুদম্পতিও গেলেন। ৩রা জুলাই তিনি দার্জিলিং হতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করলেন। এই সময় তিনি কংগ্রেসের চরমপন্থী এবং নরমপন্থী উভয়পন্থী নেতাদের সঙ্গে দেশের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। বিপিনচন্দ্র পাল, গোখলে প্রমুখ রাজনীতিবিদ্‌গণ নিবেদিতার বাড়ীতে আসাযাওয়া করতে লাগলেন।

এর আগে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের উদ্যোগে বাংলাদেশে যে বিপ্লব-সমিতি হয়েছিল তাতেও বক্তৃতা প্রদান করলেন নিবেদিতা।

স্বদেশী আন্দোলনের কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম-আন্দোলন বিস্মৃত হননি নিবেদিতা। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রতি শিক্ষিত সমাজের নতুন করে অনুরাগী করার জন্যে নিবেদিতা অনেক পরিশ্রম করলেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে "Aggressive Hinduism"

সম্বন্ধে তিনটি প্রবন্ধ রচনা করলেন। হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক মিঃ নটেশান ৩টি প্রবন্ধ পুস্তকের আকারে প্রকাশ করলেন। এই প্রবন্ধে তিনি হিন্দুধর্মের মহিমাকীর্তন করে লিখলেন: 'বিপ্লব ও বিবর্তনজনিত ক্লান্তি ও অবসাদের ফলে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভারতের প্রকৃত সমস্যার সঙ্গে জাতীয় মনের পরিচিতি ঘটে ওঠে নি। আর তার স্বরূপও ভাষায় রূপায়িত হতে পারে নি। আজ প্রথম পর্বের শেষ। ভারতীয় জীবন আর জড়তাগ্রস্ত নয়। সে এক নতুন শক্তির সন্ধান পেয়েছে—আর বর্তমান ও বিগতকালের সামগ্রিক জীবনকে বিশ্লেষণ করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তারই পটভূমিকায় ভবিষ্যৎ ভারত গড়ে তুলতে আজ কৃতসঙ্কল্প।

'হে ভারতসন্তান, তোমরা প্রাচীনের সমগ্র ঐতিহ্যকে পুজো করতে শেখো। নীরন্ধ্র আগ্রহে জ্ঞান আহরণ করো। যে চিন্তা ও ভাষা তোমাকে প্রাচীনের গভীরে নিহিত অতুল সম্পদ আবিষ্কার করতে সাহায্য করবে তা তোমার কাছেই রয়েছে, বিদেশীর কাছে নেই। এই প্রকার অনুসন্ধিৎসা ও সত্যোদ্ঘাটনের ওপরই নির্ভর করে ভারতের ভবিষ্যৎ। যে সত্যকেই কেন্দ্র করে চলে, উৎসাহ ও উদ্দীপনাই হয় তার অফুরন্ত পাথেয়। নৈরাশ্য তাকে প্রতিহত করতে পারে না। আজ প্রতিটি ভারতীয় ভাষায় বৃহৎ সাহিত্য রচনা করতে হবে। এই সাহিত্যের মাধ্যমে প্রাচীনকে করতে হবে মুখর, বর্তমানকে দিতে হবে রূপ আর এই উভয়ের সমবায়েই ফুটে উঠবে ভবিষ্যৎ ভারতের অতি উজ্জ্বল আলেখ্য।

'কেবল জগতের সামনে ভারতের পরিচিত করা নয়। যাতে ভারতের মর্মবাণী ভারতবাসীর হৃদয়ঙ্গম হয়, এই হবে প্রকৃত সাধনা, এইটিই বর্তমানে কর্তব্য। জাতির সামনে আত্মপ্রকাশ করেছে এক বিরাট সংগ্রাম যা জাতীয় জীবনকে করে তুলেছে আক্রমণশীল।'

৩রা জুলাই নিবেদিতা সুস্থ হয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন।

ঐ সময়ে তিনি জগদীশচন্দ্রের Plant Response বইটি লিখতে লাগলেন। সুতরাং সম্পূর্ণ বিশ্রাম তাঁর ভাগ্যে জুটলো না।

২২শে জুলাই বঙ্গ-বিভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হলো। তার প্রতিবাদস্বরূপ ৭ই অগস্ট টাউনহলে বসলো নাগরিক-সভা। ঐ সভায় যোগদান করেছিলেন নিবেদিতা, কিন্তু বক্তৃতা দেননি।

বঙ্গ-বিভাগ আইনে পরিণত হলো ২৯শে সেপ্টেম্বর। ১৬ই অক্টোবর ঐ আইন কাজে পরিণত হবার দিন ধার্য হলো। ঐদিন অখণ্ড বাংলার নিদর্শনস্বরূপ সংগঠনমূলক কিছু কাজ করার জন্যে সুরেন ব্যানার্জী মিলন-মন্দির স্থাপনের প্রস্তাব করলেন। নিবেদিতা তাঁর ঐ প্রস্তাবে সমর্থন জানালেন।

১৬ই অক্টোবর মিলন-মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এক বিরাট সভার আয়োজন করা হলো। নিবেদিতা ঐ সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন নি। কারণ তার আগেই তিনি দার্জিলিং যাত্রা করলেন। তবে প্রতি বছর ঐ দিনটি তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করতেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে স্বদেশজাত শিল্প উৎপন্ন করে তার দ্বারা কিভাবে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন আনা যায় তার উপায় চিন্তা করতেন নিবেদিতা। বাগবাজারের বাসিন্দা ডঃ শশীভূষণ ঘোষের স্ত্রী শ্রীমতী নগেন্দ্রবালার সঙ্গে বেশ হৃদ্যতা ছিল নিবেদিতার। তিনি নিজের হাতে সাবান তৈরী করেছিলেন। নিবেদিতা তাঁকে ঐ কাজে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং বিদ্যালয়ের অনেক মেয়ের কাছে ঐসব সাবান বিক্রি করার ভার নিতেন।

স্বদেশী দ্রব্য তৈরী হবার সম্ভাবনা দেখলে তিনি আনন্দবোধ করতেম। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে লিখেছেন: 'একথা বলা প্রয়োজন যে, স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের জনসাধারণ সমগ্র জগতের কাছে সম্মান লাভ করার একটা সুবেশ পেয়েছে। যেখানে শক্তি, বুদ্ধি আর সম্মিলিত কর্মের প্রয়াস সেখানেই আশঙ্কার অবকাশ ও শ্রদ্ধার উদ্রেক। স্বদেশী আন্দোলনের মূল কথা বীর্য ও

স্বাবলম্বন। এর মধ্যে কারও কাছে সাহায্যের প্রত্যাশা অথবা সুবিধালাভের জন্যে কাঁদুনি নেই। নিজের জন্যে যতখানি করার ক্ষমতা ভারত তা করবে। আর বর্তমানে যা করা সম্ভব নয়, ভবিষ্যতে তা ভেবে দেখবে।

'ভারতীয়দের কর্তব্য হলো, ব্যবসায়ীমহলের যে ষড়যন্ত্রে আজ স্বদেশ আর স্বজাতি ক্রমশ সর্বস্বান্ত হতে বসেছে তার যতদূর সম্ভব প্রতিরোধ করা।'...

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে কাশীতে। এই সভার সভাপতি হলেন নরমপন্থী গোপালকৃষ্ণ গোখলে। নিবেদিতা এই সভায় যোগদান করার জন্য ২৫শে ডিসেম্বর কাশীতে এলেন। তিনি সভায় বক্তৃতা দেননি। তবে ওর কার্যধারা নীরবে প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি কাশীর তিলভাণ্ডেশ্বর নামক জায়গায় অবস্থান করতে লাগলেন। তাঁর বাসায় বহু রাজনৈতিক নেতাদের যাতায়াত সুরু হলো। বাংলা থেকে চরমপন্থী আর নরমপন্থী উভয় দলের নেতৃবৃন্দ যোগ দেন। বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন চরমপন্থী। তিনি চেয়েছিলেন কাশীর জাতীয় মহাসভা বাংলার বয়কট-আন্দোলন অর্থাৎ বিদেশী পণ্যদ্রব্য বর্জন আন্দোলন সমর্থন করবে। শেষকালে তাঁর আশা পূর্ণ হলো। নরমপন্থী এবং চরমপন্থী উভয়প্রকার সদস্যদের মধ্যে অনেক আলাপ-আলোচনা, বাক্-বিতণ্ডার পর অবশেষে বাংলার বয়কট-আন্দোলন স্বীকৃতি পেলে। তাই শুনে নিবেদিতার মনে আনন্দ আর ধরে না। তিনি চরমপন্থী এবং তিনি বাংলার বয়কট-আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন।

কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরে নিবেদিতা লিখলেন একটি প্রবন্ধ। তার শিরোনামা হলো—'ভারতের জাতীয় মহাসভা'। এই প্রবন্ধে লিখলেন: 'নব্য ভারত আজ য়ুরোপীয় দেশসমূহের রাজনৈতিক কার্যকলাপে মুগ্ধ। কেবল মুগ্ধ কেন, মোহাচ্ছন্ন বলা যেতে পারে। তার ধারণা, বিভিন্ন দলের

হট্টগোলের স্থানরূপে পরিণত হতে না পারলে পাশ্চাত্য স্বাদেশিকতার অন্তর্গত শক্তি ও উত্তমের পরিচয় দেওয়া হবে না। অন্ততঃ আমাদের মধ্যে পরস্পরকে অভিযুক্ত ও আক্রমণ করার যে দুর্নীতি দেখা দিয়েছে এইটিই তার একমাত্র কারণ। একই দেশের অধিবাসীদের আবাসে লড়াই-এর অর্থ সময় ও যুদ্ধের উপকরণ নষ্ট করা। বস্তুত আজকের ভারত এখনো উপলব্ধি করেনি যে তার যে আন্দোলন তা কোনো দলীয় রাজনৈতিক প্রচেষ্টা মাত্র নয়, পরন্তু এ এক জাতীয় আন্দোলন। ভারতে যারা প্রকৃত খাঁটি মানুষ তাদের মধ্যে জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ নেই। ...দেশের মধ্যে বহু কাজ বিপথে পরিচালিত হচ্ছে। রাজনীতি সম্বন্ধে চিন্তাধারাও অসংবদ্ধ। এর কারণ ভারতীয় রাজনীতি অনেকাংশে অনুকরণপ্রবণ এবং মন্দ জিনিস অনুকরণের দিকেই তার ঝোঁক বেশী।...

কংগ্রেস সম্বন্ধে আগের সব ধারণা পরিহার করে যতদূর সম্ভব প্রত্যক্ষ ঘটনা দ্বারা বিচার করতে দৃঢ়সঙ্কল্প এরূপ একজন প্রথম দর্শকের কাছে সকলের চেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো চরম-দক্ষিণপন্থী হতে চরম-বামপন্থী পর্যন্ত সকল সদস্যদের মধ্যে মতের ঐক্য। ...কংগ্রেসের কাজ রাজনৈতিক অথবা দলীয় আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করা নয়। কংগ্রেস হচ্ছে জাতীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক দিকমাত্র।...বর্তমানে কংগ্রেসের যথার্থ কাজ হচ্ছে শিক্ষাসংস্থারূপে সারা দেশের মধ্যে জাতীয়তাবোধ সঞ্চার করা। যাতে জাতীয়তাবোধের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় সেজন্যে কংগ্রেসের সদস্যদের নতুনভাবে, নতুন চিন্তায় অভ্যস্ত করতে হবে। দেশবাসীকে সংঘবদ্ধ ও কর্মতৎপর করে তুলতে হবে আর হিমালয় হতে কন্যা-কুমারিকা ও মণিপুর হতে পারস্যোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিরাট দেশের অধিবাসীদের পরস্পরের প্রতি আত্মীয়তার বোধ সমুজ্জ্বল করতে হবে।'...

এর পর নিবেদিতা কাশীর সেবাশ্রম-সংঘের কিছু কাজ করলেন। কাশী হতে তিনি সাঁচীর স্তূপ দেখতে যান। তারপর তিনি উজ্জয়িনী, চিতোর, আজমীর, অম্বর, আগ্রা প্রভৃতি স্থান দর্শন করে পুনরায় ফিরে এলেন কাশীতে। এবার অ্যানি বেশান্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। দুজনের মধ্যে অনেক কথা হলো। কাশীতে অবস্থানকালে তিনি তিনটি বক্তৃতা দিলেন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুআরি বিবেকানন্দের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে কাশী রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে বিশেষ পুজোর ব্যবস্থা করা হয়। নিবেদিতা ঐ পুজোয় যোগ দিলেন। বিকেলে স্থানীয় টাউনহলে এক সভার ব্যবস্থা হলো। ঐ সভায় নিবেদিতা 'হিন্দুধর্ম ও স্বামী বিবেকানন্দ' প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিলেন।

পরদিন অর্থাৎ ২২শে জানুআরি কলকাতায় ফিরলেন নিবেদিতা। কিন্তু কলকাতায় এসেও সুস্থির হতে পারলেন না। গোপালের মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শেষজীবনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই মহিলা-শিষ্যাটি নিবেদিতার বাগবাজারের বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিলেন। নিবেদিতা অসুস্থ গোপালের মাকে সেবা করতে লাগলেন কিন্তু তিনি আর অধিকদিন বাঁচলেন না। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে, ৮ই জুলাই সজ্ঞানে নিত্যধামে প্রস্থান করলেন।

এই বছরে নিবেদিতা আর একটি প্রচণ্ড শোক পেলেন। মায়াবতী আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী স্বরূপানন্দ ২৭শে জুন নৈনিতালে দেহরক্ষা করলেন। নিবেদিতা স্বামীজীকে বরাবর তাঁর পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র কাজে সহায়তা করে এসেছিলেন। সুতরাং তাঁর বিয়োগব্যথা নিবেদিতার অন্তরকে সেলের মত বিদ্ধ করলে।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। অনাহারে দলে দলে লোক মৃত্যুকে বরণ করতে লাগলো। অনেকের হলো ব্যাধি। এই অবস্থা দেখেশুনে নীরব থাকতে পারলেন না নিবেদিতা। তিনি কয়েকজন সন্ন্যাসীকে আগে

পাঠিয়ে দিলেন পূর্ববঙ্গে। পরে কয়েকজন সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে সেপ্টেম্বরে পূর্ববঙ্গ যাত্রা করলেন। সেখানে অত্যধিক পরিশ্রম করার পর ম্যালেরিয়াজ্বরে আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় ফিরলেন। ওদেশের গরীব কৃষকদের জীবনযাত্রা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে আশাতীত গর্ববোধ করলেন।

পূর্ববঙ্গ হতে কলকাতায় ফিরে এসে নিবেদিতা 'Famine and Flood' নামে একটি প্রবন্ধ লিখলেন।

নিবেদিতা যখন জ্বরে আক্রান্ত হলেন তখন তাঁকে দেখাশোনা করতে লাগলেন কৃস্টিন। বসু-দম্পতিও সাহায্য করতে লাগলেন। বেলুড়মঠ হতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ নিয়মিত খবর নিতেন।

আরোগ্যলাভ করলে নিবেদিতা চলে এলেন দমদমায়। সঙ্গে এলেন কৃস্টিন। দমদমায় ছিল আনন্দমোহন বসুর বাগানবাড়ী। তার নাম 'ফেয়ারী হল'। সেখানে কয়েক মাস রইলেন নিবেদিতা। এই সময় তাঁর বিদ্যালয়ের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রইলো।

দমদমায় থাকার সময় নিবেদিতা প্রবুদ্ধ ভারতের জন্যে প্রতি মাসে occational notes লিখতে লাগলেন। এছাড়াও তিনি লিখলেন The Master as I saw Him, Cradle Tales of Hinduism এবং জগদীশচন্দ্র বসুর Comparative Electro Physiology গ্রন্থগুলির কিছু কিছু অংশ।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় স্বদেশী মেলা বসে। ঐ মেলায় যোগদান করলেন নিবেদিতা। তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের হাতের কাজ নানারকম সূচী-শিল্প ঐ মেলার প্রদর্শনীতে স্থান পেল।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় জাতীয় মহাসভার অধিবেশন বসলো। ঐ অধিবেশন উপলক্ষে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হলো। ঐ প্রদর্শনীতে নিবেদিতা জাতীয় পতাকা দেখালেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কাপড়ের ওপর নকশা তুলে পতাকা তৈরী

করেছিল। গাঢ় লাল রঙের জমির ওপর সোনালী সুতোর বজ্র ও উভয়পাশে লেখা 'বন্দে মাতরম্'।

পরবর্তীকালে ঐ বজ্রপ্রতীকটি নিবেদিতা অনেক জায়গায় ব্যবহার করলেন। নিজের লেখা বইয়েতে ঐ চিহ্ন ব্যবহার করতেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু নিবেদিতার এই বজ্রপ্রতীকটি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। নিবেদিতার দেহত্যাগের পর তিনি যখন 'বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের' প্রতিষ্ঠা করলেন তখন ভবনশীর্ষে ঐ বজ্র-প্রতীকটি শ্রদ্ধার সঙ্গে উৎকীর্ণ করা হলো।

এভাবে স্বদেশীয় হাব-ভাব, আচার-বিচার, ধর্ম-সাহিত্য এবং মুক্তি-আন্দোলনে নিবেদিতার সমর্থন এবং প্রভাব উপলব্ধি করা যায়। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা তাঁর গ্রন্থ 'ভগিনী নিবেদিতা'য় লিখেছেন ঃ 'বস্তুতঃ জাতীয় আন্দোলনে তাঁহার কার্য অত্যন্ত ব্যাপক। তিনি সাধারণভাবে আন্দোলনে যোগদান মাত্র করেন নি। নেতৃত্বও উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এই আন্দোলনের সাফল্যের জন্যে তাঁর ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা ও সকলরকমের উদ্যমের মূল্য তদানীন্তন নেতৃবর্গই যথাযথ উপলব্ধি করিতেন। শিক্ষিতমহল ছাড়াও তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ ও বাগবাজার পল্লীর প্রতিবেশীগণ সকলেই জানিতেন তাঁহার উদ্দেশ্য ভারতের মুক্তি। ছাত্রীগণের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগরণের অভিলাষে তাহাদিগকে বক্তৃতা-সভায় লইয়া যাইতেন। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্তবপাঠের সহিত 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারতীয় নারীগণের উদ্দেশ্যে তিনি বক্তৃতা ও প্রবন্ধে কী আকুল আহ্বান জানাইয়াছিলেন!' (পৃঃ ৩২৭)

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে মিসেস্ সেভিয়ার এলেন কলকাতায়। তিনি নিবেদিতা ও কৃস্টিনের সঙ্গে দমদমায় অবস্থান করতে লাগলেন। পরে গরমকালে নিবেদিতা ও কৃস্টিন চলে এলেন মায়াবতীতে। মায়াবতী আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দের

সম্পাদনায় স্বামী বিবেকানন্দের পুস্তকগুলি প্রকাশ করার আয়োজন হচ্ছিল। নিবেদিতা তার ভূমিকা লিখে দিলেন—'Our Master and His message' নাম দিয়ে।

দু' দু'বার রোগ—একবার ব্রেন ফিভার এবং আর একবার ম্যালেরিয়া ভোগ করার পর নিবেদিতা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। পাশ্চাত্য দেশের বন্ধুরা তাঁর ঐ রকম অবস্থা দেখে তাঁকে বিদেশে আসার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। নিবেদিতা প্রথমে যেতে আপত্তি করলেন। তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন তিনি আর বেশীদিন পৃথিবীতে থাকবেন না। তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছে। এবার চলে যেতে হবে নিত্যধামে। তাই তিনি জীবনের শেষ দিনগুলি বিদ্যালয়ের উন্নতিতে ব্যয় করতে মনস্থ করলেন। আবার ভাবলেন, এই সময় পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে আনতে না পারলে তাঁর অবর্তমানে বিদ্যালয় চলবে কিভাবে! বেচারী ক্রিস্টিন একা ভীষণ কষ্ট ভোগ করবে।

এছাড়া আর এক কারণে নিবেদিতার মন ভারতের বাইরে যাবার জন্যে উন্মুখ হলো। ১৯০৭ সালে এদেশে কংগ্রেসকর্মীদের ওপর ব্রিটিশ শাসকদের অন্যায়ভাবে জোরজুলুম চলতে লাগলো। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ ও এপ্রিলে কুমিল্লা ও জামালপুরে লেগে গেল হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। ৯ই মে বিনাবিচারে নির্বাসনদণ্ড ভোগ করলেন লালা লাজপত রায় আর সর্দার অজিত সিংহ। ঐ বছরের জুলাই মাসে স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বন্দী হলেন। এসব খবর নিবেদিতাকে হতাশ করলে। তাঁর মন আগের তুলনায় আরও দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। তিনি তখন ভারত ছেড়ে বিদেশে যাবার জন্যে মন স্থির করলেন।

নিবেদিতার পুনরায় পাশ্চাত্য দেশে যাত্রা

পাশ্চাত্য দেশে যাবেন নিবেদিতা। তাই বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার দিয়ে গেলেন ক্রিস্টিনকে। ক্রিস্টিন একসঙ্গে বালিকা এবং বয়স্থা নারীদের বিদ্যালয় পরিচালনা করতে লাগলেন।

পাশ্চাত্য দেশে যাবার আগে নিবেদিতা একবার দক্ষিণেশ্বর এবং বেলুড় মঠে ঘুরে এলেন। তারপর ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অগস্ট কলকাতা হতে বোম্বাই অভিমুখে রওনা হন। পরে বোম্বাই হতে ১৫ই অগস্ট জাহাজযোগে বিদেশে পাড়ি দিলেন।

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নিবেদিতা এলেন ইংলণ্ডে। অনেক-দিন পরে আবার মা, ভাই ও ভগ্নীর সঙ্গে দেখা হলো। নিবেদিতা তাঁদের জন্যে ভারত থেকে কতরকম জিনিস নিয়ে গেছেন উপহার দেবার জন্যে। তাঁরা সেগুলি লাভ করে ধন্য হলেন এবং মনে মনে ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

ইংলণ্ড থেকে নিবেদিতা এলেন ডিসবাডেনে। এখানে তিনি বসু-দম্পতির সঙ্গে মিলিত হলেন। বসু-দম্পতিরা সেপ্টেম্বর মাসে এসেছেন। মিসেস্ লেগেট ও মিস্ ম্যাকলাউডের সঙ্গেও দেখা হলো। এই সময় নিবেদিতা 'The Master as I saw Him' বইটি লিখতে লাগলেন। বহুরকম কাজের ফাঁকে একটু সময় নিয়ে লেখাপড়ার কাজ সমানে চালিয়ে যেতে লাগলেন।

অক্টোবর মাসে নিবেদিতা পুনরায় এলেন ইংলণ্ডে। ক্ল্যাপহ্যামে মায়ের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন।

মিসেস্ বুল এলেন আমেরিকা হতে। এই সময় নিবেদিতার

লেখা 'Cradle Tales of Hinduism' প্রকাশিত হয়। এই বইখানি ওখানে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে।

পুরোনো ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ চলে গেল। এবার এলো নতুন বছর—১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ। নতুন বছরের প্রথম থেকেই নিবেদিতা পরিচিত মহলে ভাষণ দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। এবার তাঁর বক্তৃতার বিষয় হলো বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি।

এছাড়া লিক্রেম ক্লাবে ৪ঠা ফেব্রুআরি তারিখে বক্তৃতা দিলেন নিবেদিতা। বক্তৃতার বিষয়বস্তু হলো 'ভারতীয় সাহিত্যে ইতিহাসের প্রভাব'। ২৯শে মার্চ 'হাইয়ার থট সেণ্টার ও ফেবিয়ান সোসাইটি'তে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু হলো স্বামীজীর জীবন ও কর্ম। এই ছু'টি বক্তৃতাই জনসাধারণের কাছে বিশেষ প্রশংসা লাভ করলো।

এই সময় ভারত থেকে বহু গণ্যমান্য এবং নিবেদিতার পরিচিত ব্যক্তি গেলেন ইংলণ্ডে। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন গোখলে, রমেশ দত্ত, আনন্দকুমার স্বামী এবং কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মিঃ ই. বি. হ্যাভেল। এঁদের সঙ্গে নিবেদিতা রাজনীতি, আধ্যাত্মিক এবং শিল্পকলা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন।

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে নিবেদিতা এবং বসু-দম্পতির সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের জন্যে আসতেন অধ্যাপক গেড্ডিস, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ টি. কে. চেইন এবং বিখ্যাত সাংবাদিক মিঃ লেভিনসন। এছাড়া একাধিক নামী পত্রিকার সম্পাদক আসতেন নিবেদিতার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন 'রিভিউ অব রিভিউজ' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ উইলিয়াম স্টেড ও লণ্ডনের 'দি কামিং ডে'র সম্পাদক মিঃ জন পেজ হপ। এই সময় মিঃ র‍্যাটক্লিফ্ ও মিঃ ব্লেয়ারও ইংলণ্ডে ছিলেন। সুতরাং নিবেদিতার পক্ষে ওদেশের পত্রিকায় ভারতের কৃষ্টি ও

সভ্যতা সম্বন্ধে নানারকম প্রবন্ধ লিখতে অসুবিধা হলো না। তিনি পাশ্চাত্যবাসীদের মনের সঙ্গে ভারতীয় আদর্শ ও ভাবধারার পরিচয় করিয়ে দেবার অজুহাতে 'ভারতীয় আদর্শ', 'ভারতীয় সমস্যা', 'ভারতীয় নারী' প্রভৃতি নাম দিয়ে একাধিক প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। ঐসব সুন্দর এবং সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করার ফলে শিক্ষিত ইংলণ্ডবাসীদের মন ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়ে উঠলো। তারা আর ভাবতে পারলো না যে ভারত হচ্ছে অসভ্য আর বর্বরদের দেশ। ভারত যে অতি প্রাচীন সভ্যতার আলো পেয়ে এসেছে এবং ভারতের পরাধীনতা ঐ সভ্যতার উজ্জ্বল রঙকে ফ্যাকাশে করে দিচ্ছে এই ধারণা তাদের মনে এলো নিবেদিতার লেখা প্রবন্ধগুলি পাঠ করার ফলে।

পত্রিকার কয়েকজন সম্পাদক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণ এবং পার্লামেণ্টের কমন্সসভার কয়েকজন সদস্য একত্র হয়ে নিবেদিতাকে সাহায্য করতে লাগলেন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অনুকূলে প্রচারকার্য চালাতে। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'মডার্ন রিভিউ'তে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো। প্রবন্ধটির নাম 'Our Friends in Parliament and Outside'। লেখিকা হলেন স্বয়ং নিবেদিতা। তিনি লিখলেন: 'আমাদের স্বার্থের প্রতি যেসব বন্ধুদের সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রয়েছে তাঁরা বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। কমন্স-সভায় রয়েছেন ভারতের নিম্নোক্ত বন্ধুবর্গ—সার হেনরী কটন্‌, মিঃ ফ্রেডারিক ম্যাকারনেস, ডক্টর রদারফোর্ড, মিঃ ফিয়রে হার্ডি, মিঃ জে. হার্ট-ডেভিস, মিঃ জেমস্‌ ও-গ্রেডি, মিঃ ও-ডনেল, মিঃ সুইফ্‌ট ম্যাকনীল ও মিঃ উইলিয়াম রেডমণ্ড। এসব বন্ধু ছাড়া আরও অনেকে রয়েছেন যাঁরা সর্বদাই আমাদের কাজে নীরবে আগ্রহ দেখান এবং প্রয়োজন হলে ন্যায় ও সদ্‌বিচারের জন্যে তাঁদের ভোট ও ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সমুৎসুক। সবার ওপর ইংরেজ সাংবাদিক-দলে আমাদের অগণিত বন্ধু আছেন যাঁরা আমাদের দাবির পোষকতা

ও পক্ষ সমর্থনের জন্যে বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। এঁদের মধ্যে মিঃ নেভিন্‌সন, কলকাতা স্টেটস্‌ম্যান-সম্পাদক মিঃ র‍্যাটক্লিফ্‌ এবং ভারতের সর্বাপেক্ষা পুরনো বন্ধুদের অন্যতম মিঃ হাইণ্ডম্যান বিশেষ অগ্রণী।'

এই সময় রাশিয়ার বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা প্রিন্স পিটার ক্রপট্‌কিন ইংলণ্ডে হাইগেটে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার কথাবার্তা হলো রাশিয়ার কম্যুনিস্ট বিপ্লবকে কেন্দ্র করে। এই আলোচনার ভিত্তির ওপর নিবেদিতা লিখলেন একটি প্রবন্ধ। তার নাম 'A Chat with a Russian about Russia'।

বিপ্লবী রাশিয়ার নেতার সঙ্গে আলাপ করে নিবেদিতা এই সত্য উপলব্ধি করলেন যে, দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে যদি বিপ্লবীভাব দানা বেঁধে না ওঠে তাহলে দেশ কখনোই মুক্তির আলো প্রত্যক্ষ করতে পারবে না। কী গুপ্ত আন্দোলন কিংবা প্রকাশ্য বিপ্লব এর কোনটিই সাফল্যলাভ করতে পারবে না যদি সে-সবগুলির পেছনে দেশের সর্বসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা এবং সহানুভূতি না থাকে। সেই-সময় ভারতে বিপ্লবী দেশকর্মীদের কার্যকলাপের খবর যেতো ইংলণ্ডে নিবেদিতার কাছে। নিবেদিতা সেগুলি পাঠ করে সন্তুষ্ট হতে পারতেন না। তিনি ভাবতেন, সাময়িক ভাবাবেগে উত্তেজিত হয়ে দু' একজন নিরীহ জনসাধারণের জীবন বোমার আঘাতে নষ্ট করলেই দেশে বিপ্লব আসবে না বা স্বাধীনতা-আন্দোলন দানা বেঁধে উঠবে না। মুক্তি-আন্দোলনের গোড়ার কথা হচ্ছে জাতীয় ঐক্য—জাতীয়তা। এই জাতীয়তাবোধ একবার জাগ্রত হলেই তার পরের দিন আসবে স্বাধীনতা। নিবেদিতা ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপ এবং আমেরিকায় ভারতের স্বার্থের অনুকূলে যেসব বক্তৃতা দিলেন তাতে প্রকাশ পেল ভারতের প্রতি তাঁর প্রেম এবং ভারতের জনগণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে প্রাণপণ প্রচেষ্টা। তিনি ছিলেন বিপ্লববাদী। তবে সে

বিপ্লব আসা চাই জাতির সাংস্কৃতিক ভূমিতে। তার ফলেই প্রকাশ হবে জাতীয়তাবোধ। আর এই জাতীয়তাবোধই আনবে স্বাধীনতার সমুজ্জ্বল প্রভাত। নচেৎ ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে গণহত্যা বা দু'একটি পুলিস-জনসাধারণ সংঘর্ষঘটিত যে খণ্ড বিপ্লব তার দ্বারা দেশের স্বাধীনতা আসবে না। নিবেদিতা ছিলেন এসব ব্যাপারের বাইরে। তাই এই ধরনের বিপ্লব আদৌ পছন্দ করতেন না। তিনি ওদেশে যেটুকু প্রচার করেছিলেন ভারত প্রসঙ্গে, তা মূলতঃ এদেশের কৃষ্টি, সভ্যতা এবং জাতীয়তাবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। লেখিকা প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভগিনী নিবেদিতা'য় লিখেছেন : 'এ দেশে নিবেদিতা হিংসামূলক বিপ্লব-কার্যে যোগদান করেন নাই, এমন কি, সক্রিয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের সহিত তাঁহার যোগাযোগও তেমনি নিবিড় নহে। সাহিত্য ও বক্তৃতার ভিতর দিয়া জনসাধারণের প্রচেষ্টায় উহা পর্যবসিত। পাশ্চাত্যে তিনি ঐভাবেই স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিতেন। ভারতের বাহিরে ভারতীয় স্বাধীনতার অনুকূলে জনমত-সংগঠনের আবশ্যকতা তিনি পরে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিপিন পাল ছয় মাস কারাদণ্ডের পর ১৯০৮-এর মার্চ মাসে মুক্তিলাভ করিয়া কিছুদিন পরেই ইংলণ্ড গমন করেন। ঐ দেশে ভারতবর্ষের প্রচার সমর্থন করিয়া তিনি লিখিলেন, 'ইংলণ্ডে কাজের প্রয়োজন আছে। লাজপতের মুক্তির কারণ ব্রিটিশ জনমতের চাপ। ভারতসরকার ইহার বিরুদ্ধে ছিলেন।'

'শ্রীঅরবিন্দ এই মতের প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছিলেন, 'বর্তমানে ইংলণ্ডে কাজ নৈরাশ্যজনক, অর্থ ও শক্তির অপচয়।'

'দেখা যাইতেছে, নিবেদিতা ও বিপিন পালের কর্মপন্থার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ইহা ব্যতীত ১৯০৭ হইতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত য়ুরোপ, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় সর্বত্রই নিবেদিতা শ্রীযুক্ত বসু ও তাঁহার সহধর্মিনীর সহিত অবস্থান করিয়াছেন। বিপ্লবের

সহিত তাঁহার কোনপ্রকার যোগাযোগ শ্রীযুক্ত বসুর পক্ষে অতিশয় বিপজ্জনক হইত। সরকার তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন; শ্রীযুক্ত বসুর উপর উহার প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় তিনিও উদ্বিগ্ন থাকিতেন। ১৯০৯, ৩রা এপ্রিলের পত্রে তিনি ম্যাকলাউডকে লিখলেন, রাজনীতির সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ সংযোগের জনরব তিনি দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করেন। ইহা হইতে মনে হয়, স্বাধীনতা-আন্দোলনে সরকারের দমননীতি ও দেশের প্রস্তুতির অভাব উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন যে, অবিলম্বে স্বাধীনতালাভের জন্য বিপ্লব কার্যকর হইবে না।' ···(পৃঃ ৩৭৫-৩৭৬)

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণে দু'জন নির্দোষ ইংরাজ মহিলা মারা গেলেন। বাংলার সন্ত্রাসবাদীরা এই কাজ করলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন বাংলার ছোটলাটকে হত্যা করতে। কিন্তু তাঁদের সে আশা ফলবতী হলো না। ফলে অনেক তরুণ বিপ্লবী পুলিসের হাতে বন্দী হলো। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন সন্দেহ করে ইংরাজ পুলিস শ্রীঅরবিন্দকে বন্দী করলো। এই খবর গিয়ে পৌঁছলো সুদূর ইংলণ্ডে নিবেদিতার কাছে। তিনি হলেন বিচলিত। তখুনি ভারতে ফেরবার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। কিন্তু কাজে তা সফল হলো না। ইতিমধ্যে বসু-দম্পতি ইংলণ্ডের কাজ শেষ করে ফেলেছেন। আমেরিকা থেকে তাঁরা আমন্ত্রণলিপি পেলেন। নিবেদিতা ভাবলেন, তিনিও বসু-দম্পতির সঙ্গে যাবেন আমেরিকায়। সেখানে তাঁর বিদ্যালয়ের জন্যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করবেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আয়র্ল্যাণ্ডে এলেন নিবেদিতা। প্রায় একমাস ধরে তিনি উত্তর আয়র্ল্যাণ্ড ভ্রমণ করে বেড়ালেন।

ঐ বছরের অক্টোবর মাসে বস্টনে মিসেস্ বুলের বাড়ীতে গেলেন

নিবেদিতা। পরদিন গেলেন গ্রীনএকারে বেড়াতে। এখানে অনেক পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা হলো তাঁর।

ওখান থেকে নিবেদিতা গেলেন রিজলি ম্যানরে। সেখানে মিসেস্ লেগেটের কাছে কিছুদিন থেকে এলেন। ওখানে মিস্ ম্যাকলাউডের সঙ্গেও দেখা হলো।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর এবং ডিসেম্বরে নিবেদিতা উইনস্লো, কন্কর্ড, হার্টকোর্ড, অ্যালবেনী, পিটস্বার্গ, ফিলাডেলফিয়া, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, বল্টিমোর প্রভৃতি জায়গায় ভ্রমণ করলেন এবং বক্তৃতা দিয়ে কিছু অর্থ উপার্জন করলেন। তাঁর বক্তৃতাবলীর বিষয়বস্তু ছিল 'ভবিষ্যৎ জগতে ভারতীয় চিন্তার স্থান', 'প্রাচ্য নারীর শিক্ষা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নারীর আদর্শ' এবং 'বেদান্ত'।

নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত গায়িকা মিস্ এমা থার্ণবির সঙ্গেও পরিচয় হলো নিবেদিতার। তাঁর বাড়ীতে কয়েকদিন রইলেন।

পরে এক সংবর্ধনাসভায় সাংবাদিক এফ. জে. আলেকজাণ্ডার আলাপ করলেন নিবেদিতার সঙ্গে। তাঁর কাছ থেকে ভারত প্রসঙ্গে অনেককিছু খবরাখবর সংগ্রহ করলেন। পরবর্তীকালে আলেকজাণ্ডার যখন ভারতে আসতেন তখন তিনি নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতেন এবং ভারত সম্বন্ধে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান জেনে তাঁর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখাতেন।

বস্টনে নিবেদিতা বেদান্তধর্ম প্রসঙ্গে একাধিক বক্তৃতা দিলেন। তারক দাস, ভূপেন্দ্র দত্ত প্রমুখ যে ক'জন বিপ্লবী ভারত থেকে পালিয়ে গিয়ে আমেরিকায় অবস্থান করছিলেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চললেন নিবেদিতা। তাঁদের কাজে উৎসাহ দিতে লাগলেন।

ভারতের মুক্তির জন্যে যাঁরা সংগ্রাম করছিলেন তাঁদের কাজে উৎসাহ এবং সাহায্য করার জন্যে আমেরিকায় গঠিত হলো আমেরিকান লীগ। তার সভাপতি ছিলেন জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ড।

তিনি নিবেদিতার সঙ্গে ভারতে স্বাধীনতার জন্মে গণ আন্দোলনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করলেন।

মেরী হেলকে এবং তাঁর পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিগণকে স্বামীজী যেসব চিঠি লিখেছিলেন সেগুলি সংগ্রহ করে তার নকল কপি পাঠিয়ে দিলেন মায়াবতী আশ্রমের স্বামী বিরজানন্দের কাছে। বিরজানন্দের ইচ্ছা ছিল স্বামীজীর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করার। নিবেদিতা কর্তৃক সংগৃহীত স্বামীজীর এই পত্রাবলী একাজে বিশেষ সাহায্য করবে।

বিদেশে অসংখ্য কাজের মধ্যে থাকলেও নিবেদিতার মন বাগবাজারের বিদ্যালয়ের কথা স্মরণ করে উদ্বেলিত হতো। ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্মে ব্যগ্র হতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল জগদীশচন্দ্র বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়া শেষ করলে তাঁর সঙ্গে তিনি ফিরবেন ভারতে। কিন্তু হঠাৎ এক বিপদ তাঁর সে আশা নষ্ট করে দিলে। লণ্ডন থেকে খবর এলো, তাঁর মাতা মেরী নোবল অত্যন্ত অসুস্থ।

খবর পেয়ে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে নিবেদিতা মায়ের কাছে এলেন। মায়ের অবস্থা দেখে বুঝতে পারলেন, তিনি আর বেশীদিন পৃথিবীতে থাকবেন না। নিবেদিতা মায়ের পাশে থেকে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন। ভাই রিচমণ্ড এবং বোন মে-ও এলো মায়ের কাছে। ২৩শে জানুআরি ভাই ও বোনেরা একসঙ্গে 'হোলি কমিউনিয়ন' অনুষ্ঠান করলেন। গ্রামের যাজক ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

২৬শে জানুআরি মায়ের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে এলো। ঐ দিনই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

মায়ের যথারীতি শেষকৃত্য সম্পাদন করে নিবেদিতা ভাই ও বোনের সঙ্গে বেশ কিছুদিন কাটালেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ভাই ও বোনের সঙ্গে ডেভনের গ্রেট টরেন্টন

পল্লীতে এলেন নিবেদিতা। সেখানে স্যামুয়েলের সমাধির পাশে মেরীর ভস্মাবশেষ সমাহিত করা হলো।

ওদিকে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়ে মার্চ মাসে সস্ত্রীক ইংলণ্ডে ফিরলেন বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু। নিবেদিতা আবার মিলিত হলেন বসু-দম্পতির সঙ্গে। মে মাসের শেষে তাঁরা বেরুলেন ইউরোপ ভ্রমণে। সঙ্গে গেলেন মিসেস্ বুল। পরে ম্যাকলাউডও যোগ দিলেন এই সফরে। তাঁরা ফ্রান্সে এসে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখে পরে গেলেন ডিসবাডেনে। ওখান থেকে জেনিভা।

এর পর এলো ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুলাই। নিবেদিতা মিসেস্ বুল ও ম্যাকলাউডের কাছে বিদায় নিলেন। বসু-দম্পতিও বিদায় প্রার্থনা করলেন। মিসেস্ বুল ও ম্যাকলাউড হাসিমুখে তাঁদের বিদায় দিলেন। ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিবেদিতা বসু-দম্পতির সঙ্গে মার্সেলিস থেকে উঠলেন ভারতগামী জাহাজে। শেষবারের মত ইংলণ্ডকে দেখে নিলেন একবার। মনে মনে বললেন কি বিচিত্র তুমি! তোমার কোলে আমাকে টেনে নিয়ে জীবনের শুরুতে এবং সমাপ্তিতে কত রঙ-বেরঙের খেলাই না দেখালে। বিদায় ইংল্যাণ্ড—বিদায়। আর হয়তো তোমার কোলে আমার এই নশ্বর দেহ নিয়ে আসা সম্ভব হবে না।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই নিবেদিতা এসে পৌঁছুলেন বোম্বাই বন্দরে। ওখান থেকে ট্রেনে করে ১৮ই জুলাই এলেন কলকাতায়। দীর্ঘ দু'বছর পরে বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে এসে মুগ্ধ হলেন নিবেদিতা। আবার লেগে গেলেন নিজের কাজে।

১৯শে ও ২২শে জুলাই তিনি এলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়ীতে। ২০শে ও ২৪শে জুলাই গেলেন উদ্বোধন-বাড়ীতে শ্রীমাকে দেখতে। শ্রীমা এবং রাধুর জন্যে ওদেশ থেকে অনেক-রকম উপহার-সামগ্রী এনেছিলেন নিবেদিতা। সেগুলি তিনি

উপহার দিলেন শ্রীমার হাতে। শ্রীমা আনন্দে গ্রহণ করলেন সেইসব উপহার-দ্রব্য। তিনি নিবেদিতাকে কন্যার চেয়ে বেশী স্নেহ করতেন। একবার নিবেদিতা তাঁকে একটি জার্মান-সিলভারের কৌটা উপহার দিলেন। শ্রীমা তার মধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কেশ রাখতেন। ঐ কৌটাটি সম্বন্ধে পরবর্তীকালে শ্রীমা প্রায়ই বলতেন, পূজোর সময় কৌটাটি দেখলে নিবেদিতাকে মনে পড়ে।

শ্রীমার প্রতি নিবেদিতার শ্রদ্ধা ছিল অসীম। একবার নিবেদিতা শ্রীমা প্রসঙ্গে মন্তব্য করলেন: '...আমার সব সময় মনে হয়েছে তিনি যেন ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী। কিন্তু তিনি কি একটি পুরনো আদর্শের শেষ প্রতিনিধি, না, নতুন কোন আদর্শের অগ্রদূত? তাঁর মধ্যে দেখা যায় সাধারণতম নারীরও অনায়াসলভ্য জ্ঞান ও মাধুর্য। তবু আমার কাছে তাঁর শিষ্টতার আভিজাত্য ও মহৎ উদারহৃদয় তাঁর দেবত্বের মতই বিস্ময়কর মনে হয়েছে। যত নতুন বা জটিলই কোন প্রশ্ন হোক না কেন, আমি তাঁকে ওর উদার ও সহৃদয় মীমাংসা করে দিতে ইতস্তত: করতে দেখিনি। তাঁর সারা জীবনটা একটানা নীরব প্রার্থনার মত।'

শ্রীমাও নিবেদিতাকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। মাঝে মাঝে দু'জনের মধ্যে পত্রবিনিময় চলতো। শ্রীমায়ের একটি পত্র নীচে উদ্ধৃত করছি:

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

জয়রামবাটী
২১শে চৈত্র

'শুভাশীর্বাদরাশয়: সন্তু,

স্নেহের খুকী নিবেদিতা, তুমি আমার ভালবাসা জেনো। তুমি আমার শান্তির জন্যে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করেছ জেনে আনন্দিত হলুম। তুমি সেই সদানন্দময়ী মার প্রতিমূর্তি। আমার সঙ্গে একত্র তোলা তোমার ফটোটির দিকে আমি অনেক

সময় চেয়ে দেখি। তখন মনে হয়, তুমি যেন কাছেই রয়েছ।··· ভগবানের কাছে সর্বদা প্রার্থনা, তিনি তোমার মহৎ উদ্যমে সহায় হোন আর তোমাকে দৃঢ় ও সুখী করুন। তুমি সত্বর (ভালয় ভালয়) ফিরে এসো, এই প্রার্থনা করি। ভারতবর্ষে মেয়েদের আশ্রম সম্বন্ধে তোমার অভিলাষ তিনি পূর্ণ করুন আর যথার্থ ধর্মশিক্ষা দ্বারা ঐ আশ্রমের উদ্দেশ্য যেন সিদ্ধ হয়।···আমার আশীর্বাদ জেনো। আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতিলাভ করো এই প্রার্থনা। বাস্তবিক তুমি অতি চমৎকার কাজ করছো। কিন্তু বাংলা ভাষা যেন ভুলে যেও না, নচেৎ যখন তুমি ফিরে আসবে তোমার কথা আমি বুঝতে পারবো না। ধ্রুব, সাবিত্রী, সীতা-রাম প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছো জেনে বড়ই আনন্দিত হলুম। তাঁদের পবিত্র জীবনকাহিনী সাংসারিক সকল বৃথা বাক্যালাপের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। প্রভুর নাম আর লীলা উভয়ই কত সুন্দর!

তোমার মাতাঠাকুরানী।'

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই প্রবাসী এবং মডার্ন রিভিউ-এর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সাক্ষাৎ করতে এলেন নিবেদিতার সঙ্গে। এই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে নিবেদিতা তাঁর 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার কাজে অনেকরকম সাহায্য করেছিলেন এবং পত্রিকা প্রকাশ করার পূর্বে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। রামানন্দ-কন্যা শ্রীমতী শান্তা দেবী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রামানন্দ ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা'-তে নিবেদিতা প্রসঙ্গে লিখেছেন: '···ভগিনী নিবেদিতার সহিত তাঁহার (রামানন্দবাবুর) পরিচয় ঠিক কবে হইয়াছিল জানা নাই। কিন্তু নিবেদিতা এই প্রয়াগতীর্থের আলোক-শিখাটির রূপ চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাই যখন 'মডার্ন রিভিউ' প্রকাশিত হয় নাই তখনই তিনি পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন

সেনকে বলিয়াছিলেন, "এই যে ব্যক্তিটি এখন শুধু বাংলা ভাষায় বাংলার সুখ-দুঃখের কথা লইয়াই ব্যস্ত আছেন, এমন একদিন আসিবে যখন তিনি সারা ভারতের বেদনা প্রকাশের ভার লইবেন। বিধাতা তাঁহাকে সেই যোগ্যতা দিয়াছেন এবং বিধাতার এতখানি দান কখনও ব্যর্থ হইবে না। ইঁহার মনীষা ও ইঁহার চরিত্র একদিন প্রশস্ততর সাধনাক্ষেত্র খুঁজিবেই খুঁজিবে।"

'তাঁহার ইংরেজী কাগজ প্রকাশিত না হইলেও বাস্তবিক তখন তিনি শুধু বাংলা ভাষায় বাংলার সুখ-দুঃখ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন না। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের এবং কংগ্রেসের বেদনার বাণীর ভিতর দিয়া ইঁহার মনীষা ও ইঁহার চরিত্র তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত বারে বারে জ্বলিয়া উঠিতেছিল এবং ভগিনী নিবেদিতা ইঁহার এত বড় বন্ধু ছিলেন এবং এতটা ভারতহিতৈষিণী ছিলেন যে সে সকলের সন্ধান কিছু নিশ্চয়ই পাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই সকল নানাক্ষেত্রের কার্যের পরিচয় পাইয়াই নিবেদিতা ঐরূপ ভবিষ্যৎবাণী করেন। তাই 'মডার্ন রিভিউ' প্রকাশিত হইবার পরও পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় যখন প্রশ্ন করেন, 'আপনি কি করিয়া এত আগে হইতে এমন একটি ভবিষ্যৎবাণী করেন?' তখন নিবেদিতা বলিয়াছিলেন, 'গৃহলক্ষ্মী যখন ঘরের প্রদীপটি জ্বালেন তখন ঘরের সেবার মতই তাহাতে আলোক শক্তি দেন। এই-যে একটি প্রদীপ জ্বলিল দেখিলাম অপরিসীম তাহার শক্তি। বুঝিলাম ঘরের প্রয়োজন নির্বাহ করিয়াই ইহার সার্থকতা শেষ হইবে না। তখনই বুঝিলাম এই প্রদীপখানি একদিন ঘরের বাহিরে আকাশ-প্রদীপ হইবে। আলোকস্তম্ভের মহাদীপের মত সেই শক্তি, তাহার কাজ কি ঘরের কোণের সামান্য সেবাতেই নিঃশোষিত হয়।"

'ন্যায় ও সত্যের আলোকবর্তিকা হাতে লইয়া এই অধঃপাতিত জাতির সেবার জন্য আরাম, বিলাস, আনন্দ সমস্ত ত্যাগ করিয়া

নূতন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার প্রেরণা তাঁহার আসিল। অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের মত তিনি সেই আলো শত্রুমিত্রকে পথ দেখাইবার জন্য চিরজীবন জ্বালিয়া গিয়াছেন। এই আলো সমগ্র ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাহিরে সমস্ত পৃথিবীতে ভারত সম্বন্ধে প্রাচীন ও নবীন সত্য ও তথ্য প্রচার করিয়াছে। ১৯০৭-এ তিনি লিখিয়াছেন,—'It is not impossible for a nation to be Just…' we on our part cannot without hypocrisy say that we have full faith in the sense of Justice of the British people ; but at the same time we do not say that they may not in future be juster than they have been in the past. Our hope of India's salvation rests chiefly and primarily on what Mr Naoriji has called the supremacy of the moral law. "And the appeal to a nation's sense of Justice and Love of righteousness is ultimately based on the moral order of the Universe." (পৃঃ ১২১)

পরদিন ২১শে জুলাই স্বামী সারদানন্দ এলেন নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

সু-সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক আচার্য দীনেশ সেন নিবেদিতার কাছে আসতে লাগলেন ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই হতে। তিনি তাঁর বিখ্যাত বাংলা গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। ঐ গ্রন্থটি নিবেদিতাকে দেখিয়ে তা সংশোধন করার জন্যে আচার্য দীনেশ সেন নিবেদিতার কাছে বেশ কয়েকদিন যাবৎ ঘন ঘন আসা-যাওয়া করতে লাগলেন। এর জন্যে নিবেদিতা বিন্দুমাত্র বিচলিত হতেন না। তিনি সকলকে তাঁর সাধ্যমত সাহায্য করতেন। কাউকে দরজা হতে ফিরিয়ে দিতেন না।

২৭

বহুমুখী কর্মধারায় নিবেদিতা

নিবেদিতা যখন পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণ করছিলেন তখন কৃস্টিনের ওপর বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার ভার পড়েছিল। কৃস্টিন সেই পরিচালন-ভার অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছিলেন। তাঁর কাজে সাহায্য করার জন্যে বিপ্লবী দেবব্রত বসুর ভগিনী সুধীরা, পুষ্পদেবী এবং বিপিন পালের কন্যা অমিয়া দেবী এগিয়ে এসেছিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুন কৃস্টিনকে বিশ্রাম নেবার জন্যে দার্জিলিং-এ যেতে হলো। তিনি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে দার্জিলিং যাত্রা করলেন। তাঁর জায়গায় বিদ্যালয়ের সমস্ত ভার পড়লো নিবেদিতার ওপর। তিনি যোগ্যতার সঙ্গে বিদ্যালয়ের পরিচালনা-ভার বইতে লাগলেন। কিন্তু অকস্মাৎ দেখা দিলো অর্থের অনটন। বিচলিত হলেন নিবেদিতা। মিসেস্ বুলের কন্যাসহ পাশ্চাত্য দেশের কতিপয় স্কুলের কাছে চিঠি লিখলেন সাহায্যের জন্যে আবেদন জানিয়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদের কাছ থেকে কোনরকম সাড়া পেলেন না। তখন নিবেদিতা বাধ্য হয়ে ছোট ছোট মেয়েদের জন্যে দু'টি ছোট পাঠশালা বন্ধ করে দিলেন।

তিনি দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময় বিদ্যালয়ের কাজে নিযুক্ত থাকলেও লেখাপড়ার কাজ একেবারে বন্ধ রাখলেন না। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Master as I saw Him' প্রকাশের জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি একখানি বই লিখতে আরম্ভ করলেন। তার নাম হলো 'Foot-falls of Indian History'। এছাড়া তিনি 'স্টেটস্‌ম্যান' এবং 'মডার্ন রিভিউ'

পত্রিকার জন্যে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। দীনেশ সেনের ইংরেজীতে অনুবাদিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের সংশোধন করতে লাগলেন। এর ফাঁকে আবার 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র জন্যে লেখা তৈরী করতে হতো। এই সময় আনন্দমোহন বসুর জীবনী প্রকাশের ব্যবস্থা হতে লাগলো। ঐ গ্রন্থের শেষ দিকে নিবেদিতার লেখা একটি প্রবন্ধ যুক্ত করা হলো। প্রবন্ধটির নাম —Ananda Mohan Bose as a Nation-maker।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে নিবেদিতা হঠাৎ খবর পেলেন, স্বামী সদানন্দ পীরগঞ্জে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সেই খবর শুনে তিনি তখুনি ছুটে গেলেন পীরগঞ্জে।

২৫শে সেপ্টেম্বর 'The Master as I saw Him' বইটি ছাপা হতে শুরু হলো। বইটি প্রকাশিত হলো ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুআরি। প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বইটি বিশেষভাবে জনসমাদর লাভ করলে।

অগস্টের শেষে মিঃ লেগেট মারা গেলেন। তাঁর বিয়োগব্যথা নিবেদিতাকে অত্যন্ত বিচলিত করলো। মিঃ লেগেট নিবেদিতাকে বহুপ্রকারে সাহায্য করতেন। সুতরাং তাঁর বিয়োগ নিবেদিতার কাছে বিনামেঘে বজ্রপাতের মত মনে হলো।

মিঃ লেগেটের জন্যে নিবেদিতার মন খারাপ হয়ে গেল। উপরন্তু, বহু পরিশ্রমজনিত তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে পড়াতে তিনি স্থির করলেন দার্জিলিং-এ গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নেবার।

অক্টোবর মাসে পূজোর ছুটিতে নিবেদিতা গেলেন দার্জিলিং-এ। ১৫ই নভেম্বর ফিরলেন কলকাতায়। ঐ সময় ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের শ্রমিকদলের নেতা র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ হলো নিবেদিতার। এরপর থেকে ম্যাকডোনাল্ড একাধিকবার নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করেন।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এলেন মিসেস্ হেরিংহ্যাম।

তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় হয়েছিল ইংলণ্ডে। মিসেস্ হেরিংহ্যাম অজন্তা গুহার চিত্রাবলীর প্রতিলিপি সংগ্রহ করতে এসেছিলেন। তাঁর ঐ কাজে সাহায্য করলেন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছাত্রদ্বয় শিল্পী নন্দলাল বসু এবং অসিত হালদার। অসিত হালদার নিবেদিতা প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'আমাদের তখন দেশী শিল্পের গবেষণা-কাল।...ভগিনী নিবেদিতা সর্বদা আমাদের এই জাতীয় জাগৃতি প্রীতির চোখে দেখতেন। আমি আর নন্দলাল প্রায়ই তাঁর কাছে বাগবাজারে যেতুম।...আমাদের উপদেশচ্ছলে বারবার সাবধান করতেন, আমরা যেন আর্ট ছেড়ে পলিটিক্সে যোগ না দিই। আমাদের হাতে দেশের অবলুপ্ত আর্টের নবজাগরণ নির্ভর করছে—সেটাও দেশের জাগৃতি ও স্বাধীনতার পক্ষে খুব বড় কাজ। সেই কথাই ভগিনী নিবেদিতা আমাদের বোঝাতেন।...আমাদের বারবার উপদেশ দিতেন, জাতীয় শিল্পকলার ঐশ্বর্যকে জাগিয়ে ও বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আপ্রাণ কাজ করতে। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন, আমাদের ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনীতে আসতেন এবং শিল্পীদের উৎসাহিত করতেন।'

বড়দিনের ছুটিতে নিবেদিতা নিজেও গেলেন নন্দলাল বসুর সঙ্গে অজন্তায়। ওখানকার গুহাগুলির গায়ে যে চিত্রাবলী আঁকা আছে তাদের একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করলেন। পরে কলকাতায় ফিরে ঐ চিত্রাবলীর বিবরণ দিয়ে একটি বই লিখলেন। বইটির নাম 'The Ancient Abbey of Ajanta'।

বিপ্লবী অরবিন্দ ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কারাগার হতে মুক্তি লাভ করলেন। তারপর তিনি ঐ বছরের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিলেন। এবার তাঁর বক্তৃতায় প্রকাশ্য আন্দোলনের কোন ইঙ্গিত প্রকাশ পেল না। তিনি যা কিছু বললেন সেসব ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার জন্যে। এক কথায় তিনি শেষকালে অহিংস উপায়ে দেশের মুক্তি-সংগ্রাম

চালাবার পক্ষপাতী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় 'ধর্ম' ও ইংরাজীতে 'কর্মযোগীন' নামে দু'টি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রচলন করলেন। এই কাজে নিবেদিতা তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করলেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরির প্রথম সপ্তাহে অর্থাৎ ১৯শে পৌষ, ১৩১৬ সালের 'ধর্ম' পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভবিষ্যৎ ভারত' প্রসঙ্গে: 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি ও তাঁর সম্বন্ধে যেসব বই প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি পাঠ করে জানা যায় যে, দেশে যে নতুন ভাব গঠিত হয়েছে, যে ভাবরাশি সারা ভারতকে প্লাবিত করে ফেলেছে, যে ভাব-তরঙ্গে মত্ত হয়ে কত যুবক সমস্ত তুচ্ছ করে আত্মাহুতি দিচ্ছে সে ভাবের কথা তিনি কিছুই বলেন নি। সর্বভূতের অন্তর্যামী ভগবান তা দেখেন নি একথা কিভাবে বিশ্বাস করতে পারি? যার পাদস্পর্শে পৃথিবীতে সত্যযুগ এসেছে, যার স্পর্শে ধরণী সুখমগ্না, যার আবির্ভাবে বহুযুগ সঞ্চিত তমোভাব বিদূরিত, যে শক্তির সামান্য মাত্র উন্মেষে দিগ্‌দিগন্ত-ব্যাপিনী প্রতিষ্ঠান জাগরিতা হচ্ছে, যিনি পূর্ণ, যিনি যুগধর্মপ্রবর্তক, যিনি অতীত অবতারদের সমষ্টিস্বরূপ; তিনি ভবিষ্যৎ ভারত দেখেন নি বা সেই সম্বন্ধে কিছু বলেন নি একথা আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের বিশ্বাস যা তিনি মুখে বলেন নি তা তিনি কাজে করে গেছেন। তিনি ভবিষ্যৎ ভারতকে ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে নিজের সামনে বসিয়ে গঠন করে গেছেন। এই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিধ্বনি হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ। অনেকে মনে করেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁর নিজের দান। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে তাঁর স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁর পরম পূজ্যপাদ গুরুদেবেরই দান। তিনিও নিজের বলে কিছু দাবি করেন নি। লোকগুরু তাঁকে যেভাবে গঠিত করেছিলেন তাই ভবিষ্যৎ ভারতকে গঠিত করবার উৎকৃষ্ট পন্থা। তাঁর সম্বন্ধে

কোন নিয়ম বিচার ছিল না, তাঁকে তিনি সম্পূর্ণ বীর সাধকভাবে গঠন করেছিলেন। তিনি জন্ম হতেই বীর এ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলতেন তুই যে বীর রে। তিনি জানতেন যে তাঁর ভেতর যে শক্তি সঞ্চার করে যাচ্ছেন, কালে সেই শক্তির উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ প্রখর সূর্যকরজালে আবৃত হবে। আমাদের যুবকগণকেও এই বীরভাবে সাধন করতে হবে। তাদেরকে বেপরোয়া হয়ে দেশের কাজ করতে হবে আর অহরহ এই ভগবৎবাণী স্মরণপথে রাখতে হবে—'তুই যে বীর রে!'

ঐ 'ধর্ম' পত্রিকায় ২রা ফাল্গুন, ১৩১৬ সালের সংখ্যায় লিখলেন শ্রীঅরবিন্দ : 'স্বামীজীর জন্মোৎসব' :

'গত রবিবার আমরা স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবে যোগদান করতে বেলুড়মঠে গিয়েছিলুম। তখন কুয়াশায় সমস্ত আকাশ ঢেকে ফেলেছে। গঙ্গার একূল-ওকূল দু'কূলই দেখা যাচ্ছিল না। গঙ্গাকে দেখাচ্ছিল সমুদ্রের মত। জলের কুলকুল শব্দ সুগন্ধ বায়ুর সঙ্গে মিলে সঙ্গীতের মত শোনা যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর এক একটি বজ্রগম্ভীর বাণী মনে উঠতে লাগলো।

"ভারতে মানুষ চাই"—

তিনি বলছেন—"আমি মানুষ চাই, চাই মানুষ—মানুষ খুঁজতে আমি সারা ভারত ঘুরে বেড়িয়েছি। আমি ভারতের লোককে মানুষের ভেতর মানুষ হতে দেখতে চাই, দেবতা দেখতে চাই না। দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে দময়ন্তীলাভের জন্যে দেবশ্রেষ্ঠগণ এসেছিলেন। কিন্তু দময়ন্তী বললেন আমি নারী, নর চাই, দেবতায় আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমিও তেমনি দেবতা চাই না, মানুষ চাই। তন্ত্রেমন্ত্রে কোন কাজ উদ্ধার করতে চাই না। মানুষের মত সব কাজ করতে চাই।" যে সর্বজনহিতকামী গভীর পবিত্র অন্তঃকরণ হতে একথা উঠেছিল, তা কি ব্যর্থ হয়েছে? দেশ তার উত্তর দেবে। দেশ বলবে মানুষ মানুষের মত সহ্য করতে

শিখেছে কিনা? মানুষ মানুষের জন্যে কাঁদতে শিখেছে কিনা? মানুষ মানুষের মত সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছে কিনা? সব বিষয়ে মনুষ্যত্ব লাভ করেছে কিনা?

"ভয়শূন্য হও"—

তিনি আবার বলছেন—"নিজে ঈশ্বর হও, সকলকে ঈশ্বরত্ব লাভে সাহায্য করো। বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো—ভয় পেয়ো না, কেননা ভীত হওয়া হ'তে জগতে আর কোন মহাপাপ নেই। এ ভারত নিশ্চয়ই জাগ্রত হবে। যে মুহূর্তে তোমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হবে সেই মুহূর্তে তুমি শক্তিহীন। ভয়ই জগতের অধিকাংশ দুঃখের কারণ। ভয়ই সকলের চেয়ে বড় কুসংস্কার। নির্ভীক হলে এক মুহূর্তে স্বর্গ পর্যন্ত আবির্ভূত হয়। অতএব ভয়শূন্য হও।"

এই প্রবন্ধটি পাঠ করলে বোঝা যায় শ্রীঅরবিন্দের ওপর স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব ছিল কত বেশী। আগেই এই বিষয়ে উল্লেখ করেছি।

'কর্মযোগীন' পত্রিকাতেও শ্রীরামকৃষ্ণের কথা লিখে গেছেন শ্রীঅরবিন্দ। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের কর্মযোগীন পত্রিকায় লেখা রয়েছে,—

'The work that was begun at Dakshineswar is far from finished, it is not even understood. That which Vivekananda received and store to develop, has not yet materialised.'

এর দ্বারা সহজেই অনুমিত হয় যে শ্রীঅরবিন্দের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনদর্শন কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল।

কিন্তু ব্রিটিশ শাসক অরবিন্দকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো। একদিন নিবেদিতা ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের মতলব বুঝে নিয়ে অরবিন্দকে জানালেন, আপনি হয় ভারত ত্যাগ করে কোথাও চলে যান, না হয় আত্মগোপন করুন।

অরবিন্দ নিবেদিতার যুক্তি প্রথমে গ্রাহ্য করলেন না। পরে তিনি আত্মোপলব্ধির দ্বারা বুঝতে পারলেন যে, ব্রিটিশ পুলিসদের নজর হতে নিজেকে রক্ষা করতে হলে ফরাসী-অধিকৃত চন্দননগরে যাওয়াই এখন যুক্তিযুক্ত। সুতরাং অরবিন্দ আর বিলম্ব না করে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসের গোড়ার দিকে চন্দননগর অভিমুখে যাত্রা করলেন। চন্দননগরে মতিলাল রায়ের বাড়ীতে উঠলেন অরবিন্দ। তারপর ওখান হতে গেলেন পণ্ডিচেরীতে। যাবার আগে তিনি নিবেদিতার উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখে যান। তাতে তিনি নিবেদিতার ওপর 'কর্মযোগীন' পত্রিকা সম্পাদনের ভার অর্পণ করেন।

বিদায়কালে নিবেদিতার সঙ্গে দেখা হলো না অরবিন্দের। তাই তাঁর সঙ্গে কোনরকম দরকারী কথা বলা হলো না। পরে নিবেদিতা একাধিকবার চন্দননগরে গেলেন। একবার গেলেন ১৪ই ফেব্রুআরি আর একবার ২৮শে ফেব্রুআরি। সেখানে গিয়ে তিনি অরবিন্দের সঙ্গে 'কর্মযোগীন' পত্রিকার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন। ফেব্রুআরি মাস হতে ২রা এপ্রিল 'কর্মযোগীন' বন্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত নিবেদিতা ওর সম্পাদনকর্মে জ্বলন্ত প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। শেষের সংখ্যাগুলিতে থাকতো রাজনীতিক প্রবন্ধের তুলনায় ধর্মভিত্তিক প্রবন্ধ বেশী। নিবেদিতা গুরুদেবের আদর্শ ও ভাবধারাই বেশী করে প্রকাশ করতে লাগলেন। তিনি লিখলেন : 'আমি বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড, অবিভাজ্য। এক আবাস, এক স্বার্থ ও এক সম্প্রীতির ওপরেই জাতীয় ঐক্য গঠিত।

'আমি বিশ্বাস করি, বেদ ও উপনিষদের বাণীতে, ধর্ম ও সাম্রাজ্য-সমূহের সংগঠনে, মনীষীদের বিদ্যাচর্চায় ও মহাপুরুষদের ধ্যানে যে শক্তি প্রকাশ পেয়েছিল তাই আর একবার আমাদের মধ্যে উদ্ভূত হয়েছে আর আজকের দিনে ওরই নাম জাতীয়তা।'......

নিবেদিতা রাজনৈতিক কর্মে জড়িত আছেন এরূপ সন্দেহ করে ব্রিটিশ পুলিসরা তাঁর প্রতি কড়া নজর রাখতে লাগলেন। অনেক সময় তাঁর নামে যে পত্র আসতো সেগুলি খুলে ইংরেজ পুলিসরা দেখতো। নিবেদিতা পুলিসের এই অত্যাচারে অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং তদানীন্তন ভারতের বড়লাট লর্ড মিণ্টোর স্ত্রী লেডি মিণ্টোকে সমস্ত বিষয়টি জানিয়ে এক পত্র লিখলেন। লেডি মিণ্টো আগে থেকেই নিবেদিতার পরিচয় পেয়ে তাঁকে দেখবার জন্যে উৎসুক হলেন এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ মিসেস্ ফিলিপসনকে নিয়ে এলেন নিবেদিতার বালিকাবিদ্যালয় পরিদর্শন করতে। বিদ্যালয়ের পরিচালনা-ব্যবস্থা দেখে এবং নিবেদিতার সঙ্গে কথাবার্তা বলে খুশী হলেন লেডি মিণ্টো। এই প্রসঙ্গে তিনি এক সুন্দর মন্তব্য লিখেছেন : 'সম্প্রতি জনৈকা মিস্ নোবলের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে কলকাতার এক দরিদ্রতম পল্লীতে এসে আমি বিশেষ কৌতূহল বোধ করেছিলুম। মিস্ নোবল্ ভারতীয় জীবনযাত্রা গ্রহণ করেছেন ও সিস্টার নিবেদিতা নামে নিজের পরিচয় দিয়ে থাকেন। তিনি একজন আদর্শবাদী এবং হিন্দুধর্মের ভিতর গভীর অর্থ খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর যুক্তি ঠিকমত বুঝে ওঠা কঠিন। আমি আত্মগোপন করে গিয়েছিলুম। আমার সঙ্গে ছিলেন মিসেস্ ফিলিপসন নামে একজন আমেরিকান মহিলা ও মিঃ ভিক্‌টর ব্রুক।'......

এরপর লেডি মিণ্টো দক্ষিণেশ্বরে যেতে চাইলে নিবেদিতা ও ক্রিস্টিন তাঁকে সঙ্গে করে ৮ই মার্চ গেলেন সেখানে। লেডি মিণ্টো তাঁর বিবরণীতে দক্ষিণেশ্বর-ভ্রমণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন : 'ভিক্‌টর ব্রুকের সঙ্গে এক ভাড়া-করা মোটরে আমরা যাত্রা করলুম। পথে তুলে নেওয়া হলো সিস্টার নিবেদিতাকে। মন্দিরে পৌঁছে বাগানের বাইরে ফটকের কাছে গাড়ি রেখে আমরা ভেতরে প্রবেশ করে চলতে লাগলুম। অবশেষে পাথর-বাঁধানো বেদীর

কাছে এসে দাঁড়ালুম। সামনেই হুগলী নদী। এখানেই বেদীর ওপর এক গাছের নীচে বিবেকানন্দ বসতেন। স্থানটি প্রকৃতই ধ্যানের উপযোগী। অস্তগামী সূর্যের আভায় শান্তিপূর্ণ ও মনোরম দেখাচ্ছিল। পরে আমরা মন্দিরসংলগ্ন ঘরগুলির কাছে গেলুম। বেশীদূর যাওয়া আমাদের নিষেধ থাকায় দূর হতে নাট-মন্দিরের খিলানের মধ্যে দিয়ে কালীমন্দির দেখতে গেলুম। মন্দিরটি সুন্দর। চারদিক শান্ত এবং স্নিগ্ধ পরিবেশ।'···

এরপর লেডি মিন্টো মিস্ সোরাবজী নামে জনৈকা পারসীক মহিলার সঙ্গে বেলুড়মঠ দেখে এলেন। তিনি নিবেদিতাকে চায়ের আমন্ত্রণ জানালেন গভর্নর-হাউসে। নিবেদিতা কৃস্টিনকে সঙ্গে নিয়ে লেডি মিন্টোর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন। এরপর লেডি মিন্টোর পরামর্শ মত নিবেদিতা কলকাতার পুলিস কমিশনারের সঙ্গে দেখা করলেন। ফল হলো ভাল। তার ওপর থেকে পুলিসের মন্দ ধারণা ধীরে ধীরে চলে যেতে লাগলো।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষে নিবেদিতা গেলেন গিরিডিতে বেড়াতে। ওদিকে কৃস্টিনও স্বদেশ অভিমুখে রওনা হলেন ১২ই এপ্রিল তারিখে। বিদ্যালয়ের সমস্ত ভার আবার নিবেদিতার হাতে এসে পড়লো। তিনি গুরুদেবকে স্মরণ করে সেই গুরুদায়িত্ব নিজের হাতে নিলেন এবং সব কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে লাগলেন।

২৮

ভারততীর্থে নিবেদিতা

জীবনের প্রারম্ভে গুরুদেবের সঙ্গে একবার নিবেদিতা ভ্রমণ করেছিলেন ভারতের বিভিন্ন তীর্থ। সেই ভ্রমণকাহিনী তিনি লিখেছিলেন 'স্বামীজীর সঙ্গে হিমালয়ে' নামক গ্রন্থে। আবার জীবনসায়াহ্নে তীর্থভ্রমণ করার ইচ্ছা জাগলো। এবার ঠিক করলেন কেদারবদরী অভিমুখে যাবেন। চারজন একসঙ্গে যাত্রা করলেন। বসু-দম্পতি, নিবেদিতা এবং জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয় আনন্দমোহন বসু।

গ্রীষ্মের ছুটি উপলক্ষে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে যাত্রা করলেন সকলে। ওঁরা প্রথমে এলেন হরিদ্বারে। কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে স্বামী কল্যাণানন্দের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি যথাসম্ভব সাহায্য করলেন। সারাদিন এদিক ওদিক ঘোরা-ঘুরি করে সন্ধ্যের সময় ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে বসে গঙ্গার আরতি দেখতে লাগলেন।

১৭ই মে তাঁরা পৌঁছুলেন হৃষীকেশ। এখানকার প্রাকৃতিক শোভা অতুলনীয়। হরিদ্বার হতেই পাণ্ডা পাওয়া গেল। কুলী ও ডাণ্ডীও মিললো। প্রকৃতপক্ষে হরিদ্বার থেকেই কেদারবদরী যাবার পথ আরম্ভ হয়েছে। যাঁরা এখানে আসেন তাঁরা কাছেই কেদারবদরী দর্শন না করে ফিরে যান না। লছমনঝোলা সেতু পার হয়ে গঙ্গার ধার দিয়ে উত্তরদিকে পথ চলে গেছে। দলে দলে যাত্রীরা পথ দিয়ে চলেছে। মুখে কেদারবদরীর জয়গান আর হাতে নামের মালা। নিবেদিতা এবং তাঁর সঙ্গীরাও চললেন। তাঁর কাছে বড় ভাল লাগলো এই মহাযাত্রা। পথে দু'একজন

তীর্থযাত্রীর সঙ্গে পরিচয়ও হলো। শেষকালে দুর্গম পথ অতিক্রম করে ৩০শে মে সোমবার দুপুরে তাঁরা কেদারনাথ মন্দিরে গিয়ে পৌঁছুলেন। কয়েকটি সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয় পর্বতশিখরে। সেখানে কেদারনাথের বিগ্রহ রয়েছে। নিবেদিতা সেই বিগ্রহকে দেখে ভক্তিভরে প্রণাম জানালেন। সেইসঙ্গে তাঁর মন গর্বে ও আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠলো। ভাবলেন, এই সেই মহাতীর্থ যেখান হতে পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থান করেছিলেন এক সময়। ভারতের কত যোগী-ঋষি এই মহাতীর্থে এসে নিজেদের ধন্য মনে করেছেন। এখনো আসছে কত যাত্রী দূর-দূরান্ত হতে। আগামী দিনে আসবে আরও। মন্দিরে বিগ্রহকে দর্শন করে আস্তে আস্তে পর্বতগাত্র হতে নেমে এলেন নিবেদিতা। তুষারাবৃত শৈলশিখরের ওপর কিছুক্ষণ বেড়ালেন। তাঁর দৃষ্টিতে ধরা দিল পার্বত্য অঞ্চলের অবর্ণনীয় সৌন্দর্য। সেই সৌন্দর্যের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি বিশাল ভারতের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন। সমতলের সৌন্দর্য তাঁকে অভিভূত করলো। তিনি মনে মনে নিজেকে গর্বিত বোধ করলেন ভারতের প্রাচীন কীর্তি-কাহিনী স্মরণ করে।

এবার নিবেদিতা চললেন বদরীনারায়ণ দর্শন করতে। কিছুদূর যেতে না যেতেই দেখতে পেলেন এক বৃদ্ধা আসছে। হঠাৎ সে একটা বড় পাথরে হোঁচট খেল। নিবেদিতা তাই দেখে ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেলেন তাঁর কাছে। দুঃখ প্রকাশ করলেন বৃদ্ধার কষ্ট দেখে, আহা! আপনার কী কষ্টই না হচ্ছে।

নিবেদিতার কথা সম্পূর্ণ হেসেই উড়িয়ে দিল বৃদ্ধা। স্নিগ্ধ স্বরে বললে, ভগবানই তো আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি যখন কৃপা করে দর্শন দিয়েছেন তখন আর কী আসে যায়?

এই বলে বৃদ্ধা যেন আগের তুলনায় দ্বিগুণ তেজে এগিয়ে গেল।

একটু দূরে যেতেই আর একটি বৃদ্ধা নজরে পড়লো নিবেদিতার। সে আগে আগে চলেছে আর নিবেদিতা চলেছেন তার পেছনে।

বরফের ওপর দিয়ে পিচ্ছিল পথ ধরে এগিয়ে চলেছে বৃদ্ধা। অত্যধিক শীতে তার বড় কষ্ট বোধ হলো। তখন মানবতার একনিষ্ঠ পূজারিনী নিবেদিতা বৃদ্ধার কাছে এসে প্রশ্ন করলেন, আপনার কি পথ চলতে খুব কষ্ট হচ্ছে? আমি কি আপনার হাত ধরতে পারি?

নিবেদিতার কথা শুনে হাসলে বৃদ্ধা। আর কিছু বললে না।

নিবেদিতাও আর কিছু না বলে এগিয়ে চললেন। ১৩ই জুন নিবেদিতা সদলে এসে পৌঁছুলেন বদরীনারায়ণে। পরদিন ভোরবেলায় মঙ্গল-আরতি দেখবার জন্যে নিবেদিতা গেলেন মন্দিরে। কিন্তু তাঁকে মন্দিরচত্বরে প্রবেশ করতে দেওয়া হলো না। দূর থেকেই তিনি আরতি দেখলেন।

পাণ্ডাদের ঐ প্রকার ব্যবহারে ক্ষুব্ধা হলেন নিবেদিতা। তবু তিনি কোনরকম প্রতিবাদ করলেন না। মনে সামান্য দুঃখ হলেও পরে সব গোপন করলেন। তিনি দূর থেকে মন্দিরের শোভা নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

নিবেদিতার ইচ্ছা ছিল, তিনি এখানে বেশ কিছুদিন থাকবেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে সেখানে থাকা সম্ভব হলো না। কারণ শ্রীমতী অবলা বসু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বদরীনারায়ণ ত্যাগ করে তাঁরা চামৌলী ও নন্দপ্রয়াগ হয়ে এলেন কর্ণপ্রয়াগে। এখান থেকে দুটি পথ বেরিয়েছে। একটি গেছে কাঠগোদামের দিকে। সাধারণ যাত্রীরা এই পথ ধরে চলে। আর একটি গেছে শ্রীনগর হয়ে হরিদ্বার বা কোটদ্বারায়।

কোটদ্বারায় আছে ডাকবাংলো। তাই তাঁরা সকলে কোটদ্বারার পথ ধরলেন। পথটি সুন্দর এবং নির্জন।

২৯শে জুন তাঁরা এসে পৌঁছুলেন সমতলে। ফেরার কিছু পরেই নিবেদিতা লিখতে লাগলেন ভ্রমণকাহিনী। নাম হলো তার 'উত্তরের তীর্থ, যাত্রীর ডায়েরী'।

কলকাতায় ফিরে আসার পর নিবেদিতা খবর পেলেন মিসেস্ সারা বুল অসুস্থ। এখুনি তাঁকে আমেরিকায় যেতে হবে।

নিবেদিতা নিজের অক্ষমতা জানিয়ে সারা বুলকে চিঠি লিখলেন। সেই সঙ্গে তিনি পাঠিয়ে দিলেন শ্রীমার আশীর্বাদ।

এর পর অক্টোবর মাসে বিদ্যালয়ের ছুটি হলে নিবেদিতা বসু-দম্পতির সঙ্গে গেলেন দার্জিলিং-এ।

সেখানেও সুস্থির হয়ে অবস্থান করতে পারলেন না। একদিন আমেরিকা হতে জরুরী সংবাদ পেলেন সারা বুল অসুস্থ।

নিবেদিতা তখন জাহাজযোগে চললেন আমেরিকা অভিমুখে। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর বস্টনের কেম্ব্রিজে পদার্পণ করলেন নিবেদিতা। তারপর দেখা করলেন অসুস্থ সারা বুলের সঙ্গে। নিবেদিতাকে দেখে সারা বুল আনন্দ প্রকাশ করলেন। ঐ সময় নিবেদিতা স্বামীজীর 'জ্ঞানযোগ' পুস্তকটি সঙ্কলন করছিলেন। তিনি ঐ পুস্তক হতে কিছু কিছু অংশ পাঠ করে সারা বুলকে শোনালেন। এছাড়া শ্রীমার জীবনকথাও শোনাতে লাগলেন।

নিবেদিতার একান্ত সাহচর্য এবং প্রাণঢালা সেবা লাভ করে সারা বুল অনেকটা সুস্থ বোধ করলেন।

১১ই ডিসেম্বর, রবিবার। ঐদিন সকালে নিবেদিতা গেলেন গির্জায় সারার জন্যে প্রার্থনা জানাতে। দেখলেন গির্জার মধ্যে যীশু-জননী মেরীর যে ছবি রয়েছে তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে সারদামণির প্রতিমূর্তি। তাই দেখে আনন্দে অভিভূত হয়ে তিনি বাড়ীতে ফিরে এলেন। ঐদিন শ্রীমাকে চিঠি লিখলেন :

কেম্ব্রিজ, ম্যাস

রবিবার, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯১০

'আদরিণী মা,

সারার জন্যে প্রার্থনা করবো বলে আজ ভোরে আমি গির্জায় গিয়েছিলুম। সবাই ওখানে যীশু-জননী মেরীর কথা চিন্তা করছে।

আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল তোমার কথা। তোমার সেই মনোরম মুখখানি, সেই স্নেহভরা দৃষ্টি, পরনের সাদা শাড়ি, তোমার হাতের বালা—সবই যেন তখন প্রত্যক্ষ দেখতে পেলুম। আমার মনে হলো, তোমার সেই দিব্যসত্তাই যেন বেচারী সারার রোগকক্ষে নিয়ে আসবে শান্তি ও আশীর্বাদ। আমি আরও কি ভাবছিলুম, জানো মা? ভাবছিলুম, সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধ্যারতির সময় তোমার ঘরে বসে আমি যে ধ্যান করবার চেষ্টা করেছিলুম, সেটা আমার কী নির্বুদ্ধিতাই হয়েছিল! আমি যেন বুঝিনি যে, তোমার বাঞ্ছিত চরণতলে ছোট্ট একটি শিশুর মত বসে থাকতে পারাটাই তো যথেষ্ট। মাগো, ভালবাসায় পরিপূর্ণ তুমি। আর তাতে নেই আমাদের বা জগতের ভালবাসার মত উচ্ছ্বাস ও উগ্রতা। তোমার ভালবাসা হলো এক স্নিগ্ধ শান্তি, যা প্রত্যেককে দেয় কল্যাণস্পর্শ এবং কারও অমঙ্গল চায় না।···বেচারী এস সারাকে তোমার শান্তির উত্তরীয়খানি পাঠিয়ে দিও।···

প্রিয়তমা মা আমার

তোমার চিরদিনের নির্বোধ খুকী

'নিবেদিতা।'

শ্রীমাকে চিঠি লেখার পর হৃদয়ে অনেকখানি শান্তি পেলেন নিবেদিতা। কিন্তু তাঁর এই শান্তিও স্থায়ী হলো না। সারাবুল আর ভাল হয়ে উঠলেন না। দিন দিন তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগলো। অবশেষে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুআরি মৃত্যুর কোলে চিরবিশ্রাম লাভ করলেন।

সারা বুলের মৃত্যুতে নিবেদিতার মন বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। তার ওপর আরও একটা মৃত্যুসংবাদ শুনলেন। তাঁর একান্ত সহায় এবং হিতৈষী স্বামী সদানন্দ ১৮ই ফেব্রুআরি কলকাতায় দেহত্যাগ করেছেন। এর ফলে নিবেদিতা একেবারে ভেঙে পড়লেন। সদানন্দ তাঁর কাজে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন।

শোকসন্তপ্ত মন ও হৃদয় নিয়ে নিবেদিতা আমেরিকা হতে ফিরলেন ইংলণ্ডে। ওখানে তাঁর পুরাতন বন্ধু মিঃ র‍্যাটক্লিফ্, মিঃ নেভিনসন আর অধ্যাপক চেইনের সঙ্গে স্বামীজী এবং ভারতের হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা হলো।

পরে নিবেদিতা ইংলণ্ড ত্যাগ করে এলেন প্যারিসে। ওখানে দেখা হলো মিস্ ম্যাকলাউড আর মিসেস্ লেগেটের সঙ্গে।

মিস্ ম্যাকলাউডের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর অনেকখানি সান্ত্বনা পেলেন নিবেদিতা। নিজের কাজে এর আগে এমন উৎসাহ আর পান নি।

যাই হোক ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ মিস্ ম্যাকলাউডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিবেদিতা মার্সেলিস হতে ভারতগামী জাহাজে উঠলেন।

২৯

মহাপ্রস্থানের পথে নিবেদিতা

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ, ৭ই এপ্রিল। এই তারিখের সকালে নিবেদিতা বোম্বাই বন্দরে এসে পৌঁছলেন। ওখান থেকে ৯ই এপ্রিল ফিরলেন কলকাতায়। আর দু'দিন পরে অর্থাৎ ১১ই এপ্রিল শ্রীমা দাক্ষিণাত্য ও পুরীভ্রমণ শেষ করে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলেন। নিবেদিতা মায়ের কাছে এসে মনে পেলেন সান্ত্বনা।

শ্রীমা ও স্বামী সারদানন্দ নিবেদিতার কাছ থেকে সমস্ত বিবরণ শুনলেন সারা বুলের শেষ কটা দিন প্রসঙ্গে। তাঁরা দুঃখ প্রকাশ করলেন এ হেন সহৃদয়া নারীর পরলোকগমনে।

কিছুদিন বাগবাজারে থাকার পর শ্রীমা ১৭ই মে তারিখে গেলেন জয়রামবাটীতে।

অক্ষয় তৃতীয়ার দিন নিবেদিতা এলেন বেলুড়মঠে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁকে দেখে আনন্দ প্রকাশ করলেন। পরে নিবেদিতা স্বামীজীর ঘরে প্রবেশ করে তাঁর ছবির সামনে বসে কিছুক্ষণ ধ্যান করলেন। ওখান থেকে পুনরায় ফিরে এলেন বোসপাড়া লেনে।

গ্রীষ্মের ছুটি হলে ১২ই মে মায়াবতী অভিমুখে রওনা হলেন নিবেদিতা। সঙ্গে গেলেন বসু-দম্পতি এবং অরবিন্দ বসু (খোকা)। যাবার আগে 'উদ্বোধন' বাড়ীতে গিয়ে শ্রীমার কাছ থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। শ্রীমা তখন জয়রামবাটী হতে ফিরে ওখানে অবস্থান করছিলেন।

মায়াবতী আশ্রমে একমাস রইলেন নিবেদিতা। বসু-দম্পতি বেশ আনন্দের মাঝে এই সময়টা কাটিয়ে দিলেন। জগদীশচন্দ্র এই সময় তাঁর একটি নতুন বই লিখতে আরম্ভ করলেন। একদিন তিনি আশ্রমের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের কাছে উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। ১৮ই জুন রবিবার আশ্রমে সমবেত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের কাছে নিবেদিতা 'বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধন' বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন।

২৬শে জুন নিবেদিতা মায়াবতী ত্যাগ করে এলেন কাঠ-গোদামে। কাঠগোদাম হতে ৩রা জুলাই ফিরলেন কলকাতায়। সঙ্গে বসু-দম্পতি এবং অরবিন্দ বসুও ফিরলেন। এই সময় তিনি একটি সুসংবাদ পেয়ে আনন্দিত হলেন। মিসেস্ সারা বুল প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক। তিনি অনেক সময় নিবেদিতাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন তাঁর বিদ্যালয় পরিচালনার কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাবার জন্যে। মৃত্যুর আগে তিনি উইলে কিছু অর্থ রেখে যান নিবেদিতার অভিপ্রায়মত ভারতের শিল্পকলা, বিজ্ঞান এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় করার জন্যে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা ওলিয়া বুলের সঙ্গে এই নিয়ে নিবেদিতার মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

এবার তা মিটমাট হয়ে গেল। বস্টনের উকিল মিঃ ই. জি. থর্প এই খবরটি দিলেন নিবেদিতাকে। ভারতীয় শিল্পকলার উন্নতির জন্যে বরাদ্দ হলো এক হাজার পাউণ্ড, বিজ্ঞানচর্চার জন্যে তিন হাজার পাউণ্ড এবং নিবেদিতার বালিকাবিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্যে দু' হাজার পাউণ্ড। নিবেদিতার নিজের সঞ্চিত এক হাজার পাউণ্ড বিদ্যালয়ের কাজের জন্যে কৃস্টিনের হাতে দিয়ে গেলেন। এছাড়া তাঁর পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থও বিদ্যালয়ের কাজে লাগাবার জন্যে উইলে লিখে দিয়ে গেলেন। তিনি ইচ্ছে করলে ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে বিদ্যালয়ের পরিচালনার কাজে সাহায্যের জন্যে নিয়মিত অর্থের বরাদ্দ আদায় করতে পারতেন কিন্তু তিনি তেমন কাজ করলেন না। কেননা যিনি এদেশ হতে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ চেয়েছিলেন তাঁর পক্ষে সেই শাসকদের কাছ থেকে করুণা ভিক্ষা করা কিভাবে সম্ভবপর হতে পারে! তিনি তাঁর উইলে লিখে গেলেন, কখনো কেউ যেন ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে তাঁর বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্যে কোন অর্থ না নেয়। নিবেদিতার মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী এবং উইলের শর্তমত বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ দেশ স্বাধীন হবার পূর্বকাল পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে বিদ্যালয়ের জন্যে এক কপর্দক সাহায্যও গ্রহণ করেন নি।

বিদ্যালয়ের কাজের জন্যে ইতিমধ্যে নিবেদিতার শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছিল। তার ওপর এই সময় তাঁর কাছে এসে পৌঁছলো অনেকগুলি মৃত্যুসংবাদ। প্রথমে এলো মিসেস্ বুলের কন্যা ওলিয়ার মৃত্যুসংবাদ। ১৮ই জুলাই আত্মহত্যা করলো ওলিয়া বুল। তার প্রতি নিবেদিতার ভালবাসা ছিল অসীম। সে খামখেয়ালী ও জেদী মেয়ে হলে কি হবে নিবেদিতা তাকে ভালবাসতো ছোট বোনের মত। এরপর এলো গুরুদেবের জননী ভুবনেশ্বরীর মৃত্যুসংবাদ। তিনি দেহরক্ষা করলেন ২৫শে জুলাই। তিনি ভুবনেশ্বরীর শবদেহের সঙ্গে চলে গেলেন শ্মশানে। শেষকৃত্য

সম্পন্ন হলে তিনি ভূপেন্দ্রনাথের কাছে এক শোকবার্তা পাঠালেন।

একদিন পরে ভুবনেশ্বরীর জননীও মারা গেলেন। তারপর ২১শে আগস্ট রামকৃষ্ণানন্দ উদ্বোধন বাড়ীতে দেহরক্ষা করলেন। তিনি নিবেদিতাকে অনেকভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে নিবেদিতা বিশেষভাবে শোকাভিভূত হলেন।

এর ওপর মর‍্যার গায়ে খাঁড়ার ঘায়ের মত নিবেদিতার কাছে এলো এক দুঃসংবাদ। তাঁর প্রিয় সহকর্মীদ্বয় কৃস্টিন এবং সুধীরা বিদ্যালয়ের কাজ ত্যাগ করলেন। ফলে নিবেদিতার ওপর বিদ্যালয়ের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়লো। তারপর বই এবং সংবাদপত্র ও পত্রিকার লেখা নিয়ে এতো ব্যস্ত থাকতে হতো যে অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর শরীর ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লো। এই সময় তিনি সারা বুলের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-ইতিবৃত্ত রচনা করে মডার্ন-রিভিউতে প্রকাশ করলেন। তার নাম 'ইন্ মেমোরিয়াম : সারা চ্যাপম্যান বুল'। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী নিয়ে একটি বই লিখলেন। তার নাম 'Saying of Ramkrishna'। এছাড়া তিনি 'প্রবুদ্ধ ভারত' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমের জন্যে প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন।

এতো কাজ এবং চিন্তার জন্যে তাঁর শরীর দিন দিন খারাপ হতে লাগলো। তিনি বুঝতে পারলেন, আর তিনি বেশীদিন থাকবেন না এই পৃথিবীতে। মৃত্যুর মাঝে জীবনদেবতা তাঁকে নিয়ে যাবে অন্যলোকে। এইসব চিন্তা করে নিবেদিতা তাঁর জীবনদেবতা অর্থাৎ 'প্রিয়তম' এবং 'মৃত্যু' প্রসঙ্গে দু'টি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন। 'প্রিয়তম' প্রসঙ্গে লিখলেন : 'আমি যেন সর্বদাই স্মরণ রাখি, ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুলতাই জীবনের সম্পূর্ণ অর্থ। আমার প্রিয়তমই অতি প্রিয়, শুধু তিনি এই বাতায়নের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে আছেন, শুধু এই দরজায় করছেন করাঘাত। প্রিয়তমের

কোন অভাব নেই। তবু তিনি মানুষের অভাবের বেশ ধরে আসেন যাতে আমি তাঁর সেবার সুযোগ পাই। তাঁর খিদে নেই, তবু প্রার্থী হয়ে আসেন যাতে আমি তাঁকে দেখতে পারি। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন, যাতে আমি রুদ্ধদ্বার খুলে তাঁকে আশ্রয় দিতে পারি। তিনি ক্লান্তি প্রকাশ করেন শুধু যাতে আমি তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে পারি। তিনি ভিক্ষুকের বেশে আসেন যাতে আমি দান করতে পারি। প্রিয়তম, হে প্রিয়তম, আমার যা কিছু সবই তোমার। হ্যাঁ, আমি একান্তভাবে তোমারই। আমাকে সম্পূর্ণভাবে লোপ করে তুমি সেখানে এসে দাঁড়াও।'

'মৃত্যু' প্রসঙ্গে লিখলেন : 'ভেবে দেখলুম, অসীম যেন এভাবে মিলিত হয়েছে সসীমের সঙ্গে আর আমরা উভয়ের মধ্যবর্তী সীমারেখার ওপরে দণ্ডায়মান। উভয়ের ওপর অধিকার স্থাপন—সীমার মাঝে অসীমের উপলব্ধি—এই আমাদের প্রতি নির্দেশ। আমি ক্রমশঃ অধিকতর হৃদয়ঙ্গম করছি, মৃত্যুর অর্থ কেবল গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে যাওয়া—উপলখণ্ডের নিজ সত্তার কূপমধ্যে (অতল প্রদেশে) নিমজ্জন। মৃত্যুর আগে শান্ত দীর্ঘ প্রহরগুলির মাঝেই এই অবস্থার সূচনা—মন যখন তার জীবনের বিশিষ্ট ভাবটি নিয়ে নাড়াচাড়া করে, যে ভাবটিতে এর সব চিন্তা, কর্ম ও অভিজ্ঞতা পর্যবসিত। এই প্রহরগুলিতে ইতিমধ্যেই জীবাত্মা দেহ হতে আলাদা হতে আরম্ভ করেছে এবং নবজীবনের সূত্রপাত হয়েছে।

'আমি বিস্মিত হয়ে ভাবি, কারও সারাজীবন প্রেম ও মৈত্রী ভাবে রূপায়িত হওয়া সম্ভব কিনা, যেখানে বিরুদ্ধভাবের একটি তরঙ্গও উঠবে না, যাতে সেই অন্তিম সময়ে সে এক বিরাট ধারণায় চিরসমাহিত হয়ে যেতে পারে। এর ফলে সে অন্ততঃ অনন্তের জোরে স্বার্থ-চিন্তা হতে বিমুক্ত হয়ে বিশ্বের সমগ্র অভাব ও দুঃখকে

ধারণ করে নিজেকে এক শান্তিময় ও শিবময় জাগ্রত আবির্ভাব রূপে অনুভব করতে পারবে।'

সকলে নিবেদিতাকে বললে, পূজোর ছুটিতে দার্জিলিং-এ ঘুরে আসুন। আপনার শরীর ভাল হয়ে যাবে।

নিবেদিতা দার্জিলিং-এ যাবার জন্যে তৈরী হলেন। সেখানে যাবার আগে উদ্বোধন-বাড়ীতে গেলেন। সেখানে স্বামী সারদানন্দ গোলাপ-মা আর যোগীন-মার সঙ্গে দেখা করলেন। যোগীন-মাকে দেখে নিবেদিতা বললেন, যোগীন-মা, আমি বোধ হয় আর ফিরবো না।

নিবেদিতার কথা শুনে দুঃখিত হলেন যোগীন-মা। তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, এ কি নিবেদিতা, তুমি এ কথা বলছো কেন ?

নিবেদিতা বললেন, কি জানি যোগীন-মা, আমার কিরকম মনে হচ্ছে, এই বোধহয় শেষ।

নিবেদিতা দার্জিলিং-এ যাবার আগে অনেকের সঙ্গে দেখা করলেন। বিদ্যালয়ের বালিকা ও বয়স্কা ছাত্রী হতে আরম্ভ করে পাড়া-পড়শিনীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। নটসম্রাট ও মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গেও দেখা হলো। তিনি তখন অসুস্থ। সেই অবস্থায় লিখছিলেন 'তপোবল' নামে নাটকটি। নিবেদিতা শ্রীঘোষকে নাটক লেখায় উৎসাহ দিয়ে বললেন, আপনি তাড়াতাড়ি নাটকটি শেষ করুন, আমি যাতে দার্জিলিং হতে ঘুরে এসে নাটকটি পড়তে পারি।

অবশেষে সকলের কাছ থেকে বিদায়-অভিনন্দন লাভ করে নিবেদিতা রওনা হলেন দার্জিলিং অভিমুখে।

দার্জিলিং-এ গিয়ে ডি. এন. রায়ের বাড়ী 'রায়ভিলা'য় অবস্থান করতে লাগলেন নিবেদিতা। বেশ আনন্দের মাঝে দিনগুলি কাটতে লাগলো। ওখান থেকে কয়েক মাইল দূরে 'সন্দক ফু' পাহাড়ের দৃশ্য অতি সুন্দর। তুষারাবৃত ঐ গিরিশৃঙ্গে ওঠার

ইচ্ছা প্রকাশ করলেন নিবেদিতা। ঘোড়ায় চড়ে যেতে হবে। দু'তিন দিনের পথ।

সব ঠিক হয়ে গেল। যাবার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এমন সময় নিবেদিতা কঠিন আমাশয়রোগে আক্রান্তা হলেন। কলকাতার স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাঃ নীলরতন সরকার সেই সময় দার্জিলিং-এ অবস্থান করছিলেন। তিনি যত্ন করে দেখতে লাগলেন নিবেদিতাকে। ডঃ জগদীশচন্দ্রের স্ত্রী শ্রীমতী অবলা বসু নিবেদিতাকে সেবা করতে লাগলেন।

মাঝে মাঝে নিবেদিতা সুস্থ হয়ে উঠলেও তাঁর শরীর দিন দিন ভেঙে পড়তে লাগলো। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর অন্তিম সময় নিকটবর্তী। ৭ই অক্টোবর তিনি রচনা করলেন এক উইল। তাতে লিখলেন :

'বষ্টন শহরনিবাসী উকীল মিঃ ই. জি. থর্প আমাকে অথবা আমার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ককে যা কিছু দেবেন, বেঙ্গল ব্যাঙ্কে আমার যে তিনশো পাউণ্ড আন্দাজ জমা আছে, পরলোকগতা ওলি বুল-পত্নীর সম্পত্তির মধ্যে আমার যে সাতশো পাউণ্ড রয়েছে আর আমার যাবতীয় পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ আয় ও ওদের মধ্যে যেগুলির গ্রন্থস্বত্ব আমার আছে সেইসব আমি বেলুড়ের বিবেকানন্দ স্বামীজীর মঠের ট্রাস্টিগণকে দিচ্ছি। তাঁরা ঐ অর্থ চিরস্থায়ী ফাণ্ডরূপে জমা রাখবেন। আর ভারতীয় নারীদের মধ্যে জাতীয় প্রণালীতে, জাতীয় শিক্ষা প্রচলনের জন্যে তাঁরা মিস্ ক্রিস্টিন গ্রীন-স্টাইডেলের পরামর্শমত ওর আয় মাত্র ঐ উদ্দেশ্যে ব্যয় করবেন।'

এরপর থেকে নিবেদিতার মন অন্তর-রাজ্যের দিকে নিবিষ্ট হতে লাগলো। কেমন যেন উদাসীন ভাব লক্ষ্য করা গেল তাঁর মধ্যে। তিনি একদিন বললেন, আমি দার্জিলিং-এ আমার আগে বৌদ্ধধর্ম হতে সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলের জন্যে যে প্রার্থনাবাণী ইংরেজীতে অনুবাদ করেছি, তা একবার আবৃত্তি করে শোনান।

নিবেদিতার কথামত সেই সুন্দর প্রার্থনা-বাণীটি আবৃত্তি করা হলো :

'Let all things that beneath, without enemies, without obstacles, overcoming sorrow, and attaining cheerness, move forward freely, each in his own path !

In the East and in the West, in the North, and in the South, let all beings that are without enemies, without obstalces, overcoming sorrow, and attaining cheerfulness, move forward freely, each in his own path !'

শেষের দিনগুলি নিবেদিতার বেশ ভালভাবেই কাটতে লাগলো। রোগযন্ত্রণার মাঝখানেও তাঁর মুখমণ্ডলে প্রকাশ পেতে লাগলো আনন্দের জ্যোতিধারা। তিনি প্রায় সময় অস্ফুটস্বরে রুদ্রস্তুতি আবৃত্তি করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে মালা-জপও করতেন। কখনো বা ধীরে ধীরে আবৃত্তি করতেন উপনিষদের মহামন্ত্র :

'অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতংগময়। আবিরাবীর্ম এধি।'

অর্থাৎ, অসৎ হতে আমাকে সতে নিয়ে চলো, অজ্ঞানান্ধকার হতে আমাকে আলোকে নিয়ে যাও, মৃত্যু হতে আমাকে অমৃতে নিয়ে যাও, স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম, আমার কাছে জ্যোতির্ময় রূপে আবির্ভূত হও।

নিবেদিতা যেদিন পৃথিবীর কোল থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন তার কয়েকদিন আগে থাকতে আকাশ হয়েছিল মেঘাবৃত। কিন্তু যেদিন তিনি চলে যান সেই ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবরের সকালটি বড় সুন্দর ছিল। নীল আকাশের কোলে উদয়রবির

শান্ত স্নিগ্ধ হাসি দার্জিলিং শহরের পথঘাট আলো করে তুললো। অসুস্থ নিবেদিতার বিষণ্ণ মনে আনন্দের সাড়া জাগালো সেই রবিরশ্মির মধুর স্পর্শ। একফালি রোদ এসে প্রবেশ করলো তাঁর ঘরে। তাই দেখে তিনি বলে উঠলেন, The boat is sinking, but I shall see the sunrise—তরণী ডুবছে, আমি কিন্তু সূর্যোদয় দেখবো।

বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখাবয়বে আনন্দের জ্যোতি দীপ্যমান হয়ে উঠলো। ঐ অবস্থায় তিনি ত্যাগ করলেন শেষ নিঃশ্বাস।

নিবেদিতা চলে গেলেন অজর অমর অবিনশ্বর অমৃতধামে। পড়ে রইলো তাঁর নশ্বর দেহ দার্জিলিং-এর 'রায়ভিলায়'।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়লো দার্জিলিং শহরে। বহু গণ্যমান্য এবং সাধারণ লোক এলো তাঁকে দেখতে। ক্রমে তাঁর শবদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো শ্মশানভূমি অভিমুখে। বিরাট শোভাযাত্রা শবদেহকে নিয়ে দার্জিলিং শহর পরিক্রমা করলে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন ডঃ জগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীমতী অবলা বসু, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ নীলরতন সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

বিকেলবেলায় নিবেদিতার শবদেহ চিতায় তোলা হলো এবং হিন্দুরীতি অনুযায়ী দাহ করার আয়োজন করা হলো। রামকৃষ্ণ মিশন থেকে এসেছিলেন ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ। তিনিই মুখাগ্নি করলেন। ধীরে ধীরে নিবেদিতার শবদেহ চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে গেল। সকলে সমস্বরে 'হরিবোল' ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। এরপর রাত আট ঘটিকার সময় চিতাভস্ম সংগ্রহ করে সকলে ফিরলেন দুঃখিত মন নিয়ে।

নিবেদিতার নশ্বর দেহকে যেস্থানে ভস্মীভূত করা হয়েছিল, পরবর্তীকালে সেখানে একটি স্মৃতিফলক স্থাপন করা হলো। তার

গায়ে লেখা হলো : 'এখানে ভগিনী নিবেদিতা শান্তিতে নিদ্রিত— যিনি ভারতবর্ষকে তাঁর সর্বস্ব অর্পণ করেছেন'।

নিবেদিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কলকাতার বিশিষ্ট এবং গুণীজ্ঞানী নাগরিক শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন নটসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি আশা করেছিলেন যে নিবেদিতা দার্জিলিং হতে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর লেখা নাটক 'তপোবল' পাঠ করবেন। কিন্তু তাঁর সে আশা ফলবতী হলো না। দার্জিলিং হতে আর ফিরলেন না নিবেদিতা। সুতরাং গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকটি নিবেদিতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে মন্তব্য লিখলেন :

পবিত্রা নিবেদিতা,

বৎসে! তুমি আমার নতুন নাটক হলে আমোদ করতে। আমার নতুন নাটক অভিনীত হচ্ছে, তুমি কোথায়? দার্জিলিং যাবার সময় আমায় পীড়িত দেখে স্নেহবাক্যে বলে গিয়েছিলে, 'এসে যেন আপনাকে দেখতে পাই।' আমি তো বেঁচে আছি। কেন বৎসে, সেবা করতে আসো না? শুনতে পাই, মৃত্যুশয্যায় আমায় স্মরণ করেছিলে, যদি দেবকাজে নিযুক্ত থেকে এখনও আমায় তোমার স্মরণ থাকে আমার অশ্রুপূর্ণ উপহার গ্রহণ করো।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

ভগিনী নিবেদিতা-বিরচিত গ্রন্থাবলী

1. Civic and National Ideals
2. Siva and Budha
3. Kedernath and Badrinarayan
4. Notes on Some Wanderings with the Swami Vivekananda
5. The Master as I saw Him
6. The Web of Indian Life
7. Cradles Tales of Hinduism
8. Kali the mother
9. Love and Death
10. Footfalls of Indian History
11. Hints on National Education in India
12. The Northern Tirtha ; a Pilgrim's diary
13. Selected Essays of Sister Nivedita

নিবেদিতার প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের আশীর্বাদ

"The mother's heart, the hero's will,
The sweetness of the southern breeze,
The secred charm and strength that dwell
On Aryan alters, flaming free
All those be yours and many more
No ancient soul could dream before—
Be thou to India's future son,
The mistress, servant, friend in one"—

'মায়ের মমতা আর বীরের হৃদয়,
দখিনের সমীরণে যে মাধুরী বয়,
বীর্যময় পুণ্যকান্তি যে-অনলে জ্বলে
অবন্ধন শিখা মেলি আর্য-বেদিমূলে ;
এ-সব তোমারই হোক, আরও ইহা ছাড়া
অতীতের কল্পনায় ভাসে নাই যারা
অনাগত ভারতের যে-মহামানব,
সেবিকা, বান্ধবী, মাতা তুমি তার সব।'

—স্বামী বিবেকানন্দ।

নিবেদিতার উদ্দেশ্যে অন্যান্য মনীষীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

'বাংলায় আমার রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টায় আমাকে যিনি সবচেয়ে বেশী সহায়তা করেছেন এবং নানাভাবে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সুযোগ্যা শিষ্যা—মহীয়সী নিবেদিতা।'

—শ্রীঅরবিন্দ।

'নরেন যেন সত্যি একটা আগুনের শিখা রেখে গেছে। শরীরে কী তেজ আর অন্তরে কী স্নেহমমতা, দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। বোসপাড়ার এই এঁদো গলিতেই জীবনটা কাটিয়ে দিলেন। একেই বলে তপস্যার শক্তি। আমার 'তপোবল' সিস্টার নিবেদিতাকেই উৎসর্গ করব।'

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

'...সব সময়েই (নিবেদিতা) ভারতের মেয়েদের শিক্ষার কথা ভাবতেন, আলোচনা করতেন। তাঁর জীবনের সমস্ত সঞ্চয়, পুস্তকের যাবতীয় আয়—এ সবই তিনি ভারতের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন।'...

—লেডী অবলা বসু।

'মা যেমন ছেলেকে সুস্পষ্ট করে জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তারূপে উপলব্ধি করতেন। বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা।'

—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'ভগিনী নিবেদিতাকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম। তিনি সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। তাঁর মহৎ চরিত্রের গুণেই তিনি এটি অর্জন করেছিলেন। তিনি সকলেরই ভগিনীসমা ছিলেন।... মানবী আকারে তিনি ছিলেন দেবী, যিনি দুঃখযন্ত্রণাক্ষুব্ধ এই মানবসমাজে সুখ ও শান্তি আনবার জন্যে স্বর্গ হতে নেমে

এসেছিলেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে তিনি সকলের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।'...

—সাংবাদিক মতিলাল ঘোষ।

'ভারতবাসীর জন্য নিবেদিতা যে কি করে গিয়েছেন ভাবীকাল তার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করবে।'

—শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী।

'নিবেদিতা ছিলেন বিদূষী এবং উন্নত চরিত্রের মহিলা। বিদেশ হতে এদেশে এসে এই দেশকেই তিনি তাঁর জন্মভূমি জ্ঞান করেছিলেন এবং অবশেষে এই দেশের মাটিতেই তাঁকে অন্তিম শয্যা নিতে হয়েছিল।...আমাদের সৌভাগ্য যে, নিবেদিতাকে আমরা পরমাত্মীয়া রূপে আমাদের মধ্যে পেয়েছিলুম। ভারতের জাতীয় পুনরুত্থানের ইতিহাসে 'নিবেদিতা' এই নামটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

—স্যার রাসবিহারী ঘোষ।

'...এসেছিলে না ডাকিতে, অকালে চলিয়া গেলে, হায়
চ'লে গেলে অল্প আয়ু দুর্ভাগার সৌভাগ্যের প্রায়
দেহ রাখি শৈলমূলে—শঙ্করের অঙ্কে মৃতা সতী!
ওগো দেবতার-দেওয়া ভগিনী মোদের পুণ্যবতী!'

—কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

'ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ না করিয়াও নিবেদিতা ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন—এ তাঁর পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। ভারতের শিক্ষা কি, সাধনা কি, সমাজের মর্মকথা কি, তা তিনি তেমন করেই বুঝতে চেয়েছেন যেমন করে বুঝলে আমরা যথার্থ ভারতীয় হয়ে উঠতে পারি। এক বিদেশিনীর পক্ষে এ কম কৃতিত্বের কথা নয়।'

—ব্রজেন্দ্রলাল শীল।

'ইউরোপীয় বংশসম্ভূত যত লোকের কথা আমরা জানি, তাঁদের মধ্যে কেউই ভারতবর্ষকে ভগিনী নিবেদিতার চেয়ে বেশী প্রীতি

ও ভক্তি করতেন না। তিনি ভারতভূমিকেই নিজের মাতৃভূমি-স্থানে বরণ করে নিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্যে তিনি প্রভূত পরিশ্রম করতেন।'

—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

'ভগিনী নিবেদিতার নিকট হতে একটি জিনিস আমি শিখেছি। তা হলো আত্মমর্যাদাবোধ। আমাকে ইতিহাস-গবেষণার কাজে প্রেরণা দেবার সময়ে একটা কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন— 'কখনো বিদেশীর কাছে নিজের পতাকা অবনত করবেন না' ('নেভার লোয়ার ইওর ফ্ল্যাগ টু এ ফরেনার')—তাঁর সেই উপদেশ আমি জীবনে ভুলিনি।'

—স্যার যদুনাথ সরকার।

'নরেন্দ্রের নৈবেদ্য এই নিবেদিতা।'

—শ্রীমা সারদামণি।

'ভারতবর্ষকে বিদেশী যাঁরা সত্যিই ভালবেসেছিলেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে বড়।'

—শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'ম্যাটসিনির আত্মচরিতের প্রথম খণ্ড যা ভগিনী নিবেদিতা আমাদেরকে দিয়েছিলেন, তরুণ বিপ্লবীদের কাছে বাইবেলস্বরূপ ছিল।'

—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

'ভারতবর্ষকে নিবেদিতা প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন। যা-কিছু দেখেছিলেন সবই তিনি তাঁর ভালবাসার আলোকে অপরূপ রূপে দেখেছিলেন। প্রতিটি সংস্কার, প্রতিটি আচার আধ্যাত্মিকতার জ্যোতির্ময় রূপ গ্রহণ করেছিল তাঁর গভীর প্রেমদৃষ্টির সামনে। নিবেদিতার মত এমন করে ভারতবর্ষকে ভালবাসতে খুব কম লোকই পেরেছেন। ভারতবর্ষের অপমানের জন্যে এমন করে জ্বলে-পুড়ে মরা, এমন গভীর বেদনাবোধ, ভারতীয়দের আত্ম-অবিশ্বাস

ঘোচাবার জন্যে এমন ব্যাকুলতা, ভারতের সাধনার মহত্ত্বকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে এমন প্রাণঢালা পরিশ্রম ক'জনাই বা করেছেন ?'

—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'ভগিনী নিবেদিতা সারা ভারতে পরিচিত ও ভারতের প্রিয়। নিবেদিতা নাম গ্রহণ তাঁহার সার্থক। ভারতের সনাতন সভ্যতা ও সাধনার ধারাতে তিনি নিঃশেষে আপনাকে মিশিয়ে দিয়েছেন। এই ইংরাজ মহিলা সমস্ত জীবন দিয়ে ভারতকে যেভাবে ভাল-বেসেছেন আমাদের দেশের খুব অল্প লোকই সেভাবে দেশকে ভালবাসেন। নিবেদিতা আমাদের কাছে এসেছেন শিক্ষা দিতে নয়, শিখতে। তিনি নতুন কোন বাণীর প্রবক্তারূপে আমাদের সামনে দাঁড়ান নি, দাঁড়িয়েছেন আন্তরিক শ্রদ্ধার উপাসিকার রূপ নিয়ে। তাঁর গুরুর কাছ থেকে ভারতের সাধনার স্বরূপের যে-আভাস তিনি পেয়েছেন সেই সাধনার মধ্যে ভালবাসায় নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে, বিলিয়ে দিয়ে—তাঁর নিজের সত্তাকে তিনি বিকশিত করতে চেয়েছেন। ভারতের সাধনার যে-সব দিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে, তাদের সত্য রূপটি তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে।'

—বিপিনচন্দ্র পাল।

১৯১১ সালে ভগিনী নিবেদিতার অকালমৃত্যুর দরুন তাঁর অসমাপ্ত "হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাণকাহিনী" গ্রন্থের সম্পাদনভার আমার ওপর পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী বিবেকানন্দের একনিষ্ঠা শিষ্যা ছিলেন নিবেদিতা। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সমাজবিজ্ঞানে পারদর্শিনী হয়ে তবেই ভারতের জীবন-প্রণালী, শিল্প ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভূমি ভারতের আদর্শ বিষয়ে ও এর নর-নারীদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও আন্তরিকতা সত্যিই অতুলনীয়। নানা প্রবন্ধ পুস্তকাদির ভেতর দিয়ে লেখিকা নিবেদিতা কেবল পাশ্চাত্য জগতের কাছে ভারতের মুখপাত্রী

হয়েছিলেন তা নয়, তিনি অনুপ্রাণিত করেছিলেন এক অভিনব ভারতীয় ছাত্র-গোষ্ঠীকে, যারা ভারতের শাশ্বত ধর্ম ও শিল্পের ভেতর দিয়ে জাতীয় আদর্শের সন্ধান পেয়েছিল।'

—আনন্দকুমার স্বামী।

'নিবেদিতার মুখে এমন একটা তেজস্বিতা, দীপ্তি ও পবিত্র মুখশ্রী আমি দেখেছি যা সচরাচর চোখে পড়ে না এবং একবার দেখলে কখন যা জীবনে ভুলতে পারা যায় না। তাঁর কাছে আমরা এত উৎসাহ পেয়েছি যে বলবার নয়। তিনি যে আমাদের কি ছিলেন, আমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করতুম কিন্তু প্রকাশ করে বলা কঠিন।'...

—আচার্য নন্দলাল বসু।

'আমাদের ছিল তখন দেশী শিল্পের গবেষণা-কাল। ভিক্টোরীয় যুগের পর এই প্রথম আবার ভারতবর্ষে ভারতীয় আর্টের ধারা নবীন-ভাবে এলো। আমাদের এই নবধারার ভারতীয় শিল্পকলার চর্চায় প্রধান উৎসাহদাতা যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন এন. ব্লাণ্ট, জাস্টিস্ উডরফ্, রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু এবং ভগিনী নিবেদিতা। শ্রদ্ধেয়া ভগিনী নিবেদিতা আমাদের ছিলেন প্রধান উৎসাহদাতাদের মধ্যে।'

—অসিতকুমার হালদার।

'শ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে আমি নিবেদিতার অঞ্চলে আশ্রয় নিতুম।'

—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

'যদিও বিবেকানন্দের মৃত্যু হয়েছে, তবু তিনি তাঁর মানসকন্যা নিবেদিতাকে রেখে গেছেন তোমাদেরকে পরিচালনা করবার জন্যে। তোমরা অবশ্যই তাঁর কথা শুনবে। তাঁর চারদিকে এসে দলে দলে সংঘবদ্ধ হবে।'

—কাকুজা ওকাকুরা।

'নিবেদিতা তুখোড় মেয়ে, মগজটা ছিল ভারী ধারালো। পাশ্চাত্য স্বাদেশিকতা, ভাবনিষ্ঠা, রোমান্টিকতা ইত্যাদি রসে তাঁর চিন্তাভাণ্ডার ছিল ভরপুর। সেই চিত্ত আর ব্যক্তিত্ব তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মারফত ভারত, ভারতীয় জনসাধারণ আর ভারতীয় সংস্কৃতির পায়ে। ভারতীয় নরনারীর অতীত ব্যাখ্যা করা, বর্তমান বিশ্লেষণ করা আর ভবিষ্যৎ বাতলানো তাঁর পক্ষে মুড়িমুড়কি খাওয়ার মত সোজা কাজ ছিল। ঠিক যেন আদর্শনিষ্ঠ ও ভাবুক ভারতীয় স্বদেশসেবকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিবেদিতা সমগ্র ভারতের বিকাশধারা দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন।... কোন বিদেশী পণ্ডিত ভারতীয় নর-নারীর জীবনকথা এত গভীর-ভাবে বুঝতে পারে না কল্পনা করা অসম্ভব। নিবেদিতার সঙ্গে কথাবার্তায় তাঁর এই বিশ্লেষণশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি সহজেই ধরা পড়তো। এইসবের ভেতরকার ভারতীয় দরদটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।'

—বিনয় সরকার।

'তাঁর ভগিনীজনোচিত আদর আমার কাছে কত মূল্যবান ও প্রীতিকর ছিল তা আর কি লিখবো! যেদিন তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেলুম সেদিন সমস্ত বোসপাড়াটা আমার কাছে একটা মহাশূন্যের মত বোধ হয়েছিল।'

—দীনেশচন্দ্র সেন।

'বিবেকানন্দের চরিত্র—চিন্তা—স্বদেশপ্রেম—নারীজাতির উন্নতিকল্পে তাঁর আদর্শ ইত্যাদি শুধু নিবেদিতা পর্যবেক্ষণ করেন নি—বিবেকানন্দের প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক ভঙ্গী, প্রত্যেক পা ফেলা তিনি নিরীক্ষণ করেছেন। যে-চোখে বিবেকানন্দকে নিবেদিতা দেখেছিলেন এবং যে উচ্চভাবে ও অনুপম ভাষায় তা প্রকাশ করেছেন আর কেউ তা পারে নি। নিবেদিতার মধ্যে দিয়ে যে বিবেকানন্দকে আমরা দেখি, তা না দেখতে পেলে

বিবেকানন্দকে দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যেত। এটা কিছুমাত্র অত্যুক্তি নয়।'

—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী।

'নিবেদিতার জীবন সেবা ও আত্মদানমূলক তপস্যার জীবন। বাইরের শোভাযাত্রায়, ধ্বজপতাকায় তার জয় ঘোষণা হয়নি। গুরুর কাছ হতে যে অগ্নি তিনি আপন হৃদয়-পাত্রে চয়ন করেছিলেন তার তেজ তিনি সযত্নে নিজের মধ্যে ধারণ করেছিলেন—সেই অপরিমেয় শক্তিকে সংবরণ করে তার পাবকশিখায় আপনাকেই নিরন্তর দগ্ধোজ্জ্বল করে তিনি কেবল তার আলোটুকুই বিকিরণ করেছিলেন।'······

—কবি মোহিতলাল মজুমদার।

'ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন এক অসাধারণ মহিলা। তাঁর কাছে নানাভাবে আমরা চিরঋণী। একজন বিদেশিনী যে কীভাবে আমাদের এত আপনার করে নিয়েছিলেন তা ভাবতে অবাক লাগে—শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।'

—জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সত্যেন বসু।

'ভগিনী নিবেদিতা এ যুগের এক মহীয়সী নারী। তিনি আমাদের আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেন। দেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। নিবেদিতার মধ্যে মাধুর্য ও চারিত্রিক শক্তির এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে। স্বামী বিবেকানন্দের কৃতিত্ব অসম্পূর্ণ থাকতো যদি এমন শিষ্যা তিনি না পেতেন।'

—জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়।

ভগিনী নিবেদিতার জীবনপঞ্জী

তারিখ	ঘটনা
১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ, ২৮শে অক্টোবর	মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল জন্মগ্রহণ করে উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের টাইরণ অঞ্চলের অন্তর্গত ড্যাংগানন শহরে। মায়ের নাম মেরী ইজাবেল হ্যামিলটন আর পিতার নাম স্যামুয়েল রিচমণ্ড।
১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ	পিতামহী মার্গারেট এলিজাবেথ নীলামের কাছে মার্গারেটের গমন।
১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ	পিতামহীর নিকট হতে পিতামাতার নিকট আগমন এবং পাঠাভ্যাস আরম্ভ। তখন স্যামুয়েল দম্পতি বাস করছিলেন ডেভনের গ্রেট টরেন্টন গ্রামে। একমাত্র ভগিনী মে এবং একমাত্র ভ্রাতা রিচমণ্ডের সঙ্গে মিলন। পিতার অল্পবয়সে মৃত্যু। পিতামহ হ্যামিলটনের চেষ্টায় মার্গারেট ও মের হ্যালিফ্যাক্স কলেজে যোগদান।
১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ	লেখাপড়ার কাজ সমাপ্ত করে উপায়ক্ষম হবার যোগ্যতা অর্জন। মেসউইকের একটি প্রাইভেট বোর্ডিং-স্কুলে দু'বছরের জন্যে শিক্ষয়িত্রীর চাকরি গ্রহণ। রাগবির অনাথাশ্রমে কর্মগ্রহণ। রেক্সহ্যামের সেকেণ্ডারী স্কুলে শিক্ষকতার কর্ম-গ্রহণ। স্থানীয় গির্জায় আংশিকভাবে সেবাকর্ম গ্রহণ, পরে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ার জন্যে কর্মত্যাগ। 'নর্থ ওয়েলস্ গার্ডিয়ান' পত্রিকায় বিভিন্ন প্রকার ছদ্মনামে প্রবন্ধ প্রকাশ। কেমিক্যাল লেবরেটরির একজন তরুণ ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়। তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব। কিন্তু অকস্মাৎ তার মৃত্যু হলো।

তারিখ	ঘটনা
১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ	রেক্সহ্যাম ত্যাগ করে চেস্টারে আগমন এবং শিক্ষাব্রতীর জীবন গ্রহণ। শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ পাঠ এবং একাধিক গুণীজ্ঞানী শিশু-মনস্তত্ত্ব-বিদ্‌দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা। মাঝে মাঝে লিভারপুলে গিয়ে মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনীর সঙ্গে অবস্থান। শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে প্রতিষ্ঠিত লজম্যানদের স্কুলে যোগদান।
১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ	চেস্টার হতে মাতা, ভগিনী ও ভ্রাতার সঙ্গে লণ্ডনে আগমন। উইম্বলডনের একটি নতুন শিশু-শিক্ষালয়ে যোগদান। অবসর সময়ে 'আধুনিক শিক্ষাসমিতি'তে কাজ। শেক্সপীয়র নাটকের অভিনয় দেখা। সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় এবং কয়েকটি পত্রিকায় বিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে নিয়মিত লেখা সুরু। স্বদেশ আয়র্ল্যাণ্ডের মুক্তিসংগ্রাম নিয়ে একাধিক বিপ্লবীদের সঙ্গে আলোচনা।
১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ	ডি-লীউ-এর সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলে বিদ্যালয় ত্যাগ এবং উইম্বল্‌ডনের অন্য এক জায়গায় 'রাস্কিন স্কুল' নামে একটি নতুন ধরনের বিদ্যালয়ের উদ্বোধন। একাধিক সমিতিতে যোগদান এবং শিল্পী, সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে পরিচয়। নতুন প্রণয়ীর সঙ্গে আলাপ পরে সম্পর্ক-ছেদ। কয়েকদিনের জন্যে হ্যালিফ্যাক্সে আগমন —বন্ধু কলিন্সের সঙ্গে সাক্ষাৎ—তার কাছে পরামর্শগ্রহণ—পরে লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন। স্টার্ডির বাড়ীতে ভারতীয় সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ। বক্তৃতার বিষয় নিয়ে চিন্তা ও আলোচনা।

তারিখ	ঘটনা
	স্বামীজীর অল্প সময়ের জন্যে নিউইয়র্ক যাত্রা। পুনরায় লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন এবং নিবেদিতার সঙ্গে কথাবার্তা ও হিন্দুধর্ম নিয়ে আলোচনা।
১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ, নভেম্বর	স্বামীজীর বক্তৃতা শুনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানালে মার্গারেট। পরে স্বামীজীর সঙ্গে ভারতে আসবার জন্যে হেনরিয়েটার কাছে ইচ্ছা প্রকাশ।
১৮৯৮, ২৮শে জানুআরি	ভারতের মাটিতে মার্গারেটের প্রথম পদার্পণ।
১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, ফেব্রুআরি	স্বামীজীর মার্কিন শিষ্যাদ্বয় মিসেস্ সারা বুল ও মিস্ ম্যাকলাউডের ভারতে আগমন, পরে স্বামীজীর মারফত মার্গারেটের সঙ্গে পরিচয়।
১৮৯৮, ১০ই ফেব্রুআরি	স্বামীজীর ভাবীকাজের বিবরণ জানিয়ে নেল হ্যামণ্ডকে লিখলে চিঠি।
১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, ফেব্রুআরি ও মার্চ	মিসেস্ সারা বুল, মিস্ ম্যাকলাউড আর মার্গারেটের সঙ্গে স্বামীজীর কথাবার্তা, নানা ভাবের আদান-প্রদান। ভারতীয় কৃষ্টি, সভ্যতা ও ধর্ম বিষয়ে পাশ্চাত্য নারীদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ।
১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, ২৭শে ফেব্রুআরি	বেলুড়ে পূর্ণচন্দ্র দাঁর ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। তাতে যোগ দিলে মার্গারেট।
১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, ১১ই মার্চ	স্টার থিয়েটারে নিবেদিতার প্রথম বক্তৃতা।
১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, ১৭ই মার্চ	সঙ্ঘজননী শ্রীমাকে দেখতে গেল মার্গারেট।
১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, ২৫শে মার্চ	নীলাম্বর মুখার্জীর বাড়ীতে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে স্বামীজীর কাছ থেকে ব্রহ্মচর্য-মন্ত্রে দীক্ষা নিলে মার্গারেট। এখন তাঁর নতুন নাম হলো ভগিনী নিবেদিতা।

তারিখ	ঘটনা
১৮৯৮। ১২ই মে	স্বামীজী, সারা বুল এবং মিস্ ম্যাকলাউড্, তুরীয়ানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, সদানন্দ এবং স্বরূপানন্দের সঙ্গে মার্গারেটের প্রথম ভারত-পরিক্রমা আরম্ভ। নৈনিতাল, আলমোড়া, কাশ্মীর, কাঠগোদাম, শ্রীনগর, অমরনাথ, পহলগাঁ প্রভৃতি স্থানে গমন এবং নানাপ্রকার দর্শনীয় স্থান দর্শন।
১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, ৩০শে সেপ্টেম্বর	গুরুর নির্দেশমত নিবেদিতা হিমালয়ের ক্রোড়ে মহাকালীর ধ্যানে তন্ময় হলেন এবং উপলব্ধি করলেন এই চলমান বিশ্বসংসারের যাকিছু ঘটন-অঘটন সবকিছুই হচ্ছে সেই এক লীলাময়ী পরমা-প্রকৃতি মহাশক্তির ইঙ্গিতে। সঙ্গে সঙ্গে গুরুশক্তির ওপর আস্থা স্থাপন।
১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, ১লা নভেম্বর	কাশী হতে কলকাতায় একাকিনী প্রত্যাবর্তন এবং বাগবাজারে শ্রীমা সারদামণির আশ্রয়ে অবস্থান—সাধনভজন এবং ধ্যানধারণায় আত্ম-নিয়োগ—কলকাতানগরী দর্শন—ভারতীয় জন-জীবনের সঙ্গে হৃদ্যতাস্থাপন—স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ—স্বামী যোগানন্দের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে শোকপ্রকাশ।
১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, ১২ই নভেম্বর	কালীপূজার দিন বাগবাজারে বালিকা-বিদ্যালয়ের উদ্বোধন। শ্রীমা উপস্থিত ছিলেন।
১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, ডিসেম্বর	কলকাতায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয়। 'মা-কালীর কাহিনী' নামে একটি গল্প লেখেন।
১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ, ২৫শে মার্চ	নিবেদিতাকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত করলেন স্বামীজী।

তারিখ	ঘটনা
১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ, ২১শে এপ্রিল	ক্লাসিক থিয়েটারে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক আহূত এক জনসভায় বক্তৃতা দেন নিবেদিতা। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'প্লেগ ও ছাত্রগণের কর্তব্য' বাগবাজার পল্লীতে ব্যাপকভাবে সেবাকার্য পরিচালনা এবং স্বয়ং প্লেগরোগীদের পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ।
১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ, ২৮শে মে	কালীঘাট মন্দিরে আগমন এবং সেখানে কালী ও কালীপূজা প্রসঙ্গে বক্তৃতাদান।
১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ, ২০শে জুন	স্বামীজী এবং স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে পাশ্চাত্যদেশে গমন।
১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ, ৩১শে জুলাই	লণ্ডনে অবতরণ।
১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ, সেপ্টেম্বর	ভগ্নী মে-র বিবাহে যোগদান।
১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ, ২০শে সেপ্টেম্বর	আমেরিকায় মিসেস্ লেগেটের বাড়ী 'রিজলী-ম্যানর'-এ আগমন। সেখানে স্বামীজী ও সারা বুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'রিজলী-ম্যানর'-এ কয়েকদিন অবস্থান এবং গুরুর কাছে শিক্ষা গ্রহণ।
১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ, ৭ই নভেম্বর	শিকাগোয় পদার্পণ।
১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ, ১৬ই নভেম্বর	মিস্ ম্যাথিউর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদের কাছে বক্তৃতা।
১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ, ১৭ই নভেম্বর	মিশনারী বোর্ড কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে ক্রাইডে ক্লাব 'ভারতীয় নারীগণের অবস্থা' প্রসঙ্গে বক্তৃতা।
১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে, ২০শে নভেম্বর	মিস্ অ্যাডামসের উদ্যোগে হাল হাউসে 'ভারতে ধর্মজীবন' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

তারিখ	ঘটনা
১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ, ১লা ডিসেম্বর	হাল হাউসে আর্ট অ্যাণ্ড ক্র্যাপট অ্যাসোসিয়েশনে বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয়বস্তু—'ভারতের প্রাচীন শিল্পকলা'। স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ।
১৯০০ খ্রাষ্টাব্দ, ১০ই জানুআরি	শিকাগো ত্যাগ এবং ডেট্রয়েট, অ্যান প্রভৃতি আমেরিকার অন্যান্য স্থানে গমন।
ঐ	শিকাগোয় প্রত্যাবর্তন।
১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ, মে মাস	জ্যামাইকায় গমন।
১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ, জুন মাস	নিউইয়র্কে যাত্রা। ওখানে গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নিউইয়র্কে 'প্র্যাট্ ইনস্টিটিউশনে' 'হিন্দু নারীর আদর্শ' প্রসঙ্গে বক্তৃতা।
১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ, ২৮শে জুন	নিউইয়র্ক ত্যাগ এবং জন কর্ড হয়ে প্যারিস যাত্রা। প্যারিসে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-কংগ্রেসে বৈজ্ঞানিক প্যাট্রিক গেড্ডিসের সহকারী হিসাবে কর্ম-সম্পাদন। পরে ঐ কর্মে ইস্তফা দান।
ঐ, জুলাই	বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বসুর প্যারিস-যাত্রা এবং নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ। নিবেদিতা ডঃ বসুর সঙ্গে ওখানকার মান্যগণ্য অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দেন।
১৯০০ খ্রাষ্টাব্দ, অক্টোবর	বসু-দম্পতির সঙ্গে লণ্ডনে আগমন। লণ্ডনের সভায় কয়েকটি বক্তৃতাদান এবং অর্থপ্রাপ্তি। 'স্টেড এ্যাণ্ড বিটি' পত্রিকায় নিয়মিত লেখা। ডঃ বসুর কাছে ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষা।
১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ, ফেব্রুআরি	নিবেদিতা লণ্ডন হতে গেলেন গ্লাসগো। ওখানকার এক প্রদর্শনীর ভারতীয় বিভাগে বক্তৃতা দেন। স্কটল্যাণ্ড হতে লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন এবং অর্থনীতিবিদ্ রমেশচন্দ্র দত্তর সঙ্গে সাক্ষাৎ। তাঁর

তারিখ	ঘটনা
	প্রেরণায় 'ভারতীয় জীবনের রহস্য' নামে গ্রন্থ প্রণয়ন।
১৯০১ ২১শে মে	নরওয়ে আগমন এবং তিন সপ্তাহ যাবৎ একাকিনী অরণ্যে অবস্থান। আত্মোপলব্ধির দ্বারা অনুধাবন করলেন যে তাঁর মধ্যে প্রকাশ হয়েছে মহাশক্তির।
১৯০১ ৪ঠা সেপ্টেম্বর	নরওয়ে ত্যাগ এবং লণ্ডনে আগমন।
ঐ, ১৪ই সেপ্টেম্বর	গ্লাসগো প্রদর্শনীতে আগমন এবং বক্তৃতা-দান।
১৯০১ ১৪ই অক্টোবর	বেথানী মঠে গমন এবং তথায় এক সপ্তাহ অবস্থান।
ঐ, নভেম্বর	অধ্যাপক গেড্ডিসের সঙ্গে কিছুদিন কাটান। এই সময় তিনি ডঃ বসুর Living and Non-living নামে বইয়ের সম্পাদনা করেন।
ঐ, ৩১শে ডিসেম্বর	মম্বাসা জাহাজে জিনিসপত্র প্রেরণ।
১৯০২ ৯ই জানুআরি	জাহাজে করে ভারত-অভিমুখে রওনা।
১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ, ৩রা ফেব্রুআরি	রমেশচন্দ্র দত্ত ও সারা বুলের সঙ্গে কলম্বো হয়ে মাদ্রাজে এলেন নিবেদিতা।
১৯০২ ৪ঠা ফেব্রুআরি	মাদ্রাজের মহাজন-সভা হলে রমেশচন্দ্র দত্ত আর নিবেদিতাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সি. জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার পাঠ করেন অভিনন্দন-পত্র। ঐ সভায় বক্তৃতা দেন নিবেদিতা। ওতে ভারতের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা এবং আনুগত্য প্রকাশ পায়।
১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ, ৯ই ফেব্রুআরি	বাগবাজারে আগমন।

তারিখ	ঘটনা
১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ, ৩রা জুলাই	সদলবলে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন এবং বিদ্যালয়ের কর্মে যোগদান। সারা বুলের উইল সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা। ওঁর কন্যা ওলিয়া বুলের সঙ্গে মনোমালিন্য। পরে সব মিটমাট হয়ে গেল। নিবেদিতার আশা অনুযায়ী সারা বুল কিছু টাকা উইলে দান করে যান ভারতে শিক্ষা, শিল্পকলা এবং বিজ্ঞানচর্চার জন্যে।
ঐ, ১৮ই জুলাই	মিসেস্ সারা বুলের কন্যা ওলিয়ার মৃত্যু-সংবাদ-শ্রবণ।
ঐ, ২৫শে জুলাই	স্বামীজীর মাতা ভুবনেশ্বরীদেবীর মৃত্যুসংবাদ-শ্রবণ এবং শ্মশানে শবসৎকারের জন্যে শবানুগমন।
ঐ, ২৬শে জুলাই	ভুবনেশ্বরীর জননীর পরলোকপ্রাপ্তি।
ঐ, ২১শে আগস্ট	উদ্বোধনবাড়ীতে রামকৃষ্ণানন্দের দেহত্যাগ সংবাদ শুনে মর্মাহত।
ঐ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	পূজোর ছুটিতে দার্জিলিং গমন। যাবার আগে উদ্বোধনবাড়ীতে গিয়ে স্বামী সারদানন্দ, গোলাপ-মা ও যোগীন-মার সঙ্গে সাক্ষাৎ। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথোপকথন। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ। দার্জিলিং-এ 'রায়-ভিলা'য় অবস্থান। হঠাৎ কঠিন আমাশয়রোগে আক্রান্ত। ডঃ নীলরতন সরকারের চিকিৎসা। শ্রীমতী অবলা বসুর সেবা-শুশ্রূষা।
ঐ, ৭ই অক্টোবর	নিজের সম্পত্তির জন্য উইল-প্রণয়ন।
ঐ, ১৩ই অক্টোবর	সজ্ঞানে অনন্তলোকে শেষ যাত্রা। হিন্দু-প্রথামত দার্জিলিং-এ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে শবদেহ সংকার করা হয়।

নির্দেশিকা

(ব্যক্তি)